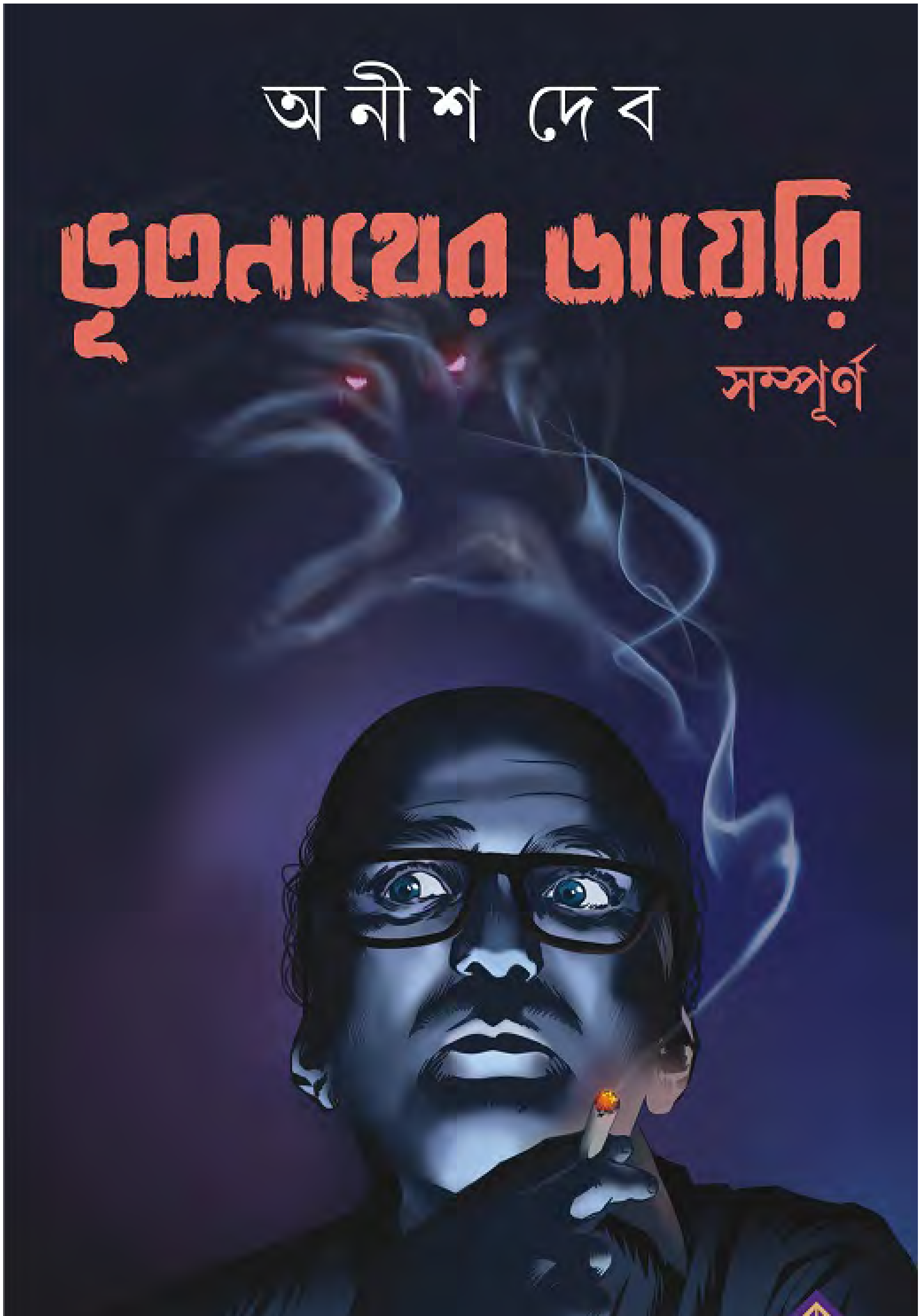
অনীশ দেব

# ভূতনাথের ডায়েরি

সম্পূর্ণ




অনীশ দেব
ভূতনাথের ডায়েরি
সম্পূর্ণ

# ভূতনাথের ডায়েরি সম্পূর্ণ

অনীশ দেব

# ভূতনাথের ডায়েরি সম্পূর্ণ



পত্রভারতী®

www.patrabharati.com

**প্রথম প্রকাশ** জুলাই ২০২১

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্রভারতী®, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

**প্রচ্ছদ** রঞ্জন দত্ত
**অলংকরণ** সমীর সরকার ও দেবযানী রায় ঘোষাল



BHUTNATHER DIARY SAMPURNO
*A Collection of Horror Stories by* Anish Deb
Published by PATRA BHARATI®
at 3/1 College Row, Kolkata 700009
+91-33-22411175, 9433075550
info@patrabharati.com
patrabharatibooks 9830806799

ISBN 978-81-8374-439-3

সুমন্ত চট্টোপাধ্যায়
স্নেহাস্পদেষু

**পত্রভারতী থেকে প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই**

কিশোর সাহিত্য
প্রতিঘাত সম্পূর্ণ
তেইশ ঘণ্টা ষাট মিনিট সম্পূর্ণ
ভয়পাতাল
কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র
বিজ্ঞান। জানা অজানা
পাই নিয়ে রূপকথা
বিজ্ঞানের হরেকরকম
কেমন করে কাজ করে যন্ত্র
রোমাঞ্চকর ধূমকেতু
বয়স্ক সাহিত্য
গোয়েন্দা এসিজি সমগ্র
ভূতনাথের ডায়েরি সম্পূর্ণ
আগুন রঙের বুলেট
লাশতালাশ
অনীশের সেরা ১০১
অশরীরী ভয়ংকর
ভৌতিক অলৌকিক
পাঁচটি রহস্য উপন্যাস
বারোটি রহস্য উপন্যাস
সেরা সায়েন্স ফিকশন সমগ্র

# এক মিনিট, আপনাকে বলছি

'ভূতনাথের ডায়েরি'-র জেনেসিসটা আপনাকে প্রথমে জানিয়ে দিই। সালটা ছিল ১৯৯৯। 'দেব সাহিত্য কুটীর'-এর সর্বময় কর্তা ছিলেন অরুণচন্দ্র মজুমদার—যিনি 'শুকতারা' পত্রিকার অন্যতম প্রকাশক ছিলেন। সেই 'অরুণদা' একদিন ফোন করে বললেন, 'অনীশবাবু, একদিন আমার দপ্তরে একটু আসবেন? একটু দরকার ছিল—।'

সুভদ্র অরুণদা এরকমই ছিলেন। বহুবার আপত্তি করা সত্ত্বেও আমার শুভনামের লেজে 'বাবু' জুড়ে দেওয়ায় কখনও ক্ষান্ত হননি। আর তার সঙ্গে 'আপনি'।

তো দেখা করতে গেলাম। অরুণদা বললেন, 'সামনের মাস থেকে প্রতিমাসে ''নবকল্লোল'' পত্রিকায় একটা করে ভূতের গল্প লিখতে হবে।'

ভয় পেয়ে গেলাম। আমি কি পারব?

প্রশ্নের উত্তরটা ঠিকঠাকভাবে ভেবে ওঠার আগেই তিনি বললেন, 'কী ভাবছেন? আপনি ঠিক পারবেন।'

ব্যস, নির্বাহী সম্পাদককে তিনি পরিকল্পনার কথা জানিয়ে দিলেন। এবং পরের মাস থেকে 'নবকল্লোল' পত্রিকায় শুরু হয়ে গেল 'ভূতনাথ'-এর গল্পের সিরিজ। ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে এগারো মাসে দশটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল (একটি সংখ্যায় আমার লেখা দিতে দেরি হয়েছিল, তাই এগারোয় দশ)। পত্রিকায় প্রকাশের ক্রম অনুসারে গল্পগুলো বইয়ে সাজানো হয়েছে।

২০০১ সালে প্রথম প্রকাশের সময়ে প্রয়াত শিল্পী সমীর সরকার—আমার কাছে 'সমীরদা'—বইয়ের সমস্ত ছবি এঁকে দেন। সম্পর্কের টানে ব্যক্তিগতভাবে ছবিগুলো তিনি আমাকে এঁকে দেন। এই ঘটনায় 'ভূতনাথের ডায়েরি'-র প্রথম প্রকাশকের কোনওরকম ভূমিকা ছিল না।

সমীর সরকারের ছবিগুলো এতই মনোহর যে, সেগুলো ছাড়া 'ভূতনাথের ডায়েরি'-কে আমার পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়। সেইজন্যই এখন বইটির যে-সংস্করণ, প্রকাশিত হচ্ছে তাতেও অনীশ দেব ও সমীর সরকারের যুগলবন্দি।

বইটি নতুন করে প্রকাশের উদ্যোগে 'বইতরণী' সেই ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়। পত্রভারতীর বরুণ রায় বইটি সাজানোর কাজে যথেষ্ট অভিনবত্ব দেখিয়েছেন।

এবার 'দেখা যায় না, শোনা যায়'।

'দেখা যায় না, শোনা যায়' উপন্যাসটির প্রথম পর্ব কিশোর ভারতীর শারদীয়া ১৪১৮-তে প্রকাশিত হয়েছিল। পুজো সংখ্যায় অর্ধেক উপন্যাস প্রকাশ করার বকুনি হিসেবে এক পাঠক রসিকতা করে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, 'এরকম দেখাও যায় না, শোনাও যায় না।' অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে জানাই, উপন্যাসটির শেষ অংশ প্রকাশিত হয় কিশোর ভারতীর শারদীয়া ১৪১৯-এ।

বই প্রকাশের সময় লেখাটি যথাসাধ্য পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেছি।

সুতরাং 'নতুন' 'ভূতনাথের ডায়েরি সম্পূর্ণ' এখন আপনার হাতে। সেইসঙ্গে আমার লেখালিখির গুণমানের বিচারও।

১৭ এপ্রিল, ২০২১



# ভূতনাথের ডায়েরি

আমার নাম প্রিয়নাথ জোয়ারদার। বিজ্ঞান যেখানে শেষ, সেইখান থেকে আমার কৌতূহল ও আগ্রহের শুরু। ছোটবেলা থেকেই ভূতে আমার ভীষণ ভয়। অশরীরী, অলৌকিক, ভূত, প্রেত, পিশাচ আমাকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিত। আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছে যখনই এ-জাতীয় কোনও কাহিনি শুনতাম তখনই খুব ভয় পেতাম। পরে বড় হয়ে, কাঠমাণ্ডুর এক সন্ন্যাসীর পরামর্শে, আমি ভূত-প্রেতের ভয় কাটানোর জন্য অভিনব এক পথ ধরি—ভূত-প্রেতের খোঁজ করে বেড়ানো।

সুতরাং সেই পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়েস থেকেই আমার ভূতচর্চার কাজ শুরু হয়েছে। আজ, এই পরিণত বয়েসে এসেও সে-কাজ থামেনি। এই তিন যুগ সময়ে কখন যেন আমার নাম 'প্রিয়নাথ'-এর বদলে 'ভূতনাথ' হয়ে গেছে। সমবয়েসি বা গুরুজনরা সামনেই 'ভূতনাথ' বলে ডাকেন। আর, ছোট যারা, তারা বলে আড়ালে। আমি তাতে কিছু মনে করি না। বরং বেশ মজা পাই।

প্রায় পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর ধরে ভূত-প্রেত, অশরীরী-অলৌকিক নিয়ে আমার কম অভিজ্ঞতা হল না। তা ছাড়া ভূত-প্রেতের বহু কাহিনিও আমি শুনেছি। সেই সব অভিজ্ঞতা ও কাহিনি আমি যত্ন করে লিখে রেখেছি বারোটা মোটা-মোটা বাঁধানো খাতায়—অনেকটা ডায়েরির মতন। মাঝে-মাঝে সেই খাতাগুলোর পাতা উলটে স্মৃতিচারণ করি।

সম্প্রতি আমার আলাপ হয় এক কলমচির সঙ্গে। আলাপ করে জানলাম, তিনি নাকি বানিয়ে-বানিয়ে ভূতের গল্প লেখেন। তখন আমি হেসে আমার খাতাগুলোর কথা তাঁকে বলি। শুনে তাঁর উৎসাহ দ্যাখে কে! আমার মিনমিনে ওজর-আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি খাতাগুলো নিয়ে যান। যাওয়ার আগে বলে গেলেন, 'ডায়েরির লেখাগুলো ঘষে-মেজে কল্পনার প্রলেপ দিয়ে সামান্য রদবদল করে একে-একে আমি লিখব। আপনার কোনও আপত্তি শুনব না।'

ভদ্রলোক আমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট। তাই একরকম স্নেহের বশেই তাঁকে আমি অনুমতি দিয়েছি। আমার ডায়েরির পৃষ্ঠায় কাহিনিগুলো বন্দি না থেকে সকলের সামনে প্রকাশ করলে ক্ষতি কী!

# সূচিপত্র



**সম্পাদিত ও পরিবেশিত বই**

সেরা ১০১ ভৌতিক অলৌকিক
কিছু মেঘ, কিছু কুয়াশা
রক্ত ফোঁটা ফোঁটা
বিশ্বের সেরা ভয়ংকর ভূতের গল্প
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ১
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ২
শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস ৩
রহস্য রোমাঞ্চ গোয়েন্দা পত্রিকার সেরা ১০০ গল্প

# গল্প



# অন্ধকারে, হাতে হাত রেখে

'প্ল্যানচেট' শব্দটা প্রথম কে উচ্চারণ করেছিল জানি না, তবে তাকে আমি দোষ দিতে চাই না। কারণ সে-রাতে শেষ পর্যন্ত যা হয়েছিল তার জন্যে আমরা কেউই দায়ী ছিলাম না। দায়ী ছিল একমাত্র নিয়তি।

ঘটনার শুরু সায়েন্স কলেজের ক্যান্টিনের আড্ডা থেকে।

পি-কে-সি-র ক্লাস কেটে আমরা পাঁচজন চায়ের কাপ সামনে রেখে 'টাইটানিক' নিয়ে তুমুল তর্ক করছিলাম। বিষয় ছিল, কেট উইনস্লেট বেশি সুন্দর দেখতে, না মাধুরী দীক্ষিত।

হঠাৎই রমেশ তিওয়ারি বলে উঠল, 'পরশু আমি জুমেলিয়াকে স্বপ্নে দেখেছি—।'

আমাদের আড্ডা 'ঝুপ' করে থেমে গেল। সবাই চুপ।

কারণ জুমেলিয়া তিনমাস আগে অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

ও আমাদের সঙ্গেই পড়ত। মাস তিনেক আগে আমরা, মানে বি.টেক. থার্ড ইয়ারের স্টুডেন্টরা, শৌনকদের মাইকেলনগরের বাগানবাড়িতে পিকনিক করতে গিয়েছিলাম। দলে আমরা মোট সতেরোজন ছিলাম। পিকনিকটা ছিল একেবারেই আমাদের নিজেদের ব্যাপার—ফলে কোনও স্যার-ট্যার সঙ্গে যাননি। শীতের ছুটির দিনটা আমাদের দারুণ কেটেছিল।

টেপ রেকর্ডার চালিয়ে দিয়ে নাচ-গান। স্যারদের ক্যারিকেচার। ব্যাডমিন্টন, তাস, জমাটি আড্ডা। একটু-আধটু নেশা করা। তারপর কবজি ডুবিয়ে মাংস-ভাত। দিনটা সবাই দারুণ এনজয় করেছিল।

তা ছাড়া শৌনকদের বাগানবাড়িটাও ছিল চমৎকার। বিশাল গাছ-গাছালির বাগান, আর তার সঙ্গে প্রকাণ্ড মাপের দোতলা বাড়ি। কলকাতায় যে-নির্জনতার দেখা পাওয়াই ভার, এখানে তাকে দ্যাখে কে! তাই হারিয়ে যাওয়ার কোনও মানা ছিল না। জোড়ায়-জোড়ায় অনেকে হারিয়েও গেছি।

দিনটা আমার স্পষ্ট মনে আছে দুটি কারণে।

সেদিন আমি সুছন্দাকে প্রথম চুমু খেয়েছিলাম।

আর, ফেরার সময় যশোর রোডের ওপর জুমেলিয়া অ্যাকসিডেন্টে মারা যায়।

সেদিন ওর সিগারেট খাওয়ার ঝোঁক চেপেছিল। একে তো পিকনিকে হুল্লোড় করে এক-দু-পেগ খেয়ে একটু টিপসি ছিল, তার ওপর একটু জেদি—তাই ফেরার পথে জেদ ধরল এক্ষুনি ওর ক্লাসিক সিগারেট চাই।

আমাদের কারও সঙ্গে ক্লাসিক ছিল না। আমরা অন্য ব্র্যান্ড ওকে দিতে চাইলাম। কিন্তু ওর সেই এক কথা, 'আমার বাপি ক্লাসিক ছাড়া খায় না—আমারও ওই চাই—রাইট নাউ। সো স্টপ দ্য ব্লাডি বাস।'

বাস থামিয়ে জুমেলিয়া একা-একাই নেমে পড়েছিল। রাস্তা পার হয়ে গিয়েছিল একটা পান-সিগারেটের দোকানে। তারপর ফেরার সময় একটা ট্রাক ওর সিগারেট খাওয়ার সাধ চিরজীবনের মতো শেষ করে দিল।

ট্রাকটার একটা হেডলাইট খারাপ ছিল, আর জুমেলিয়ার নজর ছিল ঝাপসা! ফলে চোখের পলকে সব শেষ হয়ে গেল।

জুমেলিয়ার সঙ্গে আমাদের ক্লাসের বাপ্পাদিত্যর 'ইয়ে' আছে। কিন্তু বাপ্পা নিজেও সেদিন একটু-আধটু আউট ছিল। তার ওপরে জুমেলিয়া হল বড়লোক বাবা-মায়ের একমাত্র মেয়ে—আদুরে এবং জেদি। সুতরাং ওর ভবিতব্য কেউ বদলাতে পারেনি।

নির্জন শীতের রাস্তায় সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আমাদের সাঙ্ঘাতিক এক ধাক্কা দিয়েছিল। আমরা পাথর হয়ে গিয়েছিলাম।

বাপ্পাদিত্য প্রায় দু-মাস পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। তারপর কোনওরকমে সামলে উঠেছে। এখনও ও প্রায়ই আনমনা হয়ে পড়ে, ক্লাসের পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে না। সবকিছু ভীষণ ভুলে যায়। অথচ ও পড়াশোনায় দারুণ ছিল। বি. টেক. পার্ট ওয়ান আর পার্ট টু মিলিয়ে ওর র‍্যাঙ্ক সেকেন্ড। জানি না, ফাইনাল ইয়ারে কীরকম রেজাল্ট করবে।

জুমেলিয়ার থেঁতলানো দেহটা এখনও আমার চোখের সামনে ভাসে। ওর ফরসা সুন্দর মুখটা অটুট ছিল। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় ওর মুখ দেখে মনেই হয়নি ও আর নেই। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি। অপলক দু-চোখে অনেক সাধ ও স্বপ্ন। আর ঠোঁটের বাঁদিকে ছোট্ট কালো জড়ুলটা বরাবরের মতোই সুন্দর। বাপ্পা ওই জড়ুলটার জন্যে পাগল ছিল।

আমরা পাঁচজনই সেই পিকনিকে ছিলাম। আমি, বাপ্পা, রমেশ তিওয়ারি, শৌনক, আর ঐন্দ্রিলা।

রমেশের কাণ্ডজ্ঞান বেশ কম। যখন যা মনে হয় হুটহাট করে বলে দেয়। যেমন, এখন। বাপ্পার অবস্থা জেনেশুনেও ও ফস করে জুমেলিয়ার কথা তুলে বসল। তা ছাড়া, আমরা অনেকেই জানি, জুমেলিয়ার ব্যাপারে তিওয়ারির ইন্টারেস্ট ছিল। ভালো করে বাংলা শেখার জন্যে ও আমাকে আড়ালে বহুবার ধরেছে। বলছে 'রঙ্গন, ইয়ার, আমাকে দো-তিন বাংলা লাভ ডায়ালগ শিখিয়ে দে।'

আমি হেসে জানতে চেয়েছি 'কেন? কোথায় অ্যাপ্লাই করবি?'

জুমেলিয়ার কথা তিওয়ারি আর বলতে পারেনি। কারণ ও জানত, বাপ্পাকে আমরা সবাই ভালোবাসি। এমনকী ঐন্দ্রিলাও বাপ্পাকে মনে মনে চাইত। পরে শৌনকের সঙ্গে ওর রিলেশান হয়।

তিওয়ারি জুমেলিয়ার কথা বলামাত্রই আমাদের আলোচনার বিষয় পালটে গেল। আলোচনা শুরু হল পিকনিক আর জুমিকে নিয়ে।

আমার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। মনে-মনে চাইছিলাম এ-আলোচনা বন্ধ হোক, কিন্তু তা হয়নি। ধাপে-ধাপে আলোচনা পৌঁছে গেল আত্মা, প্রেতাত্মা, প্ল্যানচেট, সিয়াঁস, প্রেতচক্র, এইসবের দিকে। তবে 'প্ল্যানচেট' শব্দটা প্রথম কে উচ্চারণ করেছিল তা আমার মনে নেই।

ঐন্দ্রিলা এক চুমুকে চায়ের কাপ শেষ করে বলল, 'আমার বড়জেঠু ছোটবেলায় খুব প্ল্যানচেট করতেন। নামকরা সব লোকদের নাকি ডেকে আনতেন। একবার নাথুরাম গডসে-কে ডেকেছিলেন। তখন অন্ধকার

ঘরের মধ্যে গুলির শব্দ শুনেছিলেন—।'

শৌনিক হো-হো করে হেসে উঠে বলল, 'যত্ত সব লাটাই-ঘুড়ি। আর-একটু তোল্লাই দিলেই বলবি মহাত্মা গান্ধীর ''হা রাম!'' কথাটাও তিনি শুনতে পেয়েছিলেন।'

ঐন্দ্রিলা রীতিমতো খেপে গিয়ে বলে উঠল, 'প্ল্যানচেটের তুই কী বুঝবি! তোর কাছে তো সবকিছু ট্যান হয়ে বেরিয়ে যায়।'

আমি ওদের শান্ত করার জন্যে বললাম, 'তোরা যা-ই বল, প্ল্যানচেট ব্যাপারটা বোধহয় একেবারে বোগাস নয়। আমি একজনকে জানি...।'

বাপ্পা আমাকে বাধা দিল : 'আমি জুমিকে প্রায়ই স্বপ্নে দেখি। কিছুতেই ওকে ভুলতে পারছি না।'

কথা বলতে-বলতেই বাপ্পা মাথা নীচু করল, চোখ বুঝে চোখের কোণ আঙুলে টিপে ধরল। ওর পিঠটা বারবার কেঁপে উঠতে লাগল। বুঝতে কোনও অসুবিধে হল না যে বাপ্পা, কাঁদছে।

ঐন্দ্রিলা বাপ্পার পিঠে হাত বুলিয়ে দিল, বিষণ্ণ গলায় বলল, 'অন্য কথা ভাবার চেষ্টা কর। জুমি তো আর নেই। ওর কথা ভেবে শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছিস।'

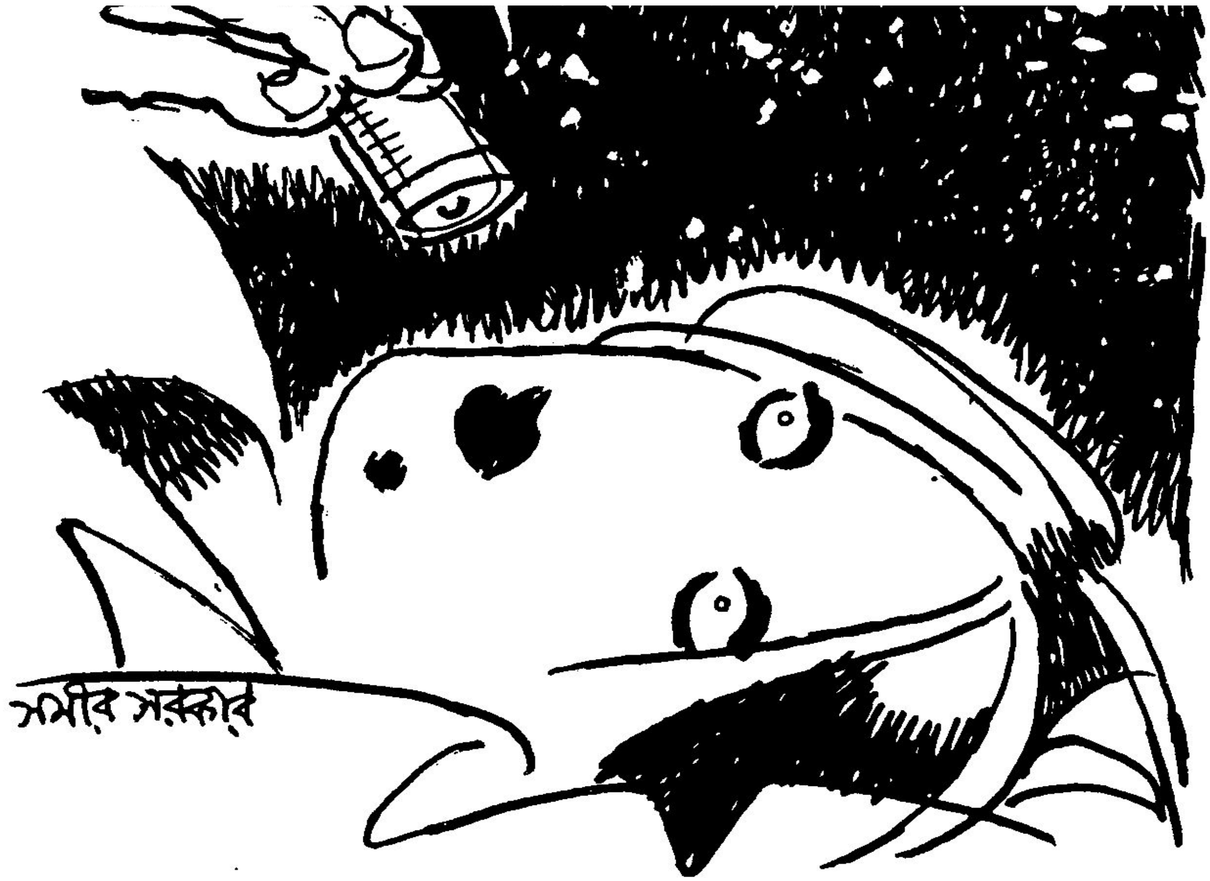
আমি আর শৌনক বাপ্পাকে বোঝাতে লাগলাম। ওর মনটা বড্ড নরম আর সাদাসিধে—ঠিক কচি কলাপাতার মতো—অল্পেতেই আঁচড় পড়ে যায়।

অনেকক্ষণ পর বাপ্পা নিজেকে সামলে নিয়ে ভারী গলায় বলল, 'আমার কপালটাই খারাপ! জুমিকে যদি একটিবার দেখতে পেতাম!'

শৌনক আনমনা হয়ে কী যেন ভাবছিল। হঠাৎই ও ক্যান্টিনের বেঞ্চি ছেড়ে উঠে এল বাপ্পার খুব কাছে। তারপর সিরিয়াস গলায় বলল, 'তোকে একটা কথা জিগ্যেস করব?'

বাপ্পা অবাক হয়ে মুখ তুলে তাকাল ওর দিকে। আমরাও খানিকটা বিমূঢ় হয়ে চেয়ে রইলাম শৌনকের চোখে।





শৌনক আবার বলল, 'একটা কথা তোকে জিগ্যেস করব?'

'কী কথা?' বাপ্পা জানতে চাইল।

জুমেলিয়াকে একবার দেখতে পেলেই তোর সাধ মিটবে?'

বাপ্পা অস্বাভাবিক ঝটকায় মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—।'

রমেশ এতক্ষণ গোবেচারাভাবে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল, এইবার বলে উঠল, 'ক্যায়সে দেখা যাবে?'

আমি আর ঐন্দ্রিলাও মুখে-চোখে একই প্রশ্ন ফুটিয়ে চেয়ে রইলাম শৌনকের দিকে।

শৌনক বাপ্পাকে আড়াল করে ঐন্দ্রিলার দিকে তাকিয়ে ষড়যন্ত্রের হাসি হাসল। তারপর বলল, 'আমরা পাঁচজন মিলে প্ল্যানচেটে বসব। ঐন্দ্রিলা মিডিয়াম হবে। জুমেলিয়ার সঙ্গে ওর ভালোরকম দোস্তি ছিল। সুতরাং আমার বিশ্বাস, প্ল্যানচেটে জুমেলিয়া দেখা দেবে।'

আমি কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম। একটু আগেই যে প্রেতচক্র নিয়ে ঐন্দ্রিলাকে ঠাট্টা-তামাসা করে নাজেহাল করছিল সে হঠাৎ সিরিয়াসলি প্রেতচক্রের কথা ভাবছে! আর শুধু তা-ই নয়, জুমেলিয়া যে দেখা দেবে সে-কথাও প্রায় নিশ্চিতভাবে বলছে!

আমি ইতস্তত করে বললাম, 'আমি ওতে নেই। প্ল্যানচেটের ব্যাপারে আমার ফান্ডা নেই।'

তিওয়ারি বলল, 'রঙ্গন, তুই বেকার ঘাবড়াচ্ছিস। ভূতে আমার জবরদস্ত ফান্ডা আছে।'

পৃথিবীতে হেন কোনও বিষয় নেই যাতে রমেশ তিওয়ারির ফান্ডা নেই। সাধে কি আমরা ওকে 'ফান্ডামেন্টাল তিওয়ারি' বলে খ্যাপাই!

ঐন্দ্রিলা বলল, 'তিওয়ারির ফান্ডার ওপরে ঠিক রিলাই করা যাবে না। রঙ্গন, তুই ব্যাপারটা নিয়ে একটু পড়াশোনা কর। আমি তোকে প্রচুর বইপত্র দেব। তোর হোমটাস্ক হয়ে গেলে আমরা কাজে নামব।'

আমি বাপ্পাকে দেখছিলাম। ওর মুখচোখে এক অদ্ভুত উজ্জ্বল আভা ফুটে উঠেছে। জুমেলিয়াকে একটিবার দেখার জন্যে ও সত্যিই পাগল হয়ে গেছে।

তিওয়ারি বলল, 'রঙ্গন পড়াশোনা করে করুক, হামি ভি থোড়াবহৎ স্টাডি করে আসব। কিন্তু কোথায় বসে প্ল্যানচেট করবি?'

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি শুরু করতেই শৌনক বলল, 'মাইকেলনগরে আমাদের বাগানবাড়িতে হবে। জায়গাটা জুমির হেবি পছন্দ ছিল।'

আমি বললাম, 'প্ল্যানচেটের ব্যাপারটা রাতে হলেই ভালো হয় বলে শুনেছি। যদি সেটাই হয়, তা হলে সে-রাতে আমরা ফিরতে পারব না। ঐন্দ্রিলা কি আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে? কাকিমা কি পারমিশান দেবেন?'

শৌনক অন্যরকম করে হাসল, বলল, 'আমি যখন আছি তখন পারমিশান পাওয়া যাবে। আমরা তো ফাইনাল পরীক্ষার পরই সেটল করব। কী বল, মিতি?'

'মিতি' ঐন্দ্রিলার ডাকনাম। শৌনক মাঝে-মাঝে ওকে এই নামে ডাকে। মজা করে বলে, 'ওর ডাকনামটা জ্যামিতি থেকে এসেছে।'

ঐন্দ্রিলা বলল, 'মাম্মির প্ল্যানচেটের ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্ট। তা ছাড়া জুমিকে চিনত। জুমি আমাদের বাড়িতে বেশ কয়েকবার গিয়েছিল। জুমিকে প্ল্যানচেট করা হবে শুনলে মাম্মি হয়তো আমার সঙ্গে যেতে চাইবে।'

শৌনক একেবারে হাততালি দিয়ে উঠল : 'তা হলে তো দারুণ হবে! কাকিমার হাতের রান্না খাওয়া যাবে —ঠিক পিকনিকের মতন...।'

বাপ্পাদিত্য বিড়বিড় করে বলল, 'জুমেলিয়াকে যদি দেখাতে পারিস, 'তোদের কাছে আমি এভার গ্রেটফুল থাকব।'

ঐন্দ্রিলা আমার দিকে আঙুল তুলে বলল, 'রঙ্গন, কাল থেকে তোমার প্ল্যানচেটের প্রজেক্ট শুরু—কালই আমি বড়জেঠুর কাছ থেকে একগাদা বইপত্র চেয়ে নিয়ে আসব।'

ব্যাপারটা সেদিন পিকনিক গোছের শুনিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোটেই সেরকম হয়নি।

ঐন্দ্রিলার দেওয়া বইপত্র নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছিলাম বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। কারণ ঘটনার দিন ঐন্দ্রিলা ওর মায়ের সঙ্গে মাঝবয়েসি এক ভদ্রলোককে নিয়ে হাজির হল।

মাইকেলনগর যাওয়ার পথে তাঁর সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হল। ভদ্রলোকের নাম প্রিয়নাথ জোয়ারদার—ভূত-প্রেতের ব্যাপারে আগ্রহের সীমা নেই। প্রেতাত্মাচর্চায় একেবারে ওস্তাদ মানুষ। ঐন্দ্রিলার বড়জেঠুর খুব বন্ধু। আমাদের প্ল্যানচেটের মতলবের কথা জানতে পেরে নিজেই আগ বাড়িয়ে সঙ্গী হতে চেয়েছে।

প্রিয়নাথ জোয়ারদারের মাথায় কপাল থেকে শুরু করে বেশ বড় মাপের টাক, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, দীর্ঘ সৌম্যকান্তি ফরসা চেহারা। পরনে গাঢ় রঙের প্যান্ট আর নীল-সাদা স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। পুরু ঠোঁটে সিগারেট।

ওঁকে দেখে সিনেমা বা নাটকের লোক বলে মনে হয়। ভূত-প্রেতের সঙ্গে ওঁর যে কোনওরকম সম্পর্ক থাকতে পারে তা অনুমান করা এককথায় অসম্ভব।

এরকম একজন বিচিত্র সঙ্গী পেয়ে মাইকেলনগর যাওয়ার পথে সময়টা দারুণ কাটল।

প্রিয়নাথের ভরাট গলা, আর কথাও বলেন ভারী চমৎকার। আমরা জুমির ব্যাপারটা ওঁকে জানিয়েছিলাম। এখন জুমিকে ঘিরে নানা ঘটনার কথা বলছিলাম। শুধু বাপ্পা চুপচাপ বসে ছিল, আর ঐন্দ্রিলাও ওর মায়ের পাশে বসে কেমন যেন আনমনা, উদাস—দেখে মনে হচ্ছিল, ভেতরে-ভেতরে জটিল কোনও অঙ্ক কষছে।

প্রিয়নাথ তখন বলছিলেন, 'জানো তো, ভূতচর্চা করি বলে সবাই আমার নাম দিয়েছে ভূতনাথ। তবে ওতে আমি কিছু মাইন্ড করি না। কোনও কিছু নিয়ে গবেষণা করাটা তো আর খারাপ না! এই ধরো না, এ-লাইনে না এলে আমি মাইকেল ফ্যারাডের ভূতের কথা জানতেই পারতাম না...।'

'মাইকেল ফ্যারাডের ভূত!' তিওয়ারি আর আমি অবাক হয়ে বললাম।

প্রিয়নাথ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, শুনতে অবাক লাগলেও মাইকেল ফ্যারাডের ভূত। ব্যাপারটা প্রথম রিপোর্টেড হয় ১৯৬২ সালে। রিপোর্ট করেছিলেন লন্ডনের ইম্পিরিয়াল কলেজের হেভি ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনিয়ারিং-এর অধ্যাপক ডক্টর এরিক লেইথওয়েট। লন্ডনের রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে তিনি বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলেন। বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি হঠাৎ টের পেলেন তাঁর কাছে ফ্যারাডের ছায়া-শরীর দাঁড়িয়ে আছে। ফ্যারাডের প্রেত তাঁকে যেন বলল, ''নাউ ইটস অলরাইট, ল্যাড। য়ু আর ডুয়িং ফাইন।'' লেইথওয়েট যখন অন্য বিজ্ঞানীদের এ-কথা জানালেন, তখন অনেকেই স্বীকার করেন যে, তাঁদেরও একইরকম অভিজ্ঞতা হয়েছে। তোমারা নিশ্চয়ই জানো, ১৮১৩ সালে রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে ফ্যারাডে স্যার হামফ্রি ডেভির ল্যাবরেটারি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কাজ করতেন। পরে, ১৮৩৩ সালে, তিনি ডেভির জায়গায় প্রফেসর অফ কেমিস্ট্রি হয়েছিলেন।'

হাতের সিগারেটে বেশ কয়েকবার টান দিয়ে প্রিয়নাথ সেটা গাড়ির জানলা দিয়ে ফেলে দিলেন। তারপর হেসে বললেন, 'লেইথওয়েটের ব্যাপারটা ওখানেই শেষ হয়নি। ১৯৬৪ সালে ক্রিসমাসের ছুটিতে লেইথওয়েট আবার রয়্যাল ইন্সটিটিউশনে যান। উদ্দেশ্য ছিল, স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্যে বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দেওয়া। এ-ধরনের বক্তৃতামালার ব্যাপারটা ফ্যারাডে নিজেই একসময় শুরু করেছিলেন। তো বক্তৃতার মাঝে একদিন লেইথওয়েট দর্শকদের সামনে একটা পরীক্ষা সরাসরি করে দেখাতে চাইলেন। দুটো তারের কয়েল নিয়ে একটা ইলেকট্রিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট। এক্সপেরিমেন্টটা ঠিকঠাক হলে কয়েলে কারেন্ট পাঠানোমাত্রই একটা প্লেট থেকে একটা বল ছিটকে লাফিয়ে উঠবে। আর যদি ঠিক সময়ে কারেন্ট পাঠানো না হয় তা হলে বলটা প্লেটের ওপরে শুধু এপাশ-ওপাশ ঠকঠক করে কাঁপবে—লাফিয়ে উঠবে না।

'তো লেইথওয়েট দু-বার পরীক্ষাটা করার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সাকসেসফুল হলেন না। এটা কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার না—কারণ, লেইথওয়েট অঙ্ক কষে দেখেছিলেন এক্সপেরিমেন্টটা ৬৯৬ বার চেষ্টা করলে একবার মাত্র সফল হওয়া সম্ভব। সুতরাং তিনি আবার এক্সপেরিমেন্ট শুরু করার তোড়জোড় করতে লাগলেন। ঠিক তখনই একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল। লেইথওয়েটের কানে কে যেন ফিসফিস করে বলল, তৃতীয়বারে এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেসফুল হবে। ইচ্ছে করলে লেইথওয়েট আগেভাগেই সেটা দর্শকদের জানিয়ে দিতে পারেন। লেইথওয়েট ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু কী ভেবে তিনি সত্যি সত্যিই দর্শকদের আগাম জানিয়ে দিলেন যে, এইবার পরীক্ষাটা সফল হবেই।'

একটু থামলেন প্রিয়নাথ। তারপর ছোট্ট করে হেসে বললেন, 'সত্যি-সত্যিই থার্ডবারে এক্সপেরিমেন্টটা সাকসেসফুল হয়েছিল।'

কাকিমা—মানে, মিতির মা—জিগ্যেস করে বসলেন, 'কানে-কানে কে ওইরকম কথা বলেছিল?'

প্রিয়নাথ এবার শব্দ করে হাসলেন : 'সেটাও কি আর বলতে হবে!'

আমি মাইকেল ফ্যারাডের কথা ভাবছিলাম, কোথা থেকে জুমি তার মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পেলাম জুমেলিয়া আমাকে বলছে, 'চটপট কর— তোদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি যে ছটফট করছি।'

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই যশোর রোড থেকে বাঁদিকে বাঁক নিয়ে আমাদের গাড়ি মাইকেলনগরে ঢুকে পড়ল।

অন্ধকার কখন যেন পা টিপে-টিপে নেমে এসেছে। রাস্তার সামান্য আলো কিংবা ছোটখাটো দোকানপাটের আলো তাকে ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু আমার মনে হল, অন্ধকার যেন শিকারি

বাঘের মতো গাছ-গাছালির মাথায় ওত পেতে অপেক্ষা করছে—সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে সব গ্রাস করবে।

প্রিয়নাথ বললেন, 'তোমরা সবাই জুমেলিয়ার কথা ভাবো। প্ল্যানচেট সাকসেসফুল হওয়ার জন্যে এটা খুব জরুরি।'

শৌনক বলল, 'আমরা তো রাত দশটায় বসব। তা হলে এখন থেকেই ভাবার কী দরকার।'

মিতি ওকে প্রায় বকুনি দিয়ে বলল, 'এসব ব্যাপারে আঙ্কল এক্সপার্ট। আঙ্কল যা বলেন তা-ই শুনবি।'

তিওয়ারি বলল, 'আমি কিন্তু শুরুসেই তনমন দিয়ে জুমির কথাই ভাবছি। খেয়াল করেছিস, আমরা ওর অ্যাক্সিডেন্টের স্পটের ওপর

দিয়েই এলাম।'

ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি, কিন্তু ইচ্ছে করেই সে-কথা আর মুখে উচ্চারণ করিনি। কিন্তু রমেশটার তো কাণ্ডজ্ঞান নেই। দেখলাম, বাপ্পা দু-হাতে মুখ ঢেকে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে।

শৌনকদের বাগানবাড়ির পাশের মাঠে গাড়ি রেখে আমরা লোহার সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। শৌনকের ডাকে বাগানবাড়ির কেয়ারটেকার মতিলাল এসে তালা খুলে দিল। দরজার পাল্লা ঠেলতেই গা-শিউরে-ওঠা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হল।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, মাত্র তিনমাস আগে এই বাগানবাড়িতে এসে আমরা কত হইহুল্লোড় করে গেছি। তখন জায়গাটাকে দারুণ লেগেছিল। অথচ আজ এখানে ঢুকতেই কীরকম যেন গা ছমছম করছে।

বাগানের গাছ-গাছালির পাশ দিয়ে এগোতে-এগোতে শৌনক প্রিয়নাথকে লক্ষ্য করে বলল, 'আঙ্কল, আজ আমাদের মিশন-সাকসেসফুল হবেই।' তারপর ঐন্দ্রিলার দিকে তাকিয়ে : 'কী বল, মিতি?'

ঐন্দ্রিলা আনমনাভাবে বলল, 'হ্যাঁ, হতেও পারে।'

প্রিয়নাথ শৌনককে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কী করে এত শিওর হচ্ছ বলো তো? তুমি কি কিছু ফিল করছ? অনেক সময় প্রেতাত্মারা আসার আগে মনের ওপর ছাপ ফেলে জানান দেয়।'

শৌনক খানিকটা বিব্রতভাবে বলল, 'না, সেরকম কিছু না—এমনি মনে হচ্ছে।'

প্রিয়নাথ আর কোনও কথা বললেন না। তবে ওঁর কপালে কয়েকটা ভাঁজ যেন চোখে পড়ল।

আমরা শৌনকদের বাড়িতে ঢুকে পড়লাম।

প্রায় দেড়কাঠা জুড়ে দোতলা বাড়ি। শৌনকের দাদুর নামে বাড়িটার নাম রাখা হয়েছে 'ভুজঙ্গ নিবাস।' বাড়িটার বয়েস তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর হবে। বাড়িতে ঢুকেই কাকিমা আর মিতি রান্নাঘরের দিকে রওনা হল। প্রথমে আমাদের চা-জলখাবারের ব্যবস্থা, তারপর রাতের আয়োজন। আমরা সাতজন যে আজ এখানে আসব, থাকব, সে-কথা মতিলালকে আগেই টেলিফোনে বলা ছিল। তাই সব ব্যবস্থা ও আগেই করে রেখেছিল। কিন্তু কাকিমা আর মিতি রান্নাঘরের দিকে রওনা হতেই প্রিয়নাথ ওদের ডাকলেন : মিসেস ঘোষ, এক মিনিট—একটু দাঁড়িয়ে যান।'

প্রিয়নাথ আঙ্কলকে ঘিরে আমরা ছ'জন দাঁড়িয়ে পড়লাম। ওঁর কথা শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বালবের আলোয় বিশাল হলঘরে আমাদের লম্বা লম্বা ছায়া পড়েছে।

প্রিয়নাথ কখন যেন আমাদের দলপতি হয়ে পড়েছেন। একটু কেশে নিয়ে হাতঘড়ি দেখে তিনি বললেন, 'এখন ছ'টা বাজে। ঠিক ন'টায় আমরা খেতে বসব। সেই বুঝে রান্নাবান্না করবেন। আর ঠিক দশটায় আমরা প্রেতচক্র শুরু করব। এ ছাড়া আর-একটা কথা—এখন থেকে প্রতিটি মুহূর্ত আমরা জুমেলিয়ার কথা ভাবব, ওকে নিয়ে আলোচনা করব। তা হলে ও বুঝতে পারবে, ওকে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমি আগে গোটা বাড়িটা একটু ঘুরে দেখে নিই, তারপর ঠিক করব কোন ঘরে বসলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে। ব্যস, এবার আপনারা রান্নাঘরে যান। তবে সময়টা মনে রাখবেন—রাত ঠিক দশটায় কাঁটায়-কাঁটায়।'

কাকিমা আর মিতি চলে যেতেই প্রিয়নাথ আমাদের বললেন, 'তোমরা বাড়িটায় ঘুরে ফিরে বেড়াতে পারো, বই-টই পড়তে পারো, এ-ঘরে টিভি দেখতে পারো—শুধু বাড়ির বাইরে কোথাও যাবে না—এমনকী বাগানেও না। আর শৌনক, তুমি আমার সঙ্গে একটু থাকো, আমাকে একটু হেল্প করো।'

প্রিয়নাথ সঙ্গে করে মাঝারি মাপের একটা ব্রিফকেস নিয়ে এসেছিলেন। সেটা দেখে মিতি কী জিগ্যেস করতেই তিনি হেসে বললেন, 'ওতে ভূত নামানোর সরঞ্জাম আছে। আবার অনেক সময় ভূত তাড়ানোর জিনিসপত্তরও থাকে।'

ব্রিফকেসটা হলঘরের একপাশে রাখা ছিল। সেটা হাতে নিয়ে প্রিয়নাথ শৌনকের সঙ্গে বাড়ি পরিদর্শনের কাজে এগোলেন।

ঠিক তখনই এরোপ্লেনের শব্দ শুনতে পেলাম।

শৌনকদের বাগানবাড়িটা এয়ারপোর্টের এত কাছে যে, সবসময়ই এরোপ্লেন ওঠা-নামার বিকট শব্দ শোনা যায়।

বাপ্পাদিত্য হলঘরের একটা খোলা জানলার সামনে বসে ছিল। লক্ষ করলাম, জানলার বাইরেটা এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাপ্পা বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে চেষ্টা করছে।

তিওয়ারি হলঘরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। হঠাৎই আমার কাছে এসে বলল, 'অ্যাই, রঙ্গন—কুছ টের পাচ্ছে?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'না তো!'

ও চাপা গলায় বলল, 'আমি টের পাচ্ছে। আমি ঘরের ওই কোণটায় গিয়েছিল—ওই আলমারিটার পাশে। তো শুনলাম, কে যেন খুব সফটলি বলল, ''রমেশ, আমি তোকে ফোন করব।'' কী বলব তোকে...একদম স্পষ্ট জুমেলিয়ার গলা। রঙ্গন, ইয়ার, মেরা তো ডর লগ রহা হ্যায়।'

আমি তিওয়ারিকে ইশারায় চুপ করতে বললাম। আমার ভয় হচ্ছিল, বাপ্পা এ-কথা শুনতে পেলে আপসেট হয়ে পড়বে। কিন্তু তিওয়ারি কি ভুল বকছে? আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ের ছাপ দেখতে পেলাম। তাই সাহস দেওয়ার জন্যে বললাম, 'ভয়ের কিছু নেই। প্রিয়নাথ আঙ্কল আমাদের সঙ্গে আছেন।'

তিওয়ারিকে দেখে মনে হল না খুব একটা ভরসা পেল। ও তাড়াতাড়ি গিয়ে টিভির সুইচ অন করে দিল। তারপর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল টিভির সামনে।

আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। শৌনকদের বাড়িটা আজ কেমন যেন অদ্ভুত লাগছিল। এ-বাড়ির সব ঘরেই সাধারণ বালব—কোনও টিউব লাইট নেই। পিকনিকের দিন তাতে কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আজ বালবের আলো কেমন মলিন রহস্যময় লাগছে। আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত দীর্ঘমাপের বিকৃত সব ছায়া। আমাদেরই চেনা জিনিসের ছায়া, অথচ কেমন অচেনা লাগছে।

আবার একটা প্লেনের শব্দ শুনতে পেলাম।

মনে পড়ে গেল, জুমিরা গত বছর প্লেনে করে আন্দামান বেড়াতে গিয়েছিল।

কী আশ্চর্য! আমরা দেখছি ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যে-কোনও প্রসঙ্গে জুমেলিয়াকে জড়িয়ে ফেলছি! তিওয়ারি কি তা হলে টেলিফোনের কথা ভাবছিল? ফার্স্ট ইয়ারে পড়ার সময় ও প্রায়ই জুমিকে ফোন করত।

এমন সময় টেলিফোনের রিং শুনতে পেলাম। দোতলায় ফোন বাজছে। তিওয়ারি আর বাপ্পাকে বলে আমি দোতলায় রওনা হলাম। রাত যত ঘন হচ্ছে, ততই যেন শীত-শীত ভাবটা বাড়ছে। অথচ পথে আসার সময় শীত খুব একটা টের পাওয়া যায়নি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনেই একটা ছোট মাপের ঘর। সে-ঘরেই টেলিফোনটা রাখা আছে। ঘরে পা দিয়েই দেখি শৌনক রিসিভার হাতে দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখেই চোখ টিপে বলল, 'নে, তোর ফোন। সুছন্দা।'

সুছন্দা এখানে ফোন করবে জানতাম। তাই টেলিফোনের শব্দ পেয়েই ওপরে রওনা হয়েছিলাম। ফোনে কথা বলতে-বলতেই নজরে পড়ল, পাশের ঘরে প্রিয়নাথ ব্যস্তভাবে চলাফেরা করে কীসব করছেন।

শৌনকের দিকে তাকাতেই ও ইশারা করে বলল। ওই ঘরটাকেই প্রিয়নাথ প্ল্যানচেটের জন্যে পছন্দ করেছেন।

আমি জানি, ওই ঘরটার পরেই আছে লম্বা বারান্দা। আর তার পাশেই কাদের যেন বিশাল বাগান। সেই বাগান গাছ আর আগাছা সমান দাপটে রাজত্ব করে।

সুছন্দার সঙ্গে কথা বলতে-বলতে আমি খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ছিলাম। অন্ধকারে জোনাকি পোকার আলো চোখে পড়ছিল। আর কেন জানি না, জুমেলিয়ার কথা খুব মনে পড়ছিল।

বালবের আলোয় দেওয়ালে আমার ছায়া নড়ছিল। সেই বিচিত্র ছায়ার দিকে তাকিয়ে আমার মন হঠাৎই বলে উঠল, 'আজ রাতে জুমির সঙ্গে দেখা হবে।'

অন্ধকারে, হাতে হাত ধরে আমরা জুমেলিয়ার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

একটা টেবিলকে ঘিরে আমরা ছ'জন চুপচাপ বসেছিলাম, আর প্রিয়নাথের নির্দেশমতো জুমেলিয়ার কথা ভাবছিলাম।

ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ। এক কোণে একটা কাঠের বাক্সের আড়ালে একটা বড় মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির আলো দেওয়ালে পড়ে আবছা একটা আলোর আভা তৈরি করেছে। আলোটা যাতে মলিন হয় সেজন্যে প্রিয়নাথ আড়ালের ব্যবস্থা করেছেন। আমাদের সামনে টেবিলে একটা ডিজিটাল থার্মোমিটার আর কম্পাস রয়েছে। মাঝে-মাঝে পেনসিল-টর্চ জ্বেলে প্রিয়নাথ সে-দুটোর রিডিং দেখছেন। প্রিয়নাথের পাশেই বসেছে বাপ্পাদিত্য—ওর সামনে একটা বড় সাদা কাগজ আর পেনসিল।

প্রিয়নাথ ফিসফিস করে বললেন, 'বাপ্পা, আমি বললেই তুমি পেনসিলটা হাতে তুলে নেবে, আলতো করে ধরে রাখবে কাগজের ওপরে—যাতে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে কেউ তোমাকে দিয়ে কিছু লিখিয়ে নিতে পারে।'

বাপ্পা চাপা গলায় বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু পেনসিল ধরতে গেলে তো আমাকে রঙ্গনের হাত ছেড়ে দিতে হবে!'

'ছেড়ে দেবে।' প্রিয়নাথ তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'রঙ্গন, তুমি তখন বাপ্পাকে টাচ করে থাকবে।'

বাপ্পার ডানপাশ থেকে আমি জবাব দিলাম, 'ও. কে.।'

'ব্যস, আর কোনও কথা নয়—।'

শৌনক জিগ্যেস করল, 'আমিও কি কাগজ-পেনসিল নেব?'

প্রিয়নাথ সিদ্ধান্তের সুরে বললেন, 'না।' একটু থেমে তারপর : 'আমি নাম ধরে না ডাকলে কেউ সাড়া দিয়ো না। মিসেস ঘোষ, আপনিও না।'

আবার সব চুপচাপ।

একটা ব্যাপার আমার অদ্ভুত লাগছে। যে-শৌনক কখনও ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করে না, সবসময় প্ল্যানচেট ইত্যাদি নিয়ে রঙ্গ-ব্যঙ্গ করে, সে যেন এই প্ল্যানচেটের ব্যাপারে এসে থেকেই অতি-আগ্রহ দেখাচ্ছে। আর বারবার বলছে, আমাদের মিশন সাকসেসফুল হবেই।

ঐন্দ্রিলা আমাদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বসে নেই। কারণ, ও মিডিয়াম হয়েছে। প্রিয়নাথ ওকেই মিডিয়াম হিসেবে বেছে নিয়েছেন। কাকিমা এ-ব্যাপারে সামান্য খুঁতখুঁত করলেও শৌনক আর ঐন্দ্রিলার উৎসাহের কাছে তাঁর অনিচ্ছা ভেসে গেছে। তা ছাড়া প্রিয়নাথ বলেছেন, আমাদের মধ্যে ঐন্দ্রিলাই সবচেয়ে ভালো মিডিয়াম হবে—কারণ, ও জুমেলিয়ার সমবয়েসি মেয়ে।

ঘরের সবচেয়ে গাঢ় অন্ধকার অংশে মিতি স্থির হয়ে বসে আছে। ওকে দেখতে না পেলেও ওকে আমরা অনুভব করতে পারছি। ওর হাত দুটো সরু সাদা সুতো দিয়ে বেঁধে দিয়েছেন প্রিয়নাথ। বাঁধার সময় তিওয়ারি বলেছে, 'এ কাচ্চে ধাগে তো স্যার টান মারলেই ছিঁড়ে যাবে!'

প্রিয়নাথ উত্তরে বলেছেন, 'ঐন্দ্রিলা তো আর নিজে-নিজে সুতো ছিঁড়বে না। যাকে আমরা ডাকছি সে যদি চায় তবেই সুতো ছিঁড়বে।'

আমরা চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগলাম। শুধু আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে লাগল। আর মাঝে-মাঝে এরোপ্লেনের শব্দ। তবে বুকের ভেতর একটা ঢিপঢিপ শব্দও যেন টের পাচ্ছিলাম।

হঠাৎই জোরে শ্বাস ফেলার মতো 'ফোঁস' করে একটা শব্দ হল। আর তারপরই আমাদের টেবিলটা সামান্য নড়ে উঠল।

প্রিয়নাথ সঙ্গে সঙ্গে পেনসিল-টর্চ জ্বেলে কম্পাস ও থার্মোমিটার দেখলেন। আমিও সেদিকে চোখ রাখলাম। কম্পাসের কাঁটা উত্তর দিকে মুখ করে স্থির হয়ে আছে, আর থার্মেমিটারে উষ্ণতা ১৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস—প্রেতচক্রে বসার আগে যা ছিল প্রায় তাই।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার বলেছিলেন, কোনও প্রেতাত্মার উপস্থিতিতে কম্পাসের কাঁটা যে-কোনও দিকে মুখে করে অস্থিরভাবে ছটফট করতে থাকে। অনেক সময় বনবন করে পাক খায়। আর উষ্ণতা নামতে থাকে নীচের দিকে।

ফলে আমি একটু স্বস্তি পেলাম।

প্রিয়নাথ চাপা অথচ স্পষ্ট গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কেউ কি এসেছেন?'

কোনও উত্তর পাওয়া গেল না। তবে মনে হল যেন, আচমকা শ্বাস টানার একটা শব্দ পেলাম। তারপর সব চুপচাপ।

বাপ্পা বোধহয় টেনশান আর সইতে পারছিল না। প্রিয়নাথের নিষেধ না মেনে ও ফিসফিসে স্বরে প্রশ্ন করল, 'কে, জুমি?'

আমাদের পাথর করে দিয়ে ফিসফিস করে কেউ জবাব দিল, 'হ্যাঁ—।'

শব্দটা একটানা সুরে দীর্ঘশ্বাসের মতো বেরিয়ে এল। যেন বিশাল কোনও বেলুন থেকে ধীরে-ধীরে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয়নাথ উত্তেজিতভাবে ধমক দিয়ে বললেন, 'বাপ্পা কী হচ্ছে!' তারপর অন্ধকার লক্ষ্য করে আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'কেউ কি এসেছেন?'

কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।

কিন্তু পরক্ষণেই যা দেখলাম তাতে আমার চেতনায় কেউ যেন ভারী একটা হাতুড়ি দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করল।

মিতি কখন যেন ওর চেয়ার ছেড়ে উঠে এসেছে। মোমবাতির আলোর সামান্য আভায় ওকে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এ কোন মিতি!

ও কালচে রঙের একটা চুড়িদার পরেছিল—সেটা এখন ভৌতিক আলখাল্লার মতো লাগছে। ওর মুখে মূকাভিনেতাদের মতো সাদা রং মাখা। কেউ কি রং মাখিয়েছে, নাকি ভয় ফ্যাকাসে হয়ে ওর মুখের এই চেহারা দাঁড়িয়েছে! ওর মুখের সাদা রঙের জন্যেই ওর ঠোঁটের বাঁ দিকে একটা কালো জড়ুল নজরে পড়ল—ঠিক জুমেলিয়ার মতো। কিন্তু মিতির মুখে তো কোনও জড়ুল নেই! হঠাৎ করে এ-জড়ুল এল কোথা থেকে!

হাত দুটো বিচিত্র ভঙ্গিতে মাথার ওপরে তুলে মিতি এপাশ-ওপাশ দুলছিল। বড়-বড় শ্বাস ফেলতে-ফেলতে ও বাপ্পাদিত্যর নাম ধরে ফিসফিস করে দু-বার ডেকে উঠল।

প্রিয়নাথ চাপা গলায় আদেশের সুরে বললেন, 'বাপ্পা, পেনসিল নিয়ে রেডি হও—।'

বাপ্পার হাত যে কাঁপছিল সেটা আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম। ও আমার হাত ছেড়ে পেনসিল নিয়ে তৈরি হল। আমি অন্ধকারেই আন্দাজ করে ওর কাঁধ ছুঁয়ে বসে রইলাম।

প্রিয়নাথ পেনসিল-টর্চ জ্বেলে কম্পাস আর থার্মোমিটার দেখলেন। সেখানে কোনও পরিবর্তন নজরে পড়ল না। তিনি উৎকণ্ঠিত গলায় প্রশ্ন করলেন, 'কেউ কি এসেছেন?'

উত্তরে ঐন্দ্রিলা খলখল করে হেসে উঠল।

কাকিমা একটা ভয়ের চিৎকার দিয়ে উঠলেন। টেবিলে খটখট করে কয়েকবার শব্দ হল। আমার বুকের ভেতরে একটা পাগল তখন দুরমুশ পিটছিল।

এমন সময় একটা এরোপ্লেনের শব্দ শোনা গেল।

শৌনকদের বাড়ির ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া প্রতিটি প্লেনের শব্দ ঠিক একইভাবে ক্ষীণ থেকে শুরু হয়ে জোরালো হয়, তারপর গোঁ-গোঁ শব্দটা কমজোরি হয়ে ক্রমে দূরে মিলিয়ে যায়।

কিন্তু এইবারের শব্দটা আচমকা মাঝপথে থেমে গেল। কেউ যেন গলা টিপে একটা কথা-বলা পুতুলকে থামিয়ে দিল।

ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম। প্লেনটা আকাশ থেকে গেল কোথায়! কিন্তু ভাবার আর সময় পেলাম না। কারণ, ঠিক তক্ষুনি ঐন্দ্রিলা পাগলের মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

সে কী মাথা ঝাঁকানি! যেন একটা 'মাথা-নাড়া বুড়ো' পুতুলের পা ধরে কেউ পাগলের মতো ঝাঁকাচ্ছে।

ওই অবস্থাতেই মিতি বাপ্পার নামটা ফিসফিস করে বলছিল।

বাপ্পা ডুকরে কেঁদে উঠল। কাগজের ওপরে ওর পেনসিল ধরা হাত খসখস শব্দে চলতে লাগল।

আর স্পষ্ট টের পেলাম ঘরের উষ্ণতা কমছে। ভীষণ শীত করছে আমাদের।

প্রিয়নাথ পেনসিল-টর্চ জ্বেলে থার্মোমিটার আর কম্পাস দেখলেন। ঘরের উষ্ণতা প্রায় ১০ ডিগ্রি, আর কম্পাসের কাঁটাটা বনবন করে ঘুরছে।

প্রিয়নাথ একরকম চিৎকার করেই জিগ্যেস করলেন, 'কেউ কি এসেছেন?'

উত্তরে মিতি আবার খলখল করে হেসে উঠে অদ্ভুত চেরা গলায় বলল, 'এখনও তুই বুঝিসনি?'

পাশের ঘরের টেলিফোনটা হঠাৎই পাগলা-ঘন্টির মতো বাজতে শুরু করল। এরকম দ্রুত লয়ে কখনও আমি টেলিফোন বাজতে শুনিনি।

একটা জানলা 'দড়াম' করে খুলে গেল। ঠান্ডা বাতাস সাপের মতো পাক খেয়ে ঢুকে পড়ল ঘরে। তারপর প্রলয়নৃত্য নাচতে শুরু করল।

আমাদের অবাক করে দিয়ে বাতাসের সঙ্গে-সঙ্গে ঢুকে পড়ল অসংখ্য জোনাকি। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি জোনাকি। অন্ধকার ঘরে আগুনের ফুলকি হয়ে ওরা ঝাঁক বেঁধে ভেসে বেড়াতে লাগল। ওদের এলোমেলো ভেসে বেড়ানো দেখে বাতাসের স্রোত বোঝা যাচ্ছিল।

তিওয়ারি আর্তনাদের মতো একটা শব্দ করল। তারপর চেঁচিয়ে উঠল, 'ভাগজোগনি। ভাগজোগনি! জুগনু! জগনু!'

ততক্ষণে ঠান্ডায় আমরা ঠকঠক করে কাঁপতে শুরু করেছি। আর কাকিমা 'মিতি! মিতি!' বলে ডেকে-ডেকে হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করেছেন।

মিতি পাগলের মতো মাথা-ঝাঁকাচ্ছিল। হঠাৎই ও শক-খাওয়া মানুষের মতো ছিটকে পড়ল মেঝেতে। টেলিফোনের ঘণ্টি তখনও কিন্তু থামেনি।

প্রিয়নাথ চেঁচিয়ে বললেন, 'শৌনক, লাইট জ্বেলে দাও।' তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে ছুটে গেলেন মোমবাতির কাছে। ওটা তুলে নিয়ে ঐন্দ্রিলার কাছে গেলেন।

ঘরের মধ্যে ঠিক কী যে হচ্ছিল মনে করে বলতে পারব না। শুধু মনে আছে এলোমেলো ভয়ের চিৎকার, কথাবার্তা, আর টেলিফোনের পাগলা-ঘণ্টি।

শৌনক ঘরের আলো জ্বেলে দিয়ে চিৎকার করে বলল, 'এক মিনিট। সবাই শোনো। এসবে ভয়ের কিছু নেই। এই ব্যাপারটা পুরোটাই সাজানো নাটক।'

মুহূর্তে সব চিৎকার চেঁচামেচি থেমে গেল। শৌনক ফোন ধরার জন্যে এগোতেই ফোনের ঘণ্টিও আচমকা 'চুপ' করে গেল।

আমরা সবাই তখন মিতিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছি। ও চোখ বুজে মেঝেতে চিত হয়ে পড়ে আছে।

কিন্তু এ কী অদ্ভুত চেহারা হয়েছে মিতির!

ওর সারা মুখে সাদা রং। ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। ঠোঁটের বাঁদিকে একটা কালো জড়ুল আঁকা রয়েছে।

প্রিয়নাথ মিতির ওপরে ঝুঁকে পড়ে ওকে নানাভাবে পরীক্ষা করছিলেন। শৌনক ওঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ঠাট্টার হাসি হেসে বলল, 'আঙ্কল, আপনি উঠে পড়ুন। মিতির কিস্যু হয়নি। বাপ্পাকে একটু সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্যে আমি আর মিতি নকল ভূত নামানোর প্ল্যান করেছিলেন। ওর হাতব্যাগে মেকাপের জিনিস ছিল। অন্ধকারে লুকিয়ে মুখে মেখে নিয়েছে। আর জুমেলিয়ার এফেক্ট আনার জন্যে ভুরু আঁকার পেনসিল দিয়ে জড়ুলটা এঁকে নিয়েছে।' কথা শেষ করেই শৌনক হো-হো করে হেসে উঠল : 'তবে সবাই যে এরকম ব্যাপক ভয় পেয়ে যাবে ভাবিনি।'

রমেশ তিওয়ারি হতভম্ব মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। জোনাকিগুলোর দিকে দেখিয়ে আমতা-আমতা করে শৌনককে জিগ্যেস করল, 'তা হলে এই ভাগজোগনিগুলো কোথা থেকে এল?'

জোনাকিগুলো তখনও ঘরের ভেতর উড়ছিল। তবে ঘরের আলোয় ওদের অনেক নিষ্প্রভ লাগছিল।

শৌনক থতমত খেয়ে বলল, 'জানি না—।'

প্রিয়নাথ কপালে হাত চেপে মিতির পাশে উবু হয়ে বসেছিলেন। শৌনকের দিকে ঘুরে তাকিয়ে গম্ভীর গলার প্রশ্ন করলেন, 'টেলিফোনটা অমন পাগলের মতো বাজছিল কেন? প্লেনের গর্জনটাই বা মাঝপথে অমন থেমে গেল কেন? আর ঐন্দ্রিলা যেভাবে মাথা ঝাঁকাচ্ছিল মানুষ কি অমনভাবে মাথা ঝাঁকাতে পারে?'

শৌনক কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। বিব্রত অপরাধী মুখে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কাকিমা মিতির ওপরে ঝুঁকে পড়তে যাচ্ছিলেন, প্রিয়নাথ চিৎকার করে ওঁকে বাধা দিলেন : 'খবরদার, এখন ওর কাছে এগোবেন না!'

আমি যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলাম, শৌনক আর ঐন্দ্রিলা মিলে এসব কারসাজি করেছে? তা হলে টেম্পারেচার এরকম কমে গেল কেমন করে! বেশ শীত করছে...তা ছাড়া কম্পাসের নিডলটাই বা অমন বনবন করে ঘুরছিল কেন?'

শৌনক বলল, 'টেবিলের শব্দগুলো আমি করেছিলাম। আর কথা ছিল, মিতি বাপ্পার নাম ধরে কয়েকবার ডাকবে। ও আর কিছু করছে কি না আমি জানি না। ওকে ডাকুন—ও বলতে পারবে।'

ঐন্দ্রিলার ওপরে ঝুঁকে পড়ে শৌনক ডেকে উঠল, 'মিতি! মিতি! ওঠ, সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছে—।'

চিৎ হয়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা ঐন্দ্রিলা কোনও সাড়া দিল না।

প্রিয়নাথ ওর কবজি ধরে বসেছিলেন। আমাদের ভয় পাওয়া মুখগুলোর দিকে একপলক নজর বুলিয়ে তিনি ভারী গলায় বললেন, 'ও আর উঠবে না। শি ইজ ডেড। আমি এতক্ষণ ধরে ওর পালস খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। যদি পারো তো কেউ একজন ডাক্তার ডেকে আনো।'

প্রিয়নাথের কথায় আকুল ঝড় বয়ে গেল ঘরে।

শৌনক মিতির নাম ধরে পাগলের মতো ডেকে উঠে ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল। কাকিমার বুকফাটা কান্না শুরু হয়ে গেল একই সঙ্গে। কিন্তু আবেগের ঝড় বেড়ে ওঠার আগেই বাজ পড়ার মতো একটা শব্দ হল, টেলিফোনটাও আগের অদ্ভুত ঢঙে হঠাৎই বাজতে শুরু করল। মোমবাতির আলোটা একবার কেঁপে উঠেই নিভে গেল। কিন্তু বালবের আলোয় আমাদের দেখতে কোনও অসুবিধে হল না।

মিতির মৃতদেহের মুখটা ধীরে-ধীরে হাঁ হয়ে যেতে লাগল। দেখতে-দেখতে ওর টুকটুকে লাল ঠোঁটজোড়া ফাঁক হয়ে গোল গর্তের চেহারা নিল। একটা অপার্থিব হাসি শোনা গেল ওর মৃতদেহের ভেতর থেকে। আর

তারপরই একটা সবুজ রঙের মুখ দেখা গেল ওর মুখের গহ্বরে। ওর ঠোঁট চিরে মুখের গর্ত দিয়ে প্রাণপণ চাপে ঠেলে বেরিয়ে এল মাথাটা। গোটা মাথায় কেমন এক চকচকে লালা জড়ানো।

মাথাটা মাপে ছোট ফুটবলের মতো। চোখ দুটো টানা-টানা ঢুলু-ঢুলু। সারা মুখে অসংখ্য ভাঁজ। আর ঠোঁটের বাঁদিকে একটা কালো জড়ুল।

মাথাটা নেশাগ্রস্ত চোখে এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে আমাদের একবার দেখল। তারপর ফিসফিসে হিমেল স্বরে বলল, 'বাপ্পা, এবার যাই।'

প্রিয়নাথ একলাফে ছিটকে চলে গেলেন ওঁর ব্রিফকেসের কাছে। কিন্তু তার বেশি কিছু করে ওঠার আগেই ঐন্দ্রিলার মৃতদেহ আচমকা চোখ খুলে তাকাল। এবং একটা 'ফট' শব্দ করে ঘরের বালবটা কেটে গেল।

ঘরের মধ্যে ভয়ার্ত চিৎকারের ঝড় উঠল আবার। আরও দুটো জানলা 'দড়াম' করে খুলে গেল। জানলার পাল্লাগুলো দেওয়ালে এলোপাতাড়ি বাড়ি খেতে লাগল। আর অসংখ্য জোনাকির স্রোত ঘরে হাউইবাজির মতো পাক খেয়ে মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল।

আমাদের ভীষণ শীত করছিল। ভয়ে আর ঠান্ডায় আমরা সকলে ঠকঠক করে কাঁপছিলাম। অন্ধকারে নজর চলছিল না। কিন্তু তারই মধ্যে দেখলাম, একরাশ কালো ধোঁয়া ঘরের আঁধার থেকে ভেসে উঠে জানলা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর জোনাকিগুলো যেন এক পৈশাচিক উল্লাসে ঘরের বাতাসে মাতালের মতো নাচছে...নাচছে...নাচছে।

তারই মধ্যে কাকিমার সর্বহারা মর্মান্তিক কান্না আমার কানে আসছিল।

আমরা সবাই অসহায়ের মতো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম।





# নন্দিনীর রাতের স্বপ্ন

মৃত্যু নিয়ে কথা হচ্ছিল।

প্রিয়নাথ জোয়ারদারকে কাছে পেলেই কী করে যেন অলৌকিক অপার্থিব ঘটনার কথা চলে আসে। প্রিয়নাথের বাড়ি রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে। এ-পাড়ার বেশিরভাগ বাড়িই বেশ পুরোনো। কোনও-কোনও বাড়ি পলেস্তারা খসে-পড়া চেহারার, অথচ দু-মহলা। কোনও বাড়ির দালানে রয়েছে গৃহদেবতার মন্দির, কোনও বাড়ি থেকে কাক-ভোরে শোনা যায় স্তোত্রপাঠ, আবার কোনও বাড়ির ভেতর থেকে ভেসে আসে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কলি। এসব বাড়ির আনাচে-কানাচে কার্নিশে গোলাপায়রার রমরমা।

এ-ধরনের পুরোনো পাড়ায় যেমন রোয়াক-কালচার রয়েছে তেমনই আছে বৈঠকি আড্ডার আসর। সুপ্রকাশ পালিতের বৈঠকখানায় এরকমই এক নিয়মিত আসর বসে। সন্ধেবেলার এই আসরে সবরকম বিষয় নিয়েই চর্চা হয়। কিন্তু প্রিয়নাথ হাজির থাকলেই কেমন এক ঘোরালো- প্যাঁচালো পথে আলোচনা শেষ পর্যন্ত ভূত-প্রেত অশরীরী-অলৌকিকে গিয়ে দাঁড়ায়।

আজ সেই সকাল থেকেই আকাশ মেঘভাসি। তারপর দুপুরবেলা ধারাপাতের প্রথম পাতার শুরু। যতই সময় গড়িয়েছে বৃষ্টির দুঃখ ততই বেড়েছে। তাই হাঁটুজল ঠেলে সুপ্রকাশ পালিতের বৈঠকখানায় মাত্র চারজন এসে হাজির হয়েছেন। রাস্তায় জমে থাকা জলের ওপরে খই-ফোটানো ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ পরিবেশটাকে একটু যেন অন্যরকম করে দিয়েছিল।

সুপ্রকাশ পালিতের চোখে হাই-পাওয়ারের চশমা। বেশ কিছুদিন আগে ছানি কাটিয়েছেন। বয়েস যত-না হয়েছে তার তুলনায় মুখে ভাঁজ পড়েছে অনেক বেশি। একটু মোটাসোটা জমিদারি চেহারার মানুষ। গাল দুটো ভারী হওয়ার মুখের দুপাশে সামান্য ঝুলে পড়েছে। মাথার চুল এখনও পুরোপুরি সাদা হয়ে যায়নি। নাকটা বেশ বড়, সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। নীচের ঠোঁটটা খানিকটা ওলটানো। গায়ের রং মাজা হলেও ঠোঁটের রং অস্বাভাবিকরকম গোলাপি।

হঠাৎ সুপ্রকাশ পালিত মন্তব্য করলেন, 'ভূতনাথকে আজ সরাসরি একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেব।'

প্রিয়নাথ সিগারেটের ধোঁয়ায় বুঁদ হয়ে ছিলেন, হেসে বললেন, 'কী চ্যালেঞ্জ?'

চ্যালেঞ্জ মানে একটা স্ট্রেট কোশ্চেন করব—তার স্ট্রেটকাট জবাব চাই। যদি স্পষ্ট জবাব না দিতে পারেন তা হলে ধরে নেব আপনি হেরে গেছেন।'

বরেন মল্লিক পান চিবোচ্ছিলেন। জড়ানো গলায় কৌতূহলী হয়ে বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার! কী ব্যাপার! ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।'

বরেন মল্লিকের লন্ড্রি আছে। তাই বর্ষা-ভেজা কাদা প্যাচপেচে দিন খুব পছন্দ করেন। পানের দারুণ ভক্ত। প্রায়ই বলেন, 'পান আর বর্ষা আমার বড় ভরসা। পান নইলে জীবন বৃথা, আর বর্ষা নইলে লন্ড্রির ব্যবসা ঢিলে—ক্যাশবাক্স ঠনঠন গোপাল।'

বিজন সরকার এ-পাড়ার শান্তি কমিটির সেক্রেটারি। পাড়ায় সকলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেন। ছিপছিপে ফরসা চেহারা। পঞ্চাশ ছুঁতে-না-ছুঁতেই মাথার চুলে মন্বন্তর শুরু হয়ে গেছে। সবসময় হাসিখুশি মেজাজে থাকেন। সুপ্রকাশ পালিতের সঙ্গে পাড়ার ব্যাপারেই কী একটা দরকার ছিল বলে এই বৃষ্টি মাথায় করেও এসেছেন। তারপর আড্ডায় জমে গেছেন।

বিজন সরকার হেসে বললেন, 'কী ব্যাপার, সুপ্রকাশদা! একেবারে খেপে গিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিচ্ছেন!'

বৃদ্ধ জগৎ শ্রীমানী হাতের বিড়িতে ঘন-ঘন টান দিচ্ছিলেন। ভাঙা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বলে উঠলেন, 'কী স্ট্রেট কোশ্চেন, সুপ্রকাশ? আমার বউ ফুলশয্যার রাতে ইয়ের সময় যে-কোশ্চেন করেছিল সেরকম নয় তো।' ফিকফিক করে হেসে উঠলেন জগৎ শ্রীমানী। হাসির দমক থামলে বিড়িতে জুত করে একটা টান দিয়ে মন্তব্য করলেন, 'অবশ্য প্রিয়নাথবাবুর ভয় বা লজ্জার কিছু নেই। উনি সাত্ত্বিক ব্যাচিলার মানুষ। তোমার কোশ্চেন যদি নো-বল বা ওয়াইড বল না হয় তা হলে উনি ঠিক স্ট্রেট ব্যাটে খেলে দেবেন।'

জগৎ শ্রীমানী চেহারায় ছোটখাটো। যথেষ্ট বৃদ্ধ মানুষ। আদিরসের রসিকতার জন্য পাড়ায় বিখ্যাত অথবা কুখ্যাত। ঈশ্বরভক্ত মানুষ অথচ মজা করে বলেন, 'ভগবান আমাকে টেনে নেয় নিক, কিন্তু আমার গোবেচারা বউটাকে নিয়ে কেন টানাটানি করছে বলুন তো! ভগবানসাহেবের কি বউ নেই!'

জগৎবাবুর স্ত্রী কয়েকবছর ধরে ক্যান্সারে ভুগছেন। ভদ্রমহিলা বলতে গেলে মরে গিয়েও বেঁচে রয়েছেন।

প্রিয়নাথ হাতের সিগারেটে একটা জোরালো টান দিয়ে বললেন, 'করুন আপনার কোশ্চেন।'

'ভূত আছে, না নেই?' গলাখাঁকারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে নিয়ে জানতে চাইলেন সুপ্রকাশ।

প্রিয়নাথ হেসে বললেন, 'কী আর বলব! ভূত আছে ভাবলে যাঁদের সুবিধে হয়, তাঁরা বলেন ভূত আছে। আর, ভূত নেই ভাবলে যাঁদের সুবিধে হয়, তাঁরা বলেন ভূত-টুত কিছু নেই।'

উত্তর শুনেই প্রতিবাদ করে উঠলেন সুপ্রকাশ পালিত : 'এ কেমন উত্তর হল, ভূতনাথ! এ তো এড়িয়ে যাওয়া জবাব হল। আমি ভূতে বিশ্বাস করি। কিন্তু ভূত আছে ভাবলে আমার তো কোনও সুবিধে হয় না।'

প্রিয়নাথ হেরে যাওয়া হাসি হাসলেন। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা গুঁজে দিলেন অ্যাশট্রেতে। তারপর খানিকটা ইতস্তত করে বললেন, 'ঠিক আছে। একটা স্ট্রেটকাট জবাব দেওয়ার চেষ্টা করছি।'

বরেন মল্লিক, বিজন সরকার আর জগৎ শ্রীমানী চনমনে হয়ে বসলেন।

হঠাৎই বাজ পড়ার শব্দ হল। শব্দের রেশ অনেকক্ষণ ধরে ছুটোছুটি করল মেঘলা আকাশে।

সকলের মুখের ওপরে আলতো করে চোখ বুলিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, 'আপনারা সকলেই তো একসময় জ্যামিতি পড়েছেন। তাতে বিন্দুর সংজ্ঞা মনে আছে? যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধ নেই, কিন্তু অবস্থিতি আছে—তাকেই বলে বিন্দু! কী অদ্ভুত সংজ্ঞা। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধ নেই, অথচ আছে। অর্থাৎ, মাপা যায় না, কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। এটাই আপনার স্ট্রেট কোশ্চেনের স্ট্রেটকাট জবাব, সুপ্রকাশদা। ভূত হল জ্যামিতির ওই বিন্দুর মতো। বিজ্ঞান দিয়ে মাপা যায় না, অথচ অস্তিত্ব আছে।'

প্রিয়নাথের কথা শুনে সকলেই কেমন চুপচাপ হয়ে গেলেন। বৃষ্টির একঘেয়ে শব্দ স্পষ্ট শোনা যেতে লাগল। ঘরে অদ্ভুত এক অনুভব নেমে এল যেন।

ঘরে আসবাবপত্র বলতে একটা বড়সড় তক্তপোশ—সবুজ-কালো চেক কাটা চাদরে ঢাকা। আর একটা হাতলওয়ালা বড় চেয়ার। চেয়ারের রং-পালিশ সবই মলিন হয়ে গেছে।

ঘরের এক দেওয়ালে একটা অ্যানসনিয়া পেন্ডুলাম-ঘড়ি। তার পাশেই একটা বড় মাপের পুরোনো ফটোগ্রাফ। ফটোয় সার বেঁধে অনেকে দাঁড়িয়ে। সময়ের আঁচড়ে ফটোর নানা জায়গায় ক্ষয় ধরেছে, কালো রং বাদামি হয়ে গেছে।

ঘরের ডানদিকে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কারুকাজ করা একটা প্রাচীন আলমারি। আলমালির পাল্লা কাচের। মলিন কাচের ওপিঠে কিছু বইপত্র আর টুকিটাকি জিনিস। একেবারে ওপরের তাকে দুটো পেতলের কাপ—কোনওকালে সুপ্রকাশ পালিতের কোনও পূর্বপুরুষ হয়তো প্রাইজ পেয়েছিলেন।






পুরোনো বিড়ি শেষ করে নতুন একটা বিড়ি ধরালেন জগৎ শ্রীমানী। সস্তা লাইটারটা পাঞ্জাবির পকেটে রাখতে-রাখতে মাথা নেড়ে তারিফের সুরে বললেন, 'বেড়ে বলেছেন, প্রিয়নাথবাবু। ভূত নেই, অথচ আছে। কিংবা আছে, অথচ নেই।'

বরেন মল্লিক পানের পিক ফেলতে দরজার কাছে উঠে গেলেন। ফিরে আসতে আসতে বললেন, 'এ-বৃষ্টি আরও ঘণ্টাখানেক চলবে।' তারপর তক্তপোশে গুছিয়ে বসে মন্তব্য করলেন, 'বোঝা গেল ভূত হচ্ছে বর্ডারলাইন কেস।'

বিজন সরকার মন দিয়ে সকলের কথা শুনছিলেন, আর কিছু একটা বলার জন্য উসখুস করছিলেন। সামান্য ফাঁক পেতেই বেশ সিরিয়াস মুখে প্রিয়নাথকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, প্রিয়নাথবাবু, ভূত আর দুঃস্বপ্ন কি একই?'

প্রিয়নাথ ভুরু কুঁচকে বিজন সরকারের দিকে তাকালেন। আলো পড়ে তাঁর টাকের একটা দিক চকচক করছিল।

'কেন, এ-কথা বলছেন কেন?' প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন।

'যেহেতু দুটো দেখেই আমরা ভয় পাই। আমি ভূতে বিশ্বাস করি না। কিন্তু প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পাই। যদিও জানি ওগুলো স্বপ্ন, মিথ্যে—তা হলেও আমি ভয়ে কুলকুল করে ঘামতে থাকি। এটা কেন হয়?'

'কারণ, স্বপ্ন দেখার সময় আমরা স্বপ্নটাকে সত্যি বলে ভাবি। ওটা যে স্বপ্ন, সেটা বুঝতে পারি ঘুম ভেঙে সচেতন হওয়ার পর। তখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বপ্নটা আমাদের মনে থাকে না। অনেকসময় টুকরো-টুকরো মনে থাকে। গোটা স্বপ্নটা মনে রাখতে পারে এমন মানুষ খুবই কম। কোনও-কোনও স্বপ্ন কোন এক অজানা কারণে মনে থেকে যায়। সিগমুন্ড ফ্রয়েড তাঁর দেখা একটা স্বপ্ন সাঁইতিরিশ বছর পরেও স্পষ্ট মনে রাখতে পেরেছিলেন। এটা খুবই রেয়ার ক্যাপাসিটি। এর ব্যাখ্যা কেউ এখনও দিতে পারেননি। তা ছাড়া, স্বপ্ন যে আমরা ভুলে যাই তার ব্যাখাও বেশ জটিল।'

সুপ্রকাশ পালিত বিড়বিড় করে বললেন, 'ভূতের মতোই...স্বপ্নও বড় রহস্যময় ব্যাপার। মৃত মানুষরা স্বপ্নেও অনেক সময় দেখা দেয়। আমার এক খুড়তুতো ভাই আটাশ বছর আগে বাস চাপা পড়ে মারা গিয়েছিল। আমি তখন কলকাতার বাইরে ছিলাম। ওকে শেষ-দেখা দেখতে পারিনি। অথচ ওর অ্যাকসিডেন্ট হওয়া ডেডবডিটা আমি প্রায়ই স্বপ্নে দেখতে পাই। আমি ওকে খুব ভালোবাসতাম।'

বৃষ্টি হঠাৎ জোরে শুরু হল। বাজ পড়ার শব্দ শোনা গেল আবার।

প্রিয়নাথ চোখ থেকে চশমা খুলে চশমার কাচ দুটো রুমাল দিয়ে মুছতে-মুছতে বললেন, 'যদি আপনাদের হাতে সময় থাকে তা হলে একটি মেয়ের অদ্ভুত স্বপ্ন দেখার গল্প আপনাদের শোনাই। মেয়েটি বারবার করে বলেছিল, তার অসুখের কথা আমি যেন কাউকে না বলি। তাই ওর আসল নাম আপনাদের বলছি না। ও আমার কাছে ওর অসুখের ব্যাপারে কনসাল্ট করতে এসেছিল। আমি ওকে কয়েকটা সাজেশন দিয়েছি।

তাতে কিছু-কিছু কাজও হয়েছে।' চশমাটা নাকের ওপরে ঠিক করে বসালেন প্রিয়নাথ : 'তবে গল্পটা বলার পর কেউ আমাকে কোনও প্রশ্ন করতে পারবেন না। সুপ্রকাশদা, আপনিও যেন আবার নতুন কোনও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবেন না!'

একটু চুপ করে থেকে প্রিয়নাথ শুরু করলেন তাঁর কাহিনি।

'ধরা যাক, মেয়েটির নাম নন্দিনী...।'

ঘরের তেরছা আলোয় নন্দিনীর মুখে ভয়ের ছাপ বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ও অসহায় চড়ুইপাখির চোখে ডক্টর মল্লিকের চোখে তাকিয়ে রইল। অনেক আশা নিয়ে ও ডক্টর মল্লিকের চেম্বারে এসেছে। মনের চিকিৎসার ব্যাপারে ওঁর খুব নাম। অফিসের এক কোলিগের কাছে নন্দিনী ডক্টর সুনয়ন মল্লিকের খোঁজ পেয়েছে।

ডক্টর মল্লিকের কপালে অসংখ্য ভাঁজ—ভাঁজের সংখ্যা কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে। গদি আঁটা রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ ছোট করে তিনি সাতাশ-আটাশের সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকালেন। একটা ছোট্ট 'হুম' শব্দ করে ভারী গলায় বললেন, 'রক্তের দাগ? আপনি শিওর?'

নন্দিনী আমতা-আমতা করে বলল, 'আমার তো সেরকমই মনে হয়েছে। আপনি হয়তো দেখলে বলতে পারবেন—।'

ডক্টর মল্লিক সোজা হয়ে বসলেন। তারপর পেশাদারি সুরে বললেন, 'এইভাবে বললে ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে ঠিক ক্লিয়ার হচ্ছে না। কেমন যেন এলোমেলো...খাপছাড়া শোনাচ্ছে। আপনি বরং একটু গুছিয়ে বলুন...।'

নন্দিনী চেয়ারে একটু জড়সড় হয়ে বসল। তাঁতের শাড়ির আঁচলটা ডান কাঁধের ওপর দিয়ে টেনে ঠিকঠাক করে নিতে চাইল। তারপর বারকয়েক ঢোক গিলে মিষ্টি গলায় বলল, 'ঠিক আছে, প্রথম থেকে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি...।'

নন্দিনী প্রায় প্রত্যেক রাতে একটা ভয়ের স্বপ্ন দ্যাখে। স্বপ্নটা সত্যি-সত্যি ভয়ের কি না ও জানে না, তবে স্বপ্নটা দেখে ও ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। একই ভয়ের স্বপ্ন রোজ দেখতে দেখতে ভয়ের মাত্রা ক্রমশ কমে আসা উচিত, কিন্তু ওর বেলায় সেটা হয়নি। বরং উলটে ওর ভয় বেড়ে গেছে।

'ডাক্তারবাবু, প্রায় এক বছর ধরে আমি একটা স্বপ্ন দেখি—একই স্বপ্ন—কিন্তু ওটা দেখলেই আমি ভয়ে পাথর হয়ে যাই—।'

ডক্টর মল্লিক লাইটার জ্বেলে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর ঠাট্টার মেজাজে বললেন, 'আপনার মুখ-চোখ দেখছি শুকিয়ে গেছে। স্বপ্নটা আমাকে বলতে গেলেও কি আপনার ভয় করবে না কি! নিন, চটপট শুরু করুন...।'

'সল্টলেকের আট নম্বর ট্যাঙ্কের কাছে একটা ছোট বাড়িতে আমরা থাকি। আমরা মানে, আমি আর আমার মা। মায়ের অনেক বয়েস হয়েছে...নানান রোগে একেবারে শয্যাশায়ী। আমার বাবা মারা গেছেন প্রায় আট বছর আগে। মোটরবাইকে করে বাড়ি ফেরার সময় অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। তারপর থেকে ওই বাড়িতে শুধু আমরা দুজন। আমি একটা প্রাইভেট ফার্মে স্টেনোগ্রাফারের চাকরি করি। সেই সময়টা একজন আয়া মায়ের দেখাশোনা করে। মায়ের ঘর দোতলায়, আর আমারটা একতলায়। বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্যে এরকমভাবে শুতে হয়। তবে মায়ের ঘর থেকে আমার ঘরে কলিংবেলের ব্যবস্থা আছে—যদি কোনওরকম ইমার্জেন্সি হয়, তাই। মা রাতে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোন। ফলে রাতে কখনও জাগেন না। এতে আমিও বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারি।

'রাতে খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে শুতে-শুতে আমার প্রায় এগোরোটা মতন হয়। তারপর একটু গল্পের বই-টই পড়ি। মোটামুটি আধঘণ্টা বই-ম্যাগাজিন পড়ার পর ঘুম। আর ঘুমোলে পরই আমি স্বপ্নটা দেখতে শুরু করি।'

কথা বলতে-বলতে নন্দিনীর গলার স্বর কেমন যেন ফিসফিসে হয়ে যাচ্ছিল। ওর ফরসা মুখে বিনবিন করে ঘাম ফুটে উঠল।

মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ডক্টর মল্লিকের ভীষণ মায়া হচ্ছিল। সিগারেটে তৃপ্তির টান দিয়ে তিনি মমতা মাখানো গলায় নন্দিনীকে তাড়া দিলেন: 'থামলেন কেন, বলুন—।'

'হ্যাঁ, বলছি—।' একবার ঢোক গিলে আবার বলতে শুরু করল নন্দিনী, 'আমার ঘরের একপাশে দেওয়াল ঘেঁষে একটা কাঠের প্যাঁচা আছে। খুব দুষ্প্রাপ্য কোনও কিউরিয়ো নয়—নেহাতই সাধারণ জিনিস। অনেক আগে রাজস্থানে বেড়াতে গিয়ে বাপি—মানে, আবার বাবা—ঘর সাজানোর জন্যে ওটা নিয়ে এসেছিলেন। আমার স্বপ্নটা শুরু হয় ওই প্যাঁচাটা দিয়ে—তবে ওটা তখন আর কাঠের প্যাঁচা থাকে না।

'স্বপ্নের মধ্যে হঠাৎই আমি দেখতে পাই ওই প্যাঁচাটা সবুজ রঙের বরফের চোখে একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে আছে। অন্ধকারে দেখতে না পেলেও ওর ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পাই আমি। কখনও-কখনও ওটা মুখ ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকায়। তারপর আবার রক্ত-হিম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তখন আমার ভীষণ শীত করতে থাকে। ঠান্ডায় শরীরে কাঁটা দেয়, বুকের ভেতরটা আকুল হয়ে কাঁপতে থাকে। আর সেই সময়েই শুরু হয়ে যায় শিসের শব্দ। সুরেলা শিস দিয়ে কেউ যেন আমাকে ডাকছে—অনেকটা নিশির ডাকের মতো।

'আমার বিছানার মাথার দিকে একটা জানলা আছে। তবে বারোমাসই ওটা আমি বন্ধ করে শুই। কিন্তু স্বপ্নের ভেতরে আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, ওটা কে যেন খুলে দিয়েছে, আর খোলা জানলা দিয়ে হিম-বাতাস কুলকুল করে ঢুকে পড়ছে ঘরে।

'ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হল, আমার খাটের নীচে কেউ যেন লুকিয়ে রয়েছে। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই অলৌকিক এক ক্ষমতায় ব্যাপারটা আমি টের পেলাম। আর একইসঙ্গে একটা দুর্গন্ধের ঢেউ আমার নাকে এসে ঝাপটা মারল। সাগরে যখন ঘূর্ণিঝড় ওঠে তখন কখনও-কখনও জলস্তম্ভ তৈরি হয়ে যায়। সেই জলস্তম্ভ যখন সাগরের বুকে আছড়ে পড়ে তখন তার ঝাপটায় অনেক সময় বড়সড় জাহাজও তলিয়ে যায়। এই দুর্গন্ধের ঝাপটা যেন তার চেয়েও কিছু বেশি। আমি একেবারে তলিয়ে গেলাম। আমার ঘ্রাণ নেওয়ার ক্ষমতা পলকে অসাড় হয়ে গেল।

'বিছানা থেকে না-নেমেই আমি বিছানার চারপাশটা দেখতে পেলাম...।'

নন্দিনী দম নেওয়ার জন্য একটু থামল। খসখসে গলায় বলল, 'একটু...একটু জল দেবেন?'

ডক্টর মল্লিকের সিগারেট শেষ হয়ে গিয়েছিল। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে তিনি টেবিলে রাখা একটা জলের জাগ এগিয়ে দিলেন নন্দিনীর দিকে। ঢকঢক করে জল খেল নন্দিনী। কয়েকটা বড়-বড় শ্বাস নিল। তারপর আবার শুরু করল ওর স্বপ্নের গল্প।

'...দেখলাম, আমার বিছানার চাদরটা নাটকের ড্রপসিনের মতো মেঝের দিকে অনেকটা করে ঝুলে রয়েছে। আর কোন এক অলৌকিক হাওয়ায় চাদরটা কেঁপে-কেঁপে উঠছে। চাদরের পেছনে কিছু একটা নড়ছিল। এ-ও বুঝতে পারছিলাম, দুর্গন্ধের দমকা ঢেউটা বিছানার নীচ থেকেই বেরিয়ে আসছে। তা হলে কি দুর্গন্ধ ছড়ানো কোনও প্রাণী ওখানে লুকিয়ে থেকে আমাকে ভয় দেখাতে চাইছে! তখনই দেখলাম, চাদরের গায়ে রক্তের দাগ!

'বিছানায় শুয়ে-শুয়েই আমি সবকিছু দেখতে পাচ্ছিলাম, টের পাচ্ছিলাম। আর ভয়ে সিঁটিয়ে কাঠ হয়ে যচ্ছিলাম। ওই শিসের শব্দ, প্যাঁচার ডানা ঝাপটানি, আর ওই গন্ধ আমাকে ধীরে ধীরে পালটে দিচ্ছিল। তার ওপর ওই রক্তের দাগ...।

'হঠাৎই খেয়াল করলাম, আমার সারা গা লোমশ হয়ে উঠছে, দাঁতগুলো ঠোঁটের আড়ালে আর থাকতে চাইছে না। একইসঙ্গে আমার হাত আর পায়ের নখ কালচে লম্বা হয়ে বেড়ে উঠল। আর আমি পাগলের মতো ক্ষিপ্ত হয়ে বিছানাটাকে দাঁতে নখে চিরে ফালাফালা করে ছিন্নভিন্ন করে দিলাম।

'অন্ধকারেই আমি সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। একটু দূরে রাখা ড্রেসিং টেবিলের আয়নার দিকে হঠাৎই নজর পড়েছিল আমার। দেখি, সেখানে আমার মুখের ছায়া পড়েছে। কিন্তু এ কার মুখ! সারাটা মুখ ওই প্যাঁচাটার চোখের মতো গাঢ় সবুজ, গাল দুটো বসা, চোখের জায়গায় দুটো অন্ধকার গর্ত। ঠিক তখনই একটা হিংস্র গর্জন শুনতে পেয়েছিলাম আমি। তারপর আর ভালো করে কিছু মনে নেই...।'

স্বপ্ন শেষ করে নন্দিনী থামল। ছোট রুমাল মুখে বুলিয়ে ঘাম মুছে নিতে চাইল।

ডক্টর মল্লিক কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর মাথায় আলতো করে হাত চালিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'স্বপ্নটা দেখে আপনার খুব ভয় করে নিশ্চয়ই?'

নন্দিনী শুকনো গলায় বলল, 'হ্যাঁ—।'

'স্বপ্নের ঠিক কোন জায়গাটা আপনার কাছে সবচেয়ে ভয়ের বলে মনে হয়?'

একটু ইতস্তত করে নন্দিনী বলল, 'বলব? শুনলে আপনি হাসবেন না তো!'

'আরে না, না—আপনি নির্ভয়ে বলুন। আই অ্যাম ড্যাম সিরিয়াস।'

'স্বপ্নের কোনও বিশেষ জায়গা নয়—গোটা স্বপ্নটাই আমার কাছে ভীষণ জীবন্ত আর সত্যি বলে মনে হয়—এটাই সবচেয়ে ভয়ের, ডাক্তারবাবু।'

ডক্টর মল্লিক হঠাৎই হো-হো করে হেসে উঠলেন। হাসির দমকে তাঁর ভারী শরীর কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বললেন, 'মিস রয়, আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না। আমরা স্বপ্ন দেখি আমাদের নানা ধরনের অবসেশন থেকে, মনের চাহিদা থেকে। অনেক সময় ছোটবেলার কোনও ঘটনার জন্যে অপরাধবোধ বহু বছর পর্যন্ত স্বপ্নের ভেতরে তাড়া করে ফিরে বেড়ায়।' ডক্টর মল্লিকের কপালে ভাঁজ পড়ল। গলার স্বর নামিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, 'ছোটবেলায় আপনার সঙ্গে কোনও বাজে ব্যাপার হয়েছিল?'

'বাজে ব্যাপার মানে?' নন্দিনীর মুখে সরল বিস্ময় ফুটে উঠল।

'মানে, ইয়ে, সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের কোনও ব্যাপার...।'

'না-না, সেরকম কিছু হয়নি।'

'তা হলে আপনার চিন্তার কিস্যু নেই। হয়তো কোনও আজগুবি ভয়ের গল্প পড়ে আপনার স্বপ্নে তার ছায়া পড়েছে। আপনি স্বপ্নটাকে কোনও গুরুত্ব দেবেন না। দেখবেন, ধীরে ধীরে আপনার স্বপ্নটা ঝাপসা হয়ে এসেছে।'

ডক্টর মল্লিকের আশ্বাসে নন্দিনী বোধহয় তেমন ভরসা পেল না। আমতা-আমতা করে বলল, 'আমি গল্পের বই পড়ি বটে, তবে এই স্বপ্নটার মতো ঘটনা কোনও বইয়ে পড়িনি। আমার স্বপ্নটা ভীষণ জীবন্ত, আর সত্যি...।'

'ওটা আপনার কল্পনা, মিস রয়। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না—স্বপ্ন স্বপ্নই। আমরা যখন জেগে থাকি তখন নানান ঘটনায় অংশ নিই—তারই ছাপ কখনও-কখনও স্বপ্নে দেখা যায়। তার বেশি কিছু নয়। আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যান। টিভি-তে একটু সিনেমা-টিনেমা দেখুন, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা মারুন, প্রেম করুন, মায়ের সঙ্গে গল্প করুন—লিড আ নরমাল লাইফ। তা হলেই দেখবেন সব প্রবলেম সলভ হয়ে গেছে। আমার কাছে আর আসতে হবে না। আপনি আমাকে ওয়ান ফিফটি দেবেন।'

ডক্টর মল্লিক একটানা সুরে এমনভাবে শেষ কথাটা বললেন যে, নন্দিনী প্রথমটা বুঝতে পারেনি উনি ভিজিটের কথা বলছেন। তারপরই মাথা নীচু করে ব্যস্তসমস্তভাবে ব্যাগ হাতড়ে ভিজিটের টাকাটা বের করল, ডক্টর মল্লিকের হাতে দিল।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল নন্দিনী, আলতো সুরে বলল, 'আপনি বলছেন, সত্যিকারের সব ঘটনার ছায়া স্বপ্নে দেখা যায়। এর উলটোটা কি হয় না? মানে, স্বপ্নের ব্যাপারটা কি সত্যি হতে পারে না? বিশ্বাস করুন, আমার স্বপ্নটা এত জীবন্ত...।'

'ডোন্ট টক রাবিশ, মিস রয়।' নন্দিনীকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন ডক্টর মল্লিক, 'সবকিছুর একটা লিমিট থাকা দরকার। বললাম তো, আপনি নিশ্চিন্তে বাড়ি যান—।'

নন্দিনী হাসল—কেমন যেন অস্বাভাবিক হাসি। তারপর মিষ্টি করে বলল, 'আপনি বিশ্বাস করছেন না তো! আমার স্বপ্নটা তা হলে আপনাকে দেখাই...।'

সঙ্গে-সঙ্গে বন্ধ ঘরের ভেতরে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেল।

নন্দিনীর চোখে এক অলৌকিক আলো জ্বলে উঠল। ঘরের আলো স্তিমিত হয়ে গিয়ে সন্ধ্যার আঁধার নেমে এল। একইসঙ্গে ঘরের উষ্ণতা কমতে-কমতে বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছে গেল। বিচিত্র এক হিম-বাতাস ঘরের ভেতরে পাগলের মতো ছুটোছুটি করতে লাগল। শুরু হয়ে গেল এর সুরেলা শিসের শব্দ।

হঠাৎই একটা বিকট দুর্গন্ধের ঢেউ ডক্টর মল্লিকের চেতনা অসাড় করে দিল। একটা অদৃশ্য পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ শুনতে পেলেন তিনি। আর অন্ধকারেই স্পষ্ট দেখতে পেলেন, সুন্দরী মেয়েটির কমনীয় হাত দুটো লোমশ হয়ে উঠছে, হাত আর পায়ের নখ মাপে বড় হয়ে বঁড়শির মতো বেঁকে গেছে, গাল দুটো বসে গিয়ে বীভৎস দেখাচ্ছে, চোখের জায়গায় দুটো কালো গর্ত—আর তারই মাঝে দুটো সবুজ আলোর বিন্দু।

নন্দিনীর মুখের রং ক্রমেই গাঢ় সবুজ হয়ে উঠছে, দাঁতের দিকে ভয়ে তাকানো যাচ্ছে না।

ডক্টর সুনয়ন মল্লিক আতঙ্কে কুঁকড়ে গেলেন, তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। বুঝতে পারলেন, তিনি শেষের খুব কাছে পৌঁছে গেছেন।

ভয়ংকর কর্কশ পুরুষালি গলায় নন্দিনী বলে উঠল, 'এবার আমার স্বপ্নটা বিশ্বাস হল তো!'





# অলক্ষণের গণ্ডি

লক্ষ্মণের গণ্ডির কথা তো আপনারা সবাই জানেন। ওই গণ্ডির বাইরেই ওত পেতে ছিল যত বিপদ। কিন্তু আমি এখন আপনাদের শোনাতে বসেছি অলক্ষণের গণ্ডির কথা—যে-গণ্ডির ভেতরে অজানা এক বিপদ প্রায় একশো বছর ধরে অষ্টপ্রহর ওত পেতে রয়েছে।

ঘটনাটা আমাকে শুনিয়েছিল প্রায় পঁচানব্বই বছরের বৃদ্ধ একজন খাসিয়া উপজাতির মানুষ। ওর নাম ছিল পহেলা। জাটিঙ্গা গ্রামে ও জন্ম থেকেই আছে।

অসমের নর্থ কাছাড় হিলস জেলার একটি গ্রাম জাটিঙ্গা। গ্রামটির ভৌগোলিক অবস্থান 25012'N 930E। তার অধিবাসী খাসিয়া উপজাতির মাত্র হাজারদেড়েক মানুষ।

১৯০৫ সালে হাফলঙ নগরের দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরত্বে জাটিঙ্গা গ্রামের পত্তন হয়েছিল। জায়গাটির 'অভিশপ্ত' বলে বদনাম ছিল। ইউ. লাখোনবঙ সুচ্যাঙ নামের একজন খাসিয়া সেখানকার আদি আদিবাসী জেমি নাগাদের কাছ থেকে নামমাত্র দামে 'অভিশপ্ত' গ্রামটিকে কিনে নেন। তখন পহেলার বয়েস ছিল মাত্র তিন বছর।

তার টিনের চালের বাড়ির দাওয়ায় বসে নেশাগ্রস্ত পহেলা আমাকে এক অদ্ভুত কাহিনি শুনিয়েছিল। সন্দেহ নেই, প্রথমে কাহিনিটি আমার কাছে আপাদমস্তক আজগুবি বলে মনে হয়েছিল। তা ছাড়া পূর্ণিমার চাঁদের আলো, ঠান্ডা বাতাস, আর পহেলার জরাজীর্ণ আঁকিবুকি-কাটা মুখ সবকিছুর ওপরে একটা অলৌকিক মাত্রা চাপিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু গল্পের শেষে এমন প্রমাণ পহেলা দাখিল করেছিল যে, আমি আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম—ওর কথা সেই মুহূর্তেই আগাগোড়া বিশ্বাস করেছিলাম আমি। খুব সাধ জেগেছিল, পহেলার বর্ণনা মতো অলক্ষণের গণ্ডি-ঘেরা জায়গাটা একবার দেখে আসব। কিন্তু একটা পরিচয়হীন ভয় আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরেছিল। বুকের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠেছিল, যেয়ো না—তা হলে আর কোনওদিনই তুমি ফিরতে পারবে না।

পহেলাও সে-কথা বলেছিল—ওই অলক্ষুনে জায়গা থেকে কেউ কখনও ফিরে আসেনি। শুধু পহেলা নেহাতই ভাগ্যের জোরে ফিরে এসেছিল—ভয়ংকর এক প্রমাণ সঙ্গে নিয়ে।

ও জগাখিচুড়ি ভাষায় জড়ানো গলায় যে-গল্প সেদিন শুনিয়েছিল সেটাই সহজ করে আপনাদের বলছি। তবে আগেই বলে রাখছি, এ-কাহিনি যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন তা হলে আমি অন্তত কোনও অভিযোগ করব না।

পহেলা আমাকে বলেছিল...।

স্যার, আপনাকে তো আগেই বলেছি, জাটিঙ্গার পাহাড়ে-জঙ্গলে শিকার করে বেড়ানোটা আমার নেশা। সেই কোন যুগে জার্মানির একটা দোনলা শটগান বাবার কাছ থেকে হাতে পেয়েছিলাম। সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে আমি সবসময় শিকারে বেরোতাম।

জাটিঙ্গার জঙ্গলে বেশিরভাগই মুলি বাঁশের ঝাড় আর বেতগাছের রমরমা। আপনি খেয়াল করেছেন কি না জানি না, আমাদের গ্রাম থেকে হাফলঙের দিকে দু-কিলোমিটার এগোলে ডানদিকের খাদে খুব ঘন জঙ্গল দেখতে পাবেন। ওই জঙ্গলে কেউ যায় না। মানে, আমি যাওয়ার পর থেকে আর কেউ যায়নি। আমার আগে ডাকাবুকো খাসিয়া যুবকরা কেউ কেউ হয়তো গিয়ে থাকবে, কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি। আমিই একমাত্র মানুষ, যে ফিরে এসে আর সবাইকে সাবধান করে দিয়েছি। জানিয়ে দিয়েছি, ওখানে গেলে কী হতে পারে।

পিচের রাস্তা থেকে যদি আপনি ঢাল বেয়ে নামেন তা হলে, স্যার, দেখতে পাবেন ওখানে একটা 'নো এন্ট্রি' বোর্ড লাগানো রয়েছে। আর লেখার নীচে একটা মড়ার খুলি আঁকা আছে। তবে এসব করা হয়েছে অনেক পরে।

আপনি তো জানেন, আমাদের চাষবাস বলতে 'জুম'-এ গিয়ে আদা, লঙ্কা, কমলালেবু, আনারস, এসবের চাষ। জঙ্গলের সরু পথ দিয়ে চাষের জমিতে যাতায়াতের পথে অনেক সময় দাঁতালো শুয়োরের মুখোমুখি হতে হয়। তখন চার্লস ডেলি মডেলের শটগানটা আমার কাজে লাগে। একদিন সন্ধের মুখে 'জুম' থেকে ফেরার সময় এক প্রকাণ্ড মাপের দাঁতালো শুয়োরের মুখোমুখি হলাম। দু-দুটো গুলি ছুড়লাম বটে, কিন্তু ওটাকে সেরকমভাবে ঘায়েল করতে পারলাম না। তখন আমি শূন্য শটগান হাতে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করলাম। কিন্তু ওই ঘন জঙ্গলের মধ্যে সেভাবে দৌড়োনো অসম্ভব। আমি কোনওরকমে ঝোপঝাড় ঠেলে পথ তৈরি করে এঁকেবেঁকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। ডালপালা-পাতার আওয়াজ ছাপিয়ে আহত শুয়োরটার গজরানি বেশ কানে আসছিল।

অন্ধকারেই ক্রমেই গাঢ় হচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম, আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমার কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল।

শটগানের নল দিয়ে ঝোপঝাড় সরিয়ে আমি এগোচ্ছিলাম, হঠাৎই একটা গুঞ্জনের শব্দ আমার কানে এল। সন্ধে হলে জাটিঙ্গাতে ঝিঁঝির ডাকে কানে তালা লেগে যায়। কিন্তু এটা সেই শব্দ নয়—তার চেয়ে আলাদা। ঝিঁঝির ডাক থাকা সত্ত্বেও ওই মিহি গুঞ্জনের শব্দটা আলাদা করে বেশ কানে আসছিল।

দাঁতালো শুয়োরটা বোধহয় একগুঁয়েভাবে বনবাদাড় ভেদ কর ছুটছিল। কারণ আমি গাছপালার এলোপাতাড়ি নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম, আর শুনতে পাচ্ছিলাম আহত প্রাণীটার গর্জন।

বলতে গেলে আচ্ছন্নের মতোই আমি সামনে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎই দেখি খানিকটা ফাঁকা জায়গা—অনেকটা মাঠের মতো। কুয়াশা-মাখা ঘোলাটে আবছা অন্ধকারে স্পষ্টভাবে কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে ছোট-ছোট কিছু ঝোপঝাড় ছাড়া জায়গাটা অস্বাভাবিকরকম ফাঁকা। যেন কেউ মালি লাগিয়ে জায়গাটা সাফ করিয়েছে।

আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

গুঞ্জনটা এখন তীব্রভাবে শোনা যাচ্ছিল। যেন কোনও বদরাগী ভিমরুল আমাকে লক্ষ্য করে তিরের মতো ছুটে আসছে—আর তার ডানার শব্দ এসে আমার কানে বিঁধছে। একইসঙ্গে একটা অচেনা কটু গন্ধ আমার

নাকে এসে ধাক্কা মারল।

এমন সময় কোনও ছুটন্ত প্রাণীর শব্দ শুনতে পেলাম।

চমকে মুখ ফিরিয়েই দেখি গাঢ় কালো আঁধারের মতো শুয়োরটা ঝোপঝাড় ঠেলে ছিটকে ঢুকে পড়েছে সেই ফাঁকা জায়গায়। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ঘটে গেল সেই অদ্ভুত ঘটনা।

শুয়োরটা ফাঁকা জায়গাটায় ঢোকামাত্রই গোড়া কাটা কলাগাছের মতো কাত হয়ে খসে পড়ল মাটিতে। আর কোনও নড়াচড়া করল না, কোনওরকম চিৎকার করল না।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। টের পেলাম, আমার হাত-পা থরথর করে কাঁপছে। একটু আগে উঁকি মারা ভয়টা একলাফে আমাকে একেবারে জাপটে ধরল। হঠাৎই আমার শরীরের ভেতরটা ঠান্ডা হয়ে গেল। ধীরে-ধীরে সেই ঠান্ডা স্রোত পা বেয়ে নামতে লাগল মাটিতে।

আমি হয়তো পড়ে যাওয়া শুয়োরটার কাছে এগিয়ে যেতাম, যদি-না সেই মুহূর্তে আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে পেতাম।

জঙ্গলের মধ্যে কোথায় যেন একটা রাতপাখি ডেকে উঠেছিল। সেই ডাকে চমকে উঠে মুখ তুলতেই দুটো বাদুড় আমার চোখে পড়ল। সীসের মতো আকাশের পটভূমিতে ওদের দেখতে পেলাম আমি। অন্ধকারে আরও অন্ধকার ডানা মেলে দিয়ে ওরা নিঃশব্দে নিপুণ ছন্দে ভেসে চলেছে।





উড়তে-উড়তে ফাঁকা জায়গাটার ওপরে আসামাত্রই বাদুড় দুটো গাছ-পাকা ফলের মতো টুপ করে খসে পড়ে গেল নীচে। ওদের দেহ দুটো আছড়ে পড়ার ভোঁতা শব্দ হল। আর সেই মুহূর্তে আমার চিন্তাভাবনাও যেন অবশ হয়ে গেল।

অন্ধকার মাঠ থেকে আর কোনও শব্দ শোনা যাচ্ছিল না—শুধু সেই গুঞ্জনের শব্দটা ছাড়া।

আমি ক্লান্ত দেহে জঙ্গলের গাছ-পাতার মধ্যেই বসে পড়লাম। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে ওঠায় আমার চোখের সামনে থেকে সবকিছু মুছে যাচ্ছিল। সামনের ফাঁকা জমিটা ঘিরে একটা মারাত্মক ভয় আমাকে আঁকড়ে ধরল। গাঁয়ের নানা লোকের নানা কথা আমার মনে পড়ল। এটাই তা হলে সেই অভিশপ্ত জায়গা! এটার সঠিক পরিচয় কেউ জানত না বলে এটাকে সবাই জঙ্গল বলে ভেবেছে। যারা এই অভিশপ্ত জায়গাটা চোখে দেখেছে তারা কেউ ফিরে যায়নি—ফিরতে পারেনি। তাই 'অভিশপ্ত জঙ্গল' হিসেবেই গড়ে উঠেছে জাটিঙ্গার কিংবদন্তী।

আমার হাতে অস্ত্র বলতে একটা খালি রাইফেল। আর সারা শরীর পাকে-পাকে জড়িয়ে এক অজানা ভয়। সব মিলিয়ে নড়াচড়ার মতো ক্ষমতা আমার ছিল না। তাই কাছাকাছি একটা বড় গাছ খুঁজে নিয়ে তাতে চড়ে বসলাম। অন্ধকারে বোধহয় পিঁপড়ের বাসায় হাত দিয়ে ফেলেছিলাম। কারণ হঠাৎই হাতে-পায়ে জ্বালা-ধরানো কামড় টের পেলাম।

কোনওরকমে গাছে উঠে হাত-পা ঘষে পিঁপড়েগুলো ছাড়ালাম। ঝিঁঝিপোকার ডাকে কানে যেন তালা লেগে যাচ্ছিল। তারই মধ্যে আলাদাভাবে মিহি গুঞ্জনটা শোনা যাচ্ছিল। গাছের ওপর থেকে ফাঁকা জায়গাটা চাঁদের আলোয় অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম। একইসঙ্গে লক্ষ করলাম, দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে—অর্থাৎ, মাউন্ট হেম্পিয়োর দিক থেকে তরল কুয়াশার স্রোত সাপের মতো ধীরে ধীরে এঁকেবেঁকে নেমে আসছে জাটিঙ্গার খাদের দিকে। একটু পরেই হয়তো দুধের মতো সাদা কুয়াশা সামনের ফাঁকা জায়গাটাকে একেবারে ঢেকে ফেলবে।

খিদেয় শরীর আনচান করলেও কোনও উপায় ছিল না। আমি হতভাগ্য শুয়োরটা আর বাদুড় দুটোর কথা ভাবছিলাম। ওই জায়গাটায় কী এমন অভিশাপ আছে যে, কোনও প্রাণী সেখানে ঢুকলেই সঙ্গে-সঙ্গে মারা যায়! আমি যদি ওখানে যাই তা হলে আমারও কি একই দশা হবে!

মনে-মনে ঠিক করলাম, যদি এখান থেকে বেঁচে ফিরি তা হলে সবার আগে গাঁয়ের হেডম্যানকে ব্যাপারটা জানাব। সে-ই গাঁয়ের লোককে সতর্ক করার ব্যবস্থা করবে।

রোববার ছাড়া প্রতিদিন সন্ধেবেলা জাটিঙ্গার গির্জায় গাঁয়ের লোকেরা উপাসনায় যোগ দিতে আসে। হেডম্যান যদি বুদ্ধি করে উপাসনার পর চার্চ থেকেই এই বিপদের কথা ঘোষণা করে দেয় তা হলে সবচেয়ে ভালো হয়। খবরটা ছোট্ট গ্রামে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়বে।

কুয়াশা ক্রমশ চারপাশে ঢেকে ফেলছিল। ফলে চাঁদের আলো কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে সমানভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। ঠিক যেন ঘষা কাচ দিয়ে কেউ চাঁদকে আড়াল করে দিয়েছে।

এরই মধ্যে ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল। জাটিঙ্গায় এরকম বৃষ্টি প্রায়ই হয়। যেমন হঠাৎ করে তার শুরু, তেমনই হঠাৎ করে তার শেষ।

গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঝরে পড়া জলে আমি ভিজতে লাগলাম। ঠান্ডায় শরীরটা কুঁকড়ে যেতে চাইছিল। অসহায়ভাবে আমি দিনের আলোর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। আর মাঝে-মাঝে ওই ভয়ঙ্কর জায়গাটার দিকে নজর চলে যাচ্ছিল।

নিজের অজান্তেই কখন যেন সামান্য তন্দ্রা মতন এসে গিয়েছিল। হঠাৎই কী একটা শব্দে আমার ঘোর কেটে গেল। চমকে সজাগ হয়ে দেখি, ঝিরিঝিরি বৃষ্টি তখনও পড়ছে। তবে কুয়াশা অনেকটা ফিকে হয়ে এসেছে। সামনের ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

একটা অদ্ভুত গোলাপি আভা সামনের খোলা জমিটা থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে। আর মিহি গুঞ্জনটা কেমন যেন বিচিত্র সুরে ওঠা-নামা করছে।

এরকম আলো আমি কখনও দেখিনি। এরকম মায়া-জড়ানো সুরও কখনও শুনিনি আমি। আমার ঘুম পেয়ে গেল—না, স্বাভাবিক কোনও ঘুম নয়, নেশায় পাওয়া ঘুম। ক্লান্তি আর অবসাদে শরীর ছেয়ে গেল, চোখ জড়িয়ে গেল অলৌকিক কোনও টানে। প্রাণপণে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে আমি সম্মোহিতের মতো সামনের ফাঁকা জায়গাটার দিকে চেয়ে রইলাম।

গোলাপি আভা ক্রমেই তীব্র হচ্ছিল। আর তখনই নজরে পড়ল, তার মধ্যে কতকগুলো অদ্ভুত কালো ছায়া চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

ছায়াগুলোর অবয়ব যেন 'নিরাকার'—ওদের নির্দিষ্ট কোনও আকার ছিল না। অথচ ওরা গোলাপি কুয়াশার মধ্যে অনায়াস দ্রুতগতিতে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ আমার শীত-শীত ভাবটা কমতে লাগল। আর তার একটু পরেই বেশ গরম ভাব টের পেলাম। যেন সময় ভুল করে গ্রীষ্মকাল আবার ফিরে এসেছে।

পরিবেশের উষ্ণতা বাড়তে-বাড়তে অসহ্য মাত্রায় পৌঁছে গেল। অলৌকিক এক তাপে আমার মুখ-চোখ যেন পুড়ে যেতে চাইল। আমার মাথাটা কেমন টলে উঠল। চারপাশের গাছপালা দুলে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। আমার হাত থেকে বন্দুকটা খসে পড়ে গেল নীচে।

কোনওরকমে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, একটা দ্যুতিময় গোলাপি বল কুয়াশার ভেতর দিয়ে ধীরে-ধীরে উড়ে চলেছে শূন্যে। কী অদ্ভুত মাতাল করা আভিজাত্যে ভরা তার মসৃণ গতি!

আর আমার কিছু মনে নেই, কারণ তখন আমি জ্ঞান হারিয়ে গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিলাম নীচে।

কাক-ভোরে আমার ঘুম ভাঙল—যদিও, স্যার, এখানে কাক, শালিক, বা চড়ুই দেখতে পাওয়া যায় না। হাফলঙে যে-দু-একটা কাকের দেখা মেলে সেগুলো দাঁড়কাক।

ঘুম ভেঙে যা দেখলাম সে বোধহয় রাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

জল-কাদা মাখা শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমি টলতে-টলতে ফাঁকা জমিটার কিনারে গিয়ে দাঁড়ালাম। জমির এলাকায় হয়তো ঢুকেই পড়তাম, যদি না সেই মুহূর্তে দুটো প্রকাণ্ড বড় মাপের প্রজাপতি জমির এলাকায় ঢুকেই টুপ করে খসে পড়ত।

হেলে থাকা একটা সরু বাঁশগাছ ধরে আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। গতকাল সন্ধের আবছা আলোয় যা-যা চোখে পড়েনি এখন সেগুলো স্পষ্টভাবে চোখ পড়ল।

মিহি গুঞ্জনের শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। এবড়োখেবড়ো ফাঁকা জমিটায় যেসব আগাছা গজিয়েছিল সেগুলো সব পুড়ে কালো হয়ে গেছে। নানা ধরনের কঙ্কালে জায়গাটা ভরতি। জমিটার ডানদিক ঘেঁষে একটা লম্বা ফাটল। সেই ফাটল দিয়ে সাদা ধোঁয়ার রেখা সাপের মতো এঁকেবেঁকে বেরিয়ে আসছে। জমিটার বাঁদিকে একটা বড় মাপের পোড়া গাছ। তার একটা পোড়া ডাল থেকে একটা নাম-না-জানা পাখির কঙ্কাল ঝুলছে।

সবকিছু দেখে আমার গা গুলিয়ে উঠল। কাল রাতের কটু গন্ধটা বেশ কয়েক গুণ হয়ে যেন একেবারে মস্তিষ্কে গিয়ে ধাক্কা মারল। এ আমি কোন অলৌকিক শ্মশানের চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছি! কোন অলৌকিক প্রক্রিয়ায় এখানে দিনের পর দিন ধরে শুধু হাড় জমা হয়েছে! কোথায় গেল কাল রাতের শুয়োরটা আর বাদুড় দুটোর দেহ? ওগুলো কি মুহূর্তে কঙ্কালের চেহারা নিয়েছে? কোথায় উড়ে গেল ওই গোলাপি গোলক? অবয়বহীন কালো ছায়াগুলোই বা গেল কোথায়? ওরা কারা? ওরা কি আবার ফিরে আসবে?

আমার ক্লান্ত অবসন্ন মনের মধ্যে এইসব প্রশ্ন উথালপাথাল করছিল, অথচ কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল। মাতালের মতো টালমাটাল পায়ে পেছনের জঙ্গলের ঘাস-পাতা-কাদা ঘেঁটে দোনলা বন্দুকটা খুঁজে বের করলাম। ওটা তুলে নিয়ে জঙ্গল হাঁটকে ফেরার পথের হদিস করতে চাইলাম।

ঠিক তখনই একটা প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার পাখি—যাকে চলতি কথায় আপনারা দুধরাজ বলেন—আমার পাশ দিয়ে উড়ে চলে গেল ওই অভিশপ্ত জায়গাটার দিকে। আর তার এলাকায় ঢুকে পড়ামাত্রই ব্যস—অমন সুন্দর ধবধবে পাখিটা খতম।

কী যে হল আমার, দৌড়ে ফিরে গেলাম ওই ফাঁকা জমিটার সীমানায়। দেখি সীমানার কাছাকাছিই পড়ে রয়েছে পাখিটা। তার লম্বা বাঁকানো লেজ একেবারে স্থির। ডানার একটি পালকও আর নড়ছে না।

হঠাৎ আমার চোখের সামনে যেন ম্যাজিক শুরু হল। পাখিটার নরম পালক আর শরীর তিলতিল করে ক্ষয়ে যেতে লাগল। জমির মাটির সঙ্গে আগাছার সঙ্গে তার পালক আর শরীরের কণা যেন মন্ত্রবলে মিলিয়ে গেল।

হা ভগবান! একটু পরেই পড়ে রইল শুধু পাখিটার কঙ্কাল। যেন ভাগ অঙ্ক সম্পূর্ণ হয়ে শুধু ভাগশেষ পড়ে আছে।

চোখের সামনে এ-দৃশ্য দেখে আমি পাগলের মতো হয়ে গেলাম, স্যার। দাঁতালো শুয়োরের মতো রাগ হয়ে গেল শরীরে। জানোয়ারের মতো চিৎকার করে জমিটাকে খিস্তিখেউড় করে উঠলাম আমি। শটগানসমেত ডানহাত ছুড়ে দিলাম। সামনে।

রাগে বোধহয় আমার আন্দাজে ভুল হয়ে গিয়ে থাকবে। বোধহয় আমার হাতটা ঢুকে পড়েছিল জমিটার এলাকায়। কারণ চোখের পলকে আমার হাতে ধরা অবস্থাতেই বন্দুকটা গরম হয়ে গেল। আমি যন্ত্রণায় চিৎকার করে বন্দুকটা ছেড়ে দিয়ে হাত টেনে নিলাম। আমার হাত অসহ্যরকম জ্বালা করছিল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমি দিশেহারা হয়ে গেলাম।

ওই অবস্থাতেই দেখলাম, বন্দুকটার কাঠের অংশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল—পড়ে রইল তার ইস্পাতের কঙ্কাল।

আর আমার সাহসে কুলোয়নি, স্যার। বাঘে তাড়া করা ছাগলছানার মতো ভয়ে পাগল হয়ে জঙ্গলের মধ্যে এলোপাতাড়ি ছুটতে শুরু করলাম। কী করে যে সেদিন গাঁয়ে ফিরে আসতে পেরেছিলাম জানি না।

গাঁয়ে ফিরে হেডম্যানকে আমি সাবধান করে দিয়েছিলাম। তারপর গাঁয়ের সবাই ব্যাপারটা জানতে পারে। তখন ওই জঙ্গলটাকে ঘিরে ওইসব 'নো এন্ট্রি' বোর্ড লাগানো হয়েছে। আর জাটিঙ্গার সব ছেলেমেয়েই বংশপরম্পরায় ওই জায়গাটাকে এড়িয়ে চলতে শিখেছে। ওই জায়গাটা, স্যার, অভিশাপের গণ্ডি দিয়ে ঘেরা। কিন্তু কী অভিশাপ সেটা কেউ জানে না—আমিও সেদিন বুঝতে পারিনি।

ওর কাহিনি শেষ করে পহেলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। একটা ময়লা সূতীর চাদর ওর গায়ে জড়ানো ছিল, সেটাকে আঁকড়ে ধরে শরীরের আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাইল। তারপর চিবুক সামান্য তুলে আমার

দিকে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে রইল। যেন ওর রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা শুনে আমার কিছু একটা বলা উচিত।

অন্ধকার পহেলাকে প্রায় আড়াল করে রেখেছিল। তবু তারই মধ্যে ওর চোখ চকচক করছিল।

কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল। ঝিঁঝিপোকার দল মুহূর্তের জন্যে ওদের চিৎকার থামিয়ে আবার একঘেয়ে সুরে কান্না শুরু করল। সিগারেটের ধোঁয়ার মতো কুয়াশার রেখা পুবদিক থেকে ভেসে আসছিল। চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছিল, যেন কোনও পাহাড়ি মেয়ে বাতাসে ওড়না ভাসিয়ে দিয়েছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আর কোনও উপায় না দেখে আমি ইতস্তত করে বললাম, 'পহেলা, সেদিন তুমি...ইয়ে...আজকের মতো নেশা করে ছিলে না তো!'

একটা হেঁচকি তুলল পহেলা। তারপর নেশা-ধরা গলায় হো-হো করে হেসে উঠল। ওর হাসির মধ্যে কোথায় যেন একটা তিক্ত আক্ষেপ আর বিদ্রুপ লুকিয়ে ছিল। হাসির রেশটা অন্যরকমভাবে শেষ হতেই সেটা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

হাসি থামিয়ে জড়ানো গলায় পহেলা বলল, 'স্যার, কেউ যখন আমার কথা বিশ্বাস করে না তখন আমি তাকে আমার ডানহাতটা দেখাই...এই দেখুন...।'

চাদরের আড়াল থেকে ডানহাতটা বের করে সামনে বাড়িয়ে দিল পহেলা। আর সেই মুহূর্তেই ওর গল্প আগাগোড়া বিশ্বাস করলাম আমি।

জ্যোৎস্নার আলোয় দেখলাম, ওর হাতের পাঁচটা আঙুলের মাংস যেন কোন অলৌকিক উপায়ে উধাও হয়ে গেছে। কঙ্কালের হাতের মতো পাঁচটা হাড়ের আঙুল শূন্যে নড়াচড়া করছে। আর সেই সাদা আঙুল থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে এক অপূর্ব গোলাপি আলোর আভা।

সঙ্গে-সঙ্গে আমার চোখের সামনে বহু বছর আগে পহেলার দেখা অভিশপ্ত ফাঁকা জায়গাটা জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠল।





# ভয় পাওয়া মানুষ

চিৎকারটা শুনেই প্রিয়নাথ জোয়ারদার থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চিৎকারটার মধ্যে যেন হিম বরফকুচি মেশানো ছিল। চিৎকারটা যতক্ষণ ধরে চলছিল ততক্ষণের জন্য করিডরের আলোটা যেন মলিন হয়ে গেল—হঠাৎ ভোল্টেজ কমে গেলে যেমন হয়। তারপর, সেই ভয়-পাইয়ে-দেওয়া চিৎকারের রেশ শেষ হলে, বালবটা আবার তেজ ফিরে পেল।

বিনোদনারায়ণ প্রিয়নাথের সামনে দু-এক পা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন। তাঁর কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল। মুখে আলতো করে হাত বুলিয়ে নিয়ে নরম গলায় বললেন, সুনীত। ওর কথাই আপনাকে বলছিলাম। তেতলায় পেছনের দিকটায় ও থাকে।'

প্রিয়নাথ চিৎকারটার কথাই ভাবছিলেন। এমন চিৎকার বুকের ভেতর পর্যন্ত আঁচড় টেনে দেয়। খুব নীচু পরদায় শুরু হয়ে ধাপে-ধাপে ওপরে উঠছে। যেন ঘোরানো লোহার সিঁড়ি বেয়ে কেউ আইফেল টাওয়ারের মাথায় পৌঁছোতে চাইছে। আর যতই ওপরে উঠছে, গলার স্বর ততই চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

মৃত্যুকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে কেউ হয়তো এরকম চিৎকার করে। হয়তো ভাবে, এই চিৎকারটা তাকে বাঁচিয়ে দেবে। যত উঁচু পরদায় চিৎকার করতে পারবে, তার বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি।

চিৎকারটা শেষ হওয়ার পর কয়েক সেকেন্ড যেন আলপিন-নিস্তব্ধতা। তারপর বিনোদনারায়ণ কথা বলেছিলেন। কিন্তু প্রিয়নাথের কানে ভয়ঙ্কর চিৎকারটার রেশ তখনও বাজছিল। পুরোনো যত চিৎকার বা আর্তচিৎকার প্রিয়নাথ শুনেছেন সুনীতের চিৎকার এক পলকে সব মুছে দিয়েছে।

বিনোদবাবু বলেছিলেন, ওঁর ছোট ভাই সুনীতনারায়ণ মাঝে-মাঝে অদ্ভুতভাবে চিৎকার করে ওঠে। সেই সঙ্গে আরও কিছু-কিছু বিচিত্র কাজ করে। প্রিয়নাথ যদি এ-ব্যাপারে কোনও সাহায্য করতে পারেন তা হলে ভালো হয়। কারণ, ডাক্তার বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা জবাব দিয়ে দিয়েছেন।

বিনোদনারায়ণ প্রিয়নাথের খোঁজ পেয়েছেন লতায়-পাতায়। তারপর একদিন বিকেলবেলা ওঁর নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছেন। প্রিয়নাথকে খুলে বলেছেন নিজের সমস্যার কথা। তারপর কাতরভাবে অনুনয় করে বাড়িতে আসার জন্য অনুরোধ করেছেন।

'কী করে আপনি বুঝলেন আপনার ভাইয়ের প্রবলেমটা কোনও ভূতুড়ে ব্যাপার?' সিগারেটে কড়া টান দিয়ে জানতে চাইলেন ভূতনাথ।

কেমন যেন সঙ্কুচিত হয়ে ইতস্তত করে বিনোদনারায়ণ বললেন, 'লোকমুখে শুনেছি, বিজ্ঞান যেখানে শেষ সেইখান থেকে আপনার এলাকা শুরু। সুনীতের জন্যে ডাক্তার-সাইকিয়াট্রিস্ট করে-করে আমি বিজ্ঞানের পুঁজি শেষ করে বসে আছি। তাই নিরুপায় হয়ে আপনার কাছে এসে হাত পেতেছি। আমার ছোট ভাইটাকে যে-করে হোক বাঁচান। ওর কষ্ট আর সইতে পারছি না। এত হাসিখুশি টগবগে জোয়ান ছেলেটার এই প্যাথেটিক অবস্থা ভাবা যায় না...।'

কথা বলতে-বলতে বিনোদনারায়ণের চোখে জল এসে গিয়েছিল। প্রিয়নাথ লক্ষ করেছিলেন, ছোট ভাইয়ের কথা বলার সময় বড় ভাইয়ের মুখে-চোখে পিতৃস্নেহ ফুটে উঠেছিল—যা আজকের দিনে প্রায় দেখাই যায় না।

প্রিয়নাথ কয়েক সেকেন্ড চুপ করে বসে রইলেন। একমনে সিগারেটে টান দিয়ে গেলেন। তারপর ছোট্ট করে বললেন, 'ঠিক আছে। আমি একবার চেষ্টা করে দেখি। কবে আপনাদের বাড়ি যাওয়া যায় বলুন...।'

'যেদিন আপনি বলবেন।'

বিনোদনারায়ণদের বাড়ি বসিরহাটে। ওঁদের পিতৃপুরুষ জমিদার ছিলেন। তাই জমিজমা-পুকুর-দিঘির কোনও হিসেব ছিল না। এখনও নয়-নয় করে যা অবশিষ্ট আছে তাও অনেক। পুরোনো আমলের বিশাল বাড়িতে ওঁরা তিন ভাই থাকেন। বিনোদনারায়ণ, প্রমোদনারায়ণ, আর ছোট ভাই সুনীতনারায়ণ।

বিনোদনারায়ণ যখন সবে কিশোর থেকে যুবক হয়ে উঠছেন তখন ওঁদের বাবা সাপের কামড়ে মারা যান। শ্রাদ্ধ-শান্তি ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি মিটে গেলে হঠাৎই একজন সন্ন্যাসী ওঁদের বাড়িতে আসেন। সকলের হাত দেখে ভাগ্যচর্চা করে তিনি বলে যান, এ-বংশের পুরুষদের অপঘাতে অকালমৃত্যু হবে। এটা নিয়তির অভিশাপ।

তার পরই সুনীতের জন্ম হয়।

এক কয়েক বছর পর বিনোদনারায়ণের মা ম্যালেরিয়ায় মারা যান। প্রমোদ আর সুনীত তখন খুবই ছোট। বিনোদনারায়ণ ওঁদের কোলে-পিঠে করে আগলে রেখে বড় করেন। অভিশাপের ভয়ে তিনি বিয়ে করেননি। সারাটা জীবন সম্পত্তি দেখাশোনা আর ধর্ম-কর্ম নিয়ে থেকেছেন। মনে-মনে ভেবেছেন, নিশিদিন ঈশ্বর-সাধনায় মগ্ন থাকলে অভিশাপ ধীরে ধীরে কেটে যাবে। কালো ছায়া সরে গিয়ে আবার আলো দেখা দেবে।

'...কিন্তু এমনই ভবিতব্য দেখুন, সুনীত এই অদ্ভুত বিপদে পড়ল।' মলিন মুখে বললেন বিনোদনারায়ণ, 'জানি না, এটা সেই অভিশাপের কোনও ছায়া কি না।'

আপনার কি মনে হয় কোনও প্রেতাত্মা সুনীতের শরীরে বাসা বেঁধেছে?' প্রিয়নাথ প্রশ্ন করলেন।

'কী করে বলব!' হতাশভাবে জবাব দিলেন বিনোদবাবু, 'প্রমোদ তো বলছিল সেটাই হয়েছে। ওর চেনা একজন কাপালিক আছে। তাকে নিয়ে এসে কীসব তন্ত্র-মন্ত্র করলেই নাকি সুনীত ঠিক হয়ে যাবে। তা আমি ওর কথায় রাজি হইনি।'

'কেন?'

'প্রমোদ বহুকাল ধরেই কেমন বাউন্ডুলে গোছের। বাড়ির দিকে মন নেই। সুযোগ পেলেই সাধু সন্ত তান্ত্রিকদের পেছনে ছুটে বেড়াত—এখনও তাই। মাঝে-মাঝেই রাতে বাড়ি ফেরে না। যখন-তখন ছাইপাঁশ গিলে বসে থাকে। ওকে ভাই বলে পরিচয় দিতে আমার খুব লজ্জা করে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বিনোদনারায়ণ : 'আসলে দোষ আমারই, প্রিয়নাথবাবু—ওকে আমি শত চেষ্টা করেও মানুষ করতে পারিনি।

তাই ওর প্রতি আমার কোনও অভিযোগ নেই। বরং ওর মুখোমুখি হলেই আমি কেমন একটা অপরাধবোধে ভুগি। নিজের ব্যর্থতার কথা মনে পড়ে যায়। এটা আমার...।'

বিনোদনারায়ণের গলার স্বর কেমন যেন অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল। মাথা নীচু করে তিনি নিজেকে আড়াল করতে চাইছিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'প্লিজ, আপনি আপসেট হবেন না। আমরা যা চাই সবসময় কি তা হয়!...আচ্ছা, প্রমোদবাবু বিয়ে করেননি?'

'না।' একটু থেমে তারপর : 'ও যদি নিজে কখনও বিয়ে করে করবে—আমি বড় ভাই হিসেবে কখনও কোনও ইনিশিয়েটিভ নিতে পারব না।'

'ছোট ভাইয়ের ব্যাপারে প্রমোদবাবু দুঃখ পাননি?'

'পেয়েছে। ওকে আমরা ভীষণ ভালোবাসি। ও আমাদের গর্ব। এলাকার সবাই ওকে পছন্দ করে। লেখাপড়ায় জুয়েল ছেলে। খেলাধুলোতেও দারুণ। ওর অনেক বন্ধু-বান্ধব। সবাই মিলে হইহই করে ট্যুরে যায়, সোশাল ওয়েলফেয়ারের কাজ করে—মানে, করত। সুনীতকে সবাই একডাকে চেনে। আমি যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাই তখন যদি কেউ বলে, ওই যে, সুনীতের বড়দা যাচ্ছে, তখন আমার খুব আনন্দ হয়।'

সাদা শার্টের পাশপকেট থেকে রুমাল বের করে চোখে বুলিয়ে নিলেন বিনোদবাবু। একটু কেশে গলাটা স্বাভাবিক করে নিয়ে বললেন, 'আপনি একবার চলুন। নিজের চোখে সব দেখুন। তারপর...আপনি আমাদের শেষ ভরসা।'





প্রিয়নাথ হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বললেন, 'আমি প্রেতসিদ্ধ বা ওঝা নই। তবে ভূত-প্রেতের খোঁজ করে বেড়ানো আমার নেশা। চেষ্টা করে দেখি আপনাকে কোনওরকম হেল্প করা যায় কি না। আচ্ছা, সুনীত যে চিৎকার করে সেটা ঠিক কী ধরনের?'

'বলে বোঝাতে পারব না, প্রিয়নাথবাবু। আপনি বরং নিজের কানে শুনেই বিচার করবেন।'

প্রিয়নাথ লক্ষ করেছিলেন, কথাগুলো বলার সময় বিনোদনারায়ণের মুখে কেমন যেন অসহায় ভয়ের ছাপ ফুটে উঠেছিল।

এখন, সুনীতের চিৎকার নিজের কানে শোনার পর, প্রিয়নাথ সেই ভয়ের কারণ বুঝতে পারলেন। এই অপার্থিব চিৎকারে বুকের রক্ত যেন জমে বরফ হয়ে যায়।

'চলুন—ওপরে চলুন।'

বিনোদনারায়ণের কথায় প্রিয়নাথ সংবিৎ ফিরে পেলেন। ভাঙা ক্ষয় ধরা সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওঁরা ওপরে উঠতে শুরু করলেন।

সিঁড়ির বাঁকের মুখে দেওয়ালে বসানো কারুকাজ করা জাফরি। জাফরির ওপরের দিকে তিনটে ছোট-ছোট হরিণ। সময়ের প্রকোপে জায়গায়-জায়গায় রং চটে গেছে।

জাফরির ফাঁক দিয়ে ঠান্ডা বাতাস আসছিল। বাতাসে নদীর ঘ্রাণ প্রিয়নাথ টের পাচ্ছিলেন। একইসঙ্গে শীতের কামড়।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই উষ্ণতা ওঠা-নামা করছিল। শীত যেন লাজুকভাবে উঁকিঝুঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর উষ্ণতা নামতে শুরু করেছে। শীতও আনুষ্ঠানিকভাবে জাঁকিয়ে বসেছে।

গায়ে উলিকটের গেঞ্জি ও সোয়েটার থাকা সত্ত্বেও প্রিয়নাথ সামান্য কেঁপে উঠলেন।

ঘন-ঘন বাঁক নেওয়া সিঁড়ি বেয়ে ওঁরা ওপরে উঠছিলেন। প্রিয়নাথ লক্ষ করছিলেন, সরু-চওড়া নানান ধরনের অলিন্দ বাড়িটার নানান দিকে চলে গেছে—অনেকটা ভুলভুলাইয়ার মতন। আলোর ব্যবস্থা বলতে বেশিরভাগই বালব। দু-এক জায়গায় টিউব লাইট যে চোখে পড়ছে সেসব নতুন সংযোজন।

দেওয়ালে-দেওয়ালে ড্যাম্পের ছাপ চোখে পড়ছিল। সেইজন্যই হয়তো শীতের সঙ্গে একটা বাড়তি ঠান্ডা যোগ হয়ে গিয়েছিল।

তিনতলায় উঠে দুটো তালাবন্ধ ঘরের দরজা পেরিয়ে সুনীতের ঘরের দিকে এগোলেন ওঁরা দুজন। বিনোদনারায়ণ তালাবন্ধ দরজা দুটো পেরোনোর সময় বললেন, 'এত বড় বাড়িতে তিনটে মাত্র প্রাণী। একতলায় আমি, দোতলায় প্রমোদ, আর তেতলায় সুনীত। তাই বাড়তি ঘরগুলো তালাবন্ধই পড়ে থাকে। প্রায় বিশ বছর ওগুলোর দরজা খোলা হয়নি। খুললে হয়তো দেখব ইঁদুর, বাদুড়, আর চামচিকে আস্তানা গেড়েছে।'

প্রিয়নাথ কিছু বললেন না।

সুনীতের ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। বিনোদবাবু সামান্য ঠেলতেই দরজা খুলে গেল।

ঘরের ভেতরের আলো প্রিয়নাথের চোখ ধাঁধিয়ে দিল, অলিন্দের আলো মুছে দিল। আর একইসঙ্গে ঘরের দৃশ্য প্রিয়নাথকে ধাক্কা দিল।

ঘরের এক কোণে সুন্দর ধপধপে বিছানা। সেখানে শুয়ে আছে বছর চব্বিশ-পঁচিশের এক যুবক। ফরসা রোগা চেহারা। বুকের কাছ পর্যন্ত লেপ টানা। একটা হাত লেপের বাইরে বলেই রোগা চেহারাটা স্পষ্ট করে আন্দাজ করা গেছে।

সুনীতের মাথায় একরাশ কোঁকড়া চুল। নাক ঠোঁট সুন্দর। ঠোঁটের ওপরে চওড়া গোঁফ। চোয়ালে দু-একদিনের দাড়ি।

সুনীতের চোখজোড়া প্রিয়নাথ দেখতে পেলেন না—কারণ, সাদা কাপড়ের পটি দিয়ে ওর চোখ ঢাকা।

প্রিয়নাথ বেশ অবাক হয়ে বিনোদনারায়ণের দিকে তাকালেন। বিনোদনারায়ণ ইশারায় ওঁকে অপেক্ষা করতে বললেন।

সুনীতের খাটের কাছে টুলে একজন বয়স্কা মহিলা বসে ছিলেন। রোগা ময়লা চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, চোখে চশমা, পরনে নীল পাড় সাদা শাড়ি। দেখে আয়া বলে মনে হয়।

বিনোদনারায়ণ তাঁকে বললেন, 'মাসি, আপনি একটু নীচে গিয়ে বসুন। ডাক্তারবাবু কলকাতা থেকে এসেছেন—ছোড়দাকে দেখবেন।'

ভদ্রমহিলা উঠে চলে যাচ্ছিলেন, বিনোদনারায়ণ জিগ্যেস করলেন, 'ওকে ঘুমের ওষুধটা খাইয়ে দিয়েছেন?'

ছোট্ট করে মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলে মহিলা ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন, 'সুনীতের চোখ বাঁধা কেন?'

উত্তর দিল সুনীত, 'অন্ধকারে ঘুমোতে আমার ভয় করে। তাই ঘরের আলো জ্বেলে রেখে চোখ বেঁধে ঘুমোতে চেষ্টা করি।'

চোখ ফিরিয়ে সুনীতের দিকে তাকিয়েছিলেন প্রিয়নাথ। ও গায়ের লেপ সরিয়ে বিছানায় উঠে বসেছে। বাঁ-হাতে টান মেরে সরিয়ে দিয়েছে চোখের পটি।

ওর নিষ্পাপ সুন্দর চোখজোড়া প্রিয়নাথকে মুগ্ধ করল।

বিনোদনারায়ণ ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। তারপর ছোট ভাইকে লক্ষ্য করে বললেন, 'লেপটা গায়ে দে—ঠান্ডা লেগে যাবে।'

বসা অবস্থাতেই সুনীত লেপটা গায়ে জড়িয়ে নিল। তারপর কৌতূহলী গলায় ভূতনাথকে প্রশ্ন করল, 'আপনি কীসের ডাক্তার? বডির, না মাইন্ডের?'

ওর প্রশ্নের ধরনে প্রিয়নাথ বেশ মজা পেলেন। বিনোদনারায়ণ একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু সেটায় না বসে আয়া-মাসির ছেড়ে যাওয়া টুলটায় গিয়ে বসলেন প্রিয়নাথ। তারপর চোখের চশমাটা সামান্য নেড়েচেড়ে মজার সুরে পালটা প্রশ্ন করলেন, 'তোমার অসুখটা কীসের—বডির, না মাইন্ডের? ''তুমি'' করে বললাম—কিছু মাইন্ড কোরো না?'

বিনোদনারায়ণ সুনীতের পায়ের দিকটায় খাটের এক কোণে বসে পড়লেন। বললেন, 'সুনীত, ইনি হলেন প্রিয়নাথ জোয়ারদার। অনেক রিকোয়েস্ট করে কলকাতা থেকে ওঁকে ধরে এনেছি। আমাদের বাড়িতে ক'দিন

থাকবেন...তোকে হেল্প করার চেষ্টা করবেন। তোর সব কথা তুই ওঁকে খুলে বলতে পারিস।'

সুনীত বারদুয়েক কাশল। লেপটা আরও ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল। তারপর মাথা নীচু করে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

বিনোদনারায়ণের সঙ্গে প্রিয়নাথের চোখাচোখি হল।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রিয়নাথ আগের প্রশ্নটাই আবার করলেন, 'তোমার অসুখটা কীসের—বডির, না মাইন্ডের?'

আচমকা মুখ তুলে তাকাল সুনীত। বলল, 'বডিরও না, মাইন্ডেরও না। অন্য কিছু...।'

বিনোদনারায়ণকে অবাক করে দিয়ে সিরিয়াস গলায় ভূতনাথ বললেন, 'আমি সেই অন্য কিছুর ডাক্তার।'

পলকে ঘরের আবহাওয়া যেন পালটে গেল। বিনোদনারায়ণ উসখুস করতে লাগলেন। সুনীত কেমন চোরাচাউনিতে ভূতনাথকে দেখতে লাগল।

প্রিয়নাথ অফিসের ওপরওয়ালার সুরে বললেন, 'শোনো, সুনীত—তোমার কী হয়েছে আমি বলছি। তুমি ভীষণ ভয় পেয়েছ। কেমন করে তা জানি না। তবে সেই ভয় তোমাকে ধীরে-ধীরে শেষ করে দিচ্ছে। তুমি যদি আমাকে সব খুলে বলো, তা হলে আমি তোমাকে বাঁচাতে চেষ্টা করব। তোমার জন্যে দুশ্চিন্তা করে করে তোমার বড়দা-মেজদাও তো শেষ হয়ে যাচ্ছেন।'

সুনীত হঠাৎ কেঁদে ফেলল। কাঁদতে-কাঁদতেও বলল, 'কী করে বলব! সে-কথা তো কাউকে বলা বারণ। কাউকে বলামাত্রই সর্বনাশ নেমে আসবে।' একটু থেমে তারপর : '...তবে যদি কেউ নিজে গিয়ে দেখে আসে তা হলে আলাদা কথা...।'

প্রিয়নাথ বিনোদনারায়ণের দিকে তাকালেন। বিনোদনারায়ণ ইতস্তত করে বললেন, 'সুনীতের ফটোগ্রাফির শখ আছে। মাঝে-মাঝেই ও ফটো তোলার ঝোঁকে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ত। মাসদুয়েক আগে ও সমস্তিপুরের দিকে গিয়েছিল। সঙ্গে ওর এক বন্ধু—পরেশ—ছিল। কিন্তু রওনা হওয়ার পাঁচদিন পর পরেশ বাড়ি ফিরে আসে। কারণ, বাড়িতে এস. টি. ডি. করে জানতে পেরেছিল ওর বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সুনীত ফিরে আসে তার ছ'দিন পর। তারপর থেকেই ওর এই অসুখ। আমি ওকে বহুবার জিগ্যেস করেছি, কিন্তু ও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেনি—অথবা, বলতে চায়নি। শুধু ''নেহা'' আর ''সদরিয়া''—এই দুটো শব্দ ওর মুখ থেকে বারবার শুনতে পেয়েছি—তার বেশি কিছু নয়।'

বিনোদবাবু থামলেন।

সুনীত তখনও মাথা নীচু করে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল দেখে বিনোদনারায়ণ উঠে ছোট ভাইয়ের কাছে গেলেন। পাশে দাঁড়িয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ওকে শান্ত করতে চাইলেন।

প্রিয়নাথ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু তার আগেই সুনীত মুখ তুলে তাকাল বড়দার দিকে। করুণ গলায় বলল, 'সেই ফটোটার কথা বললে না!'

'ওহ-হ্যাঁ। ওর তুলে আনা দু-রিল ফটোগ্রাফের মধ্যে আটটা ছবি ব্ল্যাঙ্ক। মানে, ডেভেলাপ করে কিছু পাওয়া যায়নি। তবে একটা ফটো উঠেছে ভারী অদ্ভুত। সেটা আপনাকে দেখাচ্ছি...।' বলে বিনোদনারায়ণ ঘরের একটা তাকের দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেদিকে তাকালেন প্রিয়নাথ।

সুনীতের ঘরটা বেশ আধুনিক ধাঁচে শৌখিনভাবে সাজানো। দেওয়ালে সুন্দর তাক তৈরি করে টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা, বই সুচারুভাবে রাখা। দুটো বইয়ের ফাঁক থেকে একটা খাম বের করে নিলেন বিনোদনারায়ণ। তারপর প্রিয়নাথের কাছে এগিয়ে এসে খামটা প্রিয়নাথের হাতে দিলেন।

খামের ভেতর থেকে একটা ফটো টেনে বের করলেন প্রিয়নাথ।

ফটোর সবটাই ঘোর কালো এবং ঘন নীল মেশানো একটা অন্ধকার। তারই মাঝে সরষের মাপের অনেকগুলো লাল ফুটকি এলোমেলোভাবে ছড়ানো।

এই সাদামাঠা ফটোগ্রাফের কী মানে থাকতে পারে প্রিয়নাথ ভেবে পেলেন না।

বিনোদনারায়ণ বললেন, 'এই ছবিটার মধ্যে যে কী আছে কে জানে! এটা দেখলেই সুনীত ভীষণ ভয় পেয়ে আপসেট হয়ে যায়। ও কোথাও গিয়ে কোনও কিছুর ন'টা ছবি তুলেছিল। তার মধ্যে আটটা ব্ল্যাঙ্ক, আর ন' নম্বরটা এই...।'

অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে ফটোটা দেখার পর প্রিয়নাথ সুনীতকে জিগ্যেস করলেন, 'এসব ছবি তুমি কোথায় গিয়ে তুলেছিলে?'

সুনীতের বোধহয় ঘুম পাচ্ছিল। ও ঝিম-ধরা চোখে প্রিয়নাথকে জরিপ করছিল। বোধহয় দেখতে চাইছিল ফটোটা দেখার পর প্রিয়নাথের কীরকম প্রতিক্রিয়া হয়। সেরকম কোনও প্রতিক্রিয়া হল না দেখে একটু যেন হতাশই হল।

প্রিয়নাথের প্রশ্নে ও অস্পষ্ট গলায় বলল, 'সদরিয়া...নেহা...।'

প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। অন্যমনস্কভাবে কিছুক্ষণ সিগারেটে টান দিয়ে গেলেন।

বিনোদনারায়ণ চুপচাপ খাটের কোণে বসে পড়লেন, প্রিয়নাথকে লক্ষ করতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর প্রিয়নাথ মুখ খুললেন। গম্ভীর গলায় বললেন 'সুনীত, তুমি বোধহয় বাঁচতে চাও না। নইলে সব কথা আমাকে অন্তত খুলে বলতে আমি কথা দিচ্ছি—কেউ তোমার কোনও ক্ষতি করতে পারবে না।'

সুনীত করুণ গলায় বলল, 'ওরা কাউকে বলতে বারণ করেছে। কাউকে বলা যাবে না। কাউকে না। কেউ যদি নিজে দেখে আসে...।'

'আমি যাব!' জোরালো গলায় বললেন প্রিয়নাথ, আমি নিজে গিয়ে দেখে আসব। ওদের কাউকে আমি ভয় পাই না।'

'আমি ভয় পাই...।'

'তুমি বলো কী করে সেখানে যেতে হয়।'

'জানি না।' ঘুম-জড়ানো গলায় বলল সুনীত, '...সদরিয়া...নেহা...।'

প্রিয়নাথ হাতের ফটোটা সুনীতের চোখের সামনে মেলে ধরলেন : 'বলো, 'কী আছে এই ছবিতে? বলো!'

চোখের পলকে সুনীতের মুখ আতঙ্কে ভেঙেচুরে গেল। ও বিশাল হাঁ করে ঘণ্টাদেড়েক আগের সেই হিমেল চিৎকার শুরু করল।

প্রিয়নাথদের কানে তালা লেগে গেল। ঘরের জানলার শার্সি ঝনঝন করে কাঁপতে লাগল। এক ভয়ঙ্কর অনুনাদ ঘরের আবহাওয়াকে পাগল করে দিল।

বিনোদনারায়ণ লাফিয়ে উঠে ছোট ভাইকে একেবারে জড়িয়ে ধরলেন। ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন।

প্রিয়নাথ টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর তীব্র চোখ সারাক্ষণ সুনীতকে লক্ষ করছিল।

আয়া-মাসি ভেজানো দরজা ঠেলে তাড়াহুড়ো করে ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁর মুখে-চোখে উদ্বেগ।

সুনীত হাঁফাচ্ছিল। ওর চোখ আধবোজা মতন হয়ে গেছে। বিনোদনারায়ণ ওকে ধীরে ধীরে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। মাসিকে লক্ষ্য করে বললেন, 'মাসি, আপনি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিন। আমরা যাচ্ছি—।'

প্রিয়নাথ আর বিনোদনারায়ণ সুনীতের ঘর ছেড়ে অলিন্দে বেরিয়ে এলেন। উজ্জ্বল আলো থেকে স্তিমিত আলোয় আসায় প্রিয়নাথের দেখতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। তিনি বিনোদনারায়ণকে বললেন, 'ফটোগ্রাফটা আমার কাছে থাক। কাল সকালে আমি সুনীতের সঙ্গে কথা বলব। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?'

'আপত্তি!' মলিন আলোয় বিনোদনারায়ণের হাসিটা কেমন যেন দেখাল। নরম গলায় তিনি বললেন, 'সুনীতকে সুস্থ করে তোলার জন্যে কোনও কিছুতেই আমার আপত্তি নেই।'

ওঁরা সিঁড়ি ঘুরে দোতলায় নেমে এসেছিলেন। তখনই কানে এল জড়ানো গলায় গান: '...কারণ সেবায় বারণ করো, জানতে পারি কারণটা কী...?''

'প্রমোদ।' চাপা গলায় বললে বিনোদবাবু, 'এসব নাকি ওর তন্ত্র সাধনার অঙ্গ। হুঁঃ!'

প্রিয়নাথ কোনও কথা বললেন না।

'রাত অনেক হল চলুন, হাত-মুখ ধুয়ে খেয়ে নেওয়া যাক।'

প্রিয়নাথকে একতলার খাওয়ার ঘরের দিকে নিয়ে চললেন বিনোদনারায়ণ।

জাফরির ফাঁক দিয়ে বাতাস আসছিল। সেদিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথ বুঝতে পারলেন, বাইরে অন্ধকার আর শীতের রেষারেষি শুরু হয়ে গেছে।

টিনের বাক্স লাগানো সাইকেল-ভ্যান নিয়ে যারা পাঁউরুটি আর বিস্কুট দোকানে-দোকানে জোগান দেয় তাদের কথা মনে পড়ল প্রিয়নাথের। পাঁউরুটি আর বিস্কুটের বদলে যদি বেশ কিছু কাচের মার্বেল সেই বাক্সে ভরে ভ্যানটাকে সদ্য ধান-কাটা কোনও চাষ-জমির ওপর দিয়ে চালানো হয়, তা হলে যেরকম ঝাঁকুনি ও শব্দ হবে তার সঙ্গে এই বাসটার চলার দারুণ মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন তিনি।

সমস্তিপুরে নেমে সরু লাইনের টেনে চড়ে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা পথ চলার পর তিনি নেমেছিলেন কামনিতাল স্টেশনে। সেখান থেকে বাস ধরেছেন—তবে বাসটাকে দোমড়ানো-তোবড়ানো ক্যানেস্তারা বলাই ভালো। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় ছুটে চলা বাসের শব্দ আর ঝাঁকুনি প্রিয়নাথকে প্রায় কাহিল করে দিচ্ছিল। যদিও বাসের নাম 'উড়ন খটোলা।'

আশার কথা একটাই। এই বাস তাঁকে সদরিয়া নিয়ে যাবে! তারপর... সেখানে নেমে...খুঁজে বের করতে হবে নেহাকে।

জানলার বাইরে দুপুর গড়িয়ে বিকেল এসে গেছে। স্তিমিত রোদে ছুটে চলা গম-ভুট্টা-জওয়ারের খেত আরও সুন্দর দেখাচ্ছে। সামান্য খোলা কাচের জানলার ফাঁক দিয়ে ছুটে-আসা বাতাস ক্রমে আরও ঠান্ডা হচ্ছিল। প্রিয়নাথ জ্যাকেটের চেন গলা পর্যন্ত টেনে দিলেন, মাফলারটাকে আরও ভালো করে জড়িয়ে নিলেন।

ভিড়ে ঠাসা বাসের ভেতরে অনেক যাত্রীই বিড়ির নেশায় ব্যস্ত। বোধহয় 'নো স্মোকিং' কথার 'নো'-টা বাসের দেওয়াল থেকে মুছে গেছে বলে।

খানিক ইতস্তত করে অস্বস্তি কাটিয়ে প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর সুনীত নারায়ণের সমস্যার দুশ্চিন্তায় ডুবে গেলেন।

হঠাৎ তাঁর মাথায় ভেতরে সুনীত হাড়-কাঁপানো ভয়ংকর চিৎকার করে উঠল।

আর প্রিয়নাথের সাতদিন আগের কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল বসিরহাটের কথা। ঘোরালো প্যাঁচালো অলিন্দ আর সিঁড়িতে জট পাকানো প্রকাণ্ড বাড়িটার কথা।

সেদিন রাতে খাওয়াদাওয়ার পর প্রিয়নাথের চোখে ঘুম আসেনি।

দোতলার একটা ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিছানায় বসে নোটবই আর পেন দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে নানান মন্তব্য লিখেছেন প্রিয়নাথ। সুনীতের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য, বিনোদনারায়ণের কাছ থেকে শোনা কিছু জরুরি কথা, আর নিজের মতামত। সেইসঙ্গে লিখে নিয়েছেন, এরপর তাঁকে কী-কী কাজ করতে হবে।

লেখা-টেখার কাজ শেষ হলে পর প্রিয়নাথ ঘর অন্ধকার করে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন। ঘরের সব জানলা-দরজা বন্ধ করে শুলে তাঁর কেমন যেন দম আটকে আসে। তাই পায়ের দিকের একটা জানলার পাল্লা অর্ধেকটা খুলে রেখেছিলেন। সেটা নিশ্চয়ই পুব দিক—কারণ, চাঁদের একটা টুকরো দেখা যাচ্ছিল।

বহু চেষ্টা করেও ঘুম আসছিল না। বিছানায় উসখুস করছিলেন। হঠাৎই জড়ানো গলায় গানের কলি শুনতে পেলেন : 'নৃমুণ্ডমালিনী তারা/ মুণ্ডমালা কোথায় পেলি...।'

প্রমোদনারায়ণ। দোতলার বাসিন্দা—প্রিয়নাথের প্রতিবেশী।

রাতে খাওয়ার সময় প্রমোদনারায়ণের দেখা পাননি প্রিয়নাথ। এখন ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলে নিলে কেমন হয়!

বাইরে বেরিয়ে দেখলেন চওড়া বারান্দার শেষ প্রান্তে, খানিকটা চাতাল মতো জায়গায়, একজন ছায়া-মানুষ বসে আছে। তার শরীর অন্ধকার আর চাঁদের আলোয় মাখামাখি।

পায়ে-পায়ে কাছে এগিয়ে গেলেন প্রিয়নাথ। আলতো করে ডাকলেন, 'প্রমোদবাবু—।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন প্রমোদনারায়ণ।

একমুখ দাড়ি, ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল, কপালে লাল তিলক—চাঁদের আলোয় কালো দেখাচ্ছে। আর গভীর চোখদুটো নিশাচর প্রাণীর মতো অন্তর্ভেদী, উজ্জ্বল।

ঘাড় ঘুরিয়ে ওপরদিকে তাকালেন প্রমোদনারায়ণ : 'ও, ভূতনাথবাবু! আসুন...বসুন। মায়ের চরণ-ধোওয়া চাঁদের আলো...এর কোনও জবাব নেই।'

চাতালে সতরঞ্চি পাতা ছিল। ভূতনাথ তার ওপরে বসে পড়লেন। খোলা জায়গায় বেশ শীত করছিল। গায়ের শাল আরও ঘন করে জড়িয়ে নিলেন।

অন্ধকারে বেশ কিছু গাছের মাথা আর দু-একটা বাড়ি চোখে পড়ছে। একটা প্যাঁচা নিঃশব্দে উড়ে গেল। কয়েকটা জোনাকি আলোর ফুটকি জ্বেলে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রিয়নাথের মনে পড়ে গেল সুনীতের ফটোটার কথা।

শীতের বাতাস যেমন-তেমন বইছিল। প্রিয়নাথের নাকে মদের গন্ধ ভেসে আসছিল।

'শুনেছি, আপনি সুনুকে সারিয়ে তোলার জন্যে কলকাতা থেকে এসেছেন।' প্রমোদনারায়ণ কথা বললেন, 'আমিও ওকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছি। কিন্তু দাদা এমন ঝামেলা করে! কিছুতেই বোঝে না ধম-কর্ম এক জিনিস আর তন্ত্র আর-এক জিনিস। আমার সাধনায় বারবার বিঘ্ন ঘটায়...।' বেশ বিরক্ত-ভাবে কথা শেষ করলেন প্রমোদবাবু।

প্রিয়নাথের কৌতূহল হল। ওঁকে জিগ্যেস করলেন, 'আপনি কীভাবে সুনীতকে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করছেন একটু বলবেন?'

'বললাম যে—তন্ত্র দিয়ে। সবাই জানে, তন্ত্রশাস্ত্র চিরন্তন—প্রত্যক্ষ ফল দেয়। তন্ত্র স্বয়ং মহেশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী। একে কেউ কখনও অবজ্ঞা করে!' একটু থেমে প্রমোদনারায়ণ বললেন, 'সুনীতের জন্যে আমি ভূত-প্রেত ভয়নাশক যন্ত্র প্রয়োগ করেছি।'

'সেটা কী জিনিস?'

'চলুন—আমার ঘরে চলুন—দেখাচ্ছি।'

প্রমোদনারায়ণ চাতাল ছেড়ে উঠে পড়লেন। গুনগুন করে গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে ঘরের দিকে রওনা দিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে অনুসরণ করলেন।

ঘরটা যথেষ্ট প্রাচীন, আর মাপে বেশ বড়। মেঝে পর্যন্ত লম্বা-লম্বা জানলা। ঘরের সিলিং-এ কড়ি-বরগা।

ঘরের দেওয়ালে নানা ধরনের ছবি আর ছক আঁকা। শিব ও কালীর বড়-বড় দুটো ফটো মালা দিয়ে সাজানো। ঘরের মেঝের এককোণে বইয়ের গাদা। তার পাশে চারটে তাকও বইয়ে ঠাসা।

ঘরের ডানদিক ঘেঁষে অগোছালো ময়লা বিছানা। বিছানার পাশে টেবিলে মদের বোতল, গ্লাস আর চশমা।

সব মিলিয়ে ঘরটায় কেমন যেন অগোছালো উচ্ছৃঙ্খল ছাপ।

হাতওয়ালা একটা চেয়ারে প্রিয়নাথকে বসতে বললেন প্রমোদনারায়ণ। তারপর টেবিল থেকে চশমাটা চোখে দিয়ে খাটের তলায় কী যেন খুঁজতে লাগলেন।

অবশেষে খুঁজে পেয়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাতে লাঠির মতো গোল করে পাকানো একটা কাগজ। সেটা ভূতনাথের সামনে মেলে ধরে বললেন, 'এই দেখুন—ভূত-প্রেত ভয়নাশক যন্ত্র।'

ভূতনাথ দেখলেন, একটা ভূর্জপত্রে ছক কেটে কয়েকটা সংখ্যা

লেখা :

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪ | ৫৬ | ১৬ | ৬০ |
| ৩১ | ৪৪ | ২০ | ৪০ |
| ৫২ | ৭ | ৩৪ | ১২ |
| ৪৮ | ২৮ | ৩৬ | ২৪ |

প্রমোদনারায়ণ বললেন, 'দীপান্বিতা অমাবস্যার রাতে অষ্টগন্ধ দিয়ে লিখে রেখেছি। দাদাকে লুকিয়ে সুনীতের ঘরের দেওয়ালে—খাটের নীচে—সিঁদুর দিয়ে এই যন্ত্র লেখা আছে। এ ছাড়া শ্মশানে গিয়ে কিছু ক্রিয়াকর্ম করার চেষ্টা করছি। একটু-একটু কাজ হচ্ছে...আরও হবে। আসলে সুনু যে কোনওরকম হেল্প করছে না।'

প্রমোদনারায়ণের হাত থেকে যন্ত্রটা নিয়ে প্রিয়নাথ খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর সেটা ওঁকে ফিরিয়ে দিতে-দিতে বললেন, 'আচ্ছা, সুনীত যে বারবার ''সদরিয়া'' আর ''নেহা'' শব্দ দুটো বলছে, তার অর্থ কী?'

প্রমোদবাবুর কপালে ভাঁজ পড়ল। ছোট্ট একটা ঢেকুর তুলে বললেন, 'আমি ওকে বহুবার জিগ্যেস করেছি। তাতে আমার যা মনে হয়েছে, সদরিয়া কোনও জায়গার নাম—সমস্তিপুর থেকে যাওয়া যায়। আর নেহার ব্যাপারে জিগ্যেস করলে সুনু বলছে সেটা ওখানে গেলেই বোঝা যাবে...বলা যাবে না।'

রাতের আকাশে কুকুরের কাতর চিৎকার শোনা গেল।

প্রিয়নাথ চুপ করে ছিলেন। প্রমোদনারায়ণকে দেখছিলেন।

প্রমোদনারায়ণ বললেন, 'আপনি কাল সকালে ওকে একবার জিগ্যেস করে দেখুন। যদি নতুন কোনও তথ্য পান...। ওর কষ্ট আর চোখে দেখা যাচ্ছে না...।'

শেষ কথাটা বলার সময় তন্ত্রসাধক মানুষটার গলা ভারী হয়ে এল। প্রিয়নাথ টের পেলেন, লোকে যা-ই বলুক না কেন, মানুষটার ভেতরে এখনও একটা স্নেহশীল মেজদা অবশিষ্ট আছে।

ওঁকে বিদায় জানিয়ে ঘরে ফিরে এলেন ভূতনাথ। বিছানায় গা ঢেলে দিতেই ঘুম দু-চোখে আসন পেতে বসল। ঘুমের ঘোরে সুনীতের তোলা ফটোগ্রাফটাকে স্বপ্ন দেখলেন। তবে ফটোর লাল ফুটকিগুলো জোনাকির মতো জ্বলছিল-নিভছিল।

বাসের প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি প্রিয়নাথের ভাবনার সুতো ছিঁড়ে দিল। কন্ডাক্টর দেহাতি ঢঙে হাঁক পাড়ল : 'সদরিয়া! সদরিয়া!'

সিট ছেড়ে উঠে বাঙ্ক থেকে সুটকেসটা নিলেন প্রিয়নাথ। প্রায় ধস্তাধস্তি করে ভিড় ঠেলে বাস থেকে নেমে পড়লেন রুক্ষ রাস্তায়।

এটা যে সদরিয়া নয় সেটা প্রিয়নাথ খোঁজখবর করে অনেক আগেই জেনেছেন। তবে এখান থেকে টাঙা পাওয়া যায়। টাঙা নিয়ে যায় গণ্ডক নদীর পাড়ে। সেখান থেকে খেয়া পার হয়ে আবার টাঙায় চড়ে বেশ খানিকটা গেলে তবে সদরিয়ার দেখা পাওয়া যাবে।

এতসব কাণ্ড করে প্রিয়নাথ যখন সদরিয়ার পা রাখলেন তখন অন্ধকার এবং শীত জাঁকিয়ে বসে পড়েছে। কুয়াশা ঠেলে একটা চায়ের দোকানে এসে দাঁড়ালেন।

দোকানে চার-পাঁচজন মানুষের জটলা। ওরা সব মুড়ি দিয়ে বসে কাঠের আগুন ঘিরে তাপ নিচ্ছে। গায়ে চাদর অথবা কম্বল। মাথায়-গলায় মাফলার, নয় গামছা।

দোকানে ঢুকে উনুনের কাছাকাছি একটা ভাঙা কাঠের বেঞ্চে বসলেন প্রিয়নাথ। ভাঙা-ভাঙা হিন্দিতে এক গ্লাস চা আর দুটো বিস্কুট দিতে বললেন।

প্রিয়নাথ দোকানে ঢোকামাত্রই দোকানের লোকজন কথাবার্তা থামিয়ে চুপ করে ওঁকে দেখছিল। প্রিয়নাথের চেহারা ও পোশাকে ভিনদেশি ভাব কটকট করছে। প্রিয়নাথের মনে হল, ওরা কেমন সতর্ক ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে। কোনও কিছুর জন্য যেন অপেক্ষা করছে।

ঠিক এইরকম সতর্ক দৃষ্টি সুনীতনারায়ণের চোখেও দেখেছেন প্রিয়নাথ। প্রমোদনারায়ণের সঙ্গে কথা বলার পরদিন সকালে সুনীতের ঘরে গিয়ে আর-এক দফা চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তাতে বিরাট কিছু লাভ হয়নি। 'সদরিয়া' আর 'নেহা' শব্দ দুটো আলোচনায় এসে পড়তেই প্রিয়নাথ জানতে চেয়েছেন, 'তুমি সদরিয়ায় গিয়েছিলে না?'

'হ-হ্যাঁ...মানে...।'

'কী করতে গিয়েছিলে?' তীব্র স্বরে আবার প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন ভূতনাথ।

'ফ...ফটো তুলতে...ঘুরতে...।' কেমন যেন ঘুম-জড়ানো গলায় বলল সুনীত।

'সমস্তিপুর থেকে সদরিয়া কেমন করে যেতে হয়?'

হঠাৎই ভয় পেয়ে গেল সুনীত। ওর মুখটা চোখের পলকে রক্তহীন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কাঁপা গলায় ও বলল, 'না, না—ওখানে যাইনি। ওখানে কেউ যায় না। আসল জায়গাটা আরও ভেতরে...কেউ সেখানে যায় না...আমাকে বলতে বারণ করেছে।'

'কে বারণ করেছে?'

ভূতে-পাওয়া মানুষের মতো কেঁপে উঠল সুনীত। প্রায় আঁতকে উঠে বলল, 'ওরা...ওরা বারণ করেছে। নেহা...নেহা...।'

'নেহা মানে কী?' সুনীতের হাত চেপে ধরে ওর মুখের ওপরে একরকম ঝুঁকে পড়লেন প্রিয়নাথ 'কে নেহা? কী নেহা?'

সুনীত মাথা নীচু করল। ভয়ে কাঁদতে শুরু করল। গোঙানির স্বরে বলল, 'জানি না। আর কিছু জানি না। আমাকে ছেড়ে দিন...প্লিজ... প্লিজ...।'

প্রিয়নাথ ওর অনুনয় আর কান্নাকে পাত্তা দেননি। নাছোড়বান্দার মতো বলেছেন, 'তুমি কাকে ভয় পাচ্ছ? এখন তো দিনের আলো...এখন কীসের ভয়!'

সুনীত কান্না থামিয়ে ভূতনাথের দিকে সরাসরি তাকিয়েছে। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থেকে তারপর বলেছে, 'না, এখন ভয় নেই। কিন্তু দিনের পর তো রাত আসবেই...তখন? তখন ওরাই সব...ওদের গোপন কথা আমি ফাঁস করতে পারব না। কেউ যদি নিজে থেকে জানতে পারে তা হলে ঠিক আছে। আমি কিছু বলতে পারব না—।'

এরপর সুনীত মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে।

এখন এই কুপির আলোয় বসে থাকা শীতে ঘেরা মানুষগুলোও যেন সুনীতের মতো মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছে। অপেক্ষা করছে।

ধোঁয়া-ওঠা চায়ের গ্লাস প্রিয়নাথের হাতে এগিয়ে দিল দোকানদার— সঙ্গে দুটো বিস্কুট। চায়ে চুমুক দিতে-দিতে দোকানদারের সঙ্গে একরকম জোর করেই আলাপ জুড়ে দিলেন প্রিয়নাথ। এই শীতের রাতে একটা আশ্রয় না পেলে তিনি থাকবেন কোথায়!

বহু চেষ্টা করে যেটুকু জানা গেল তা হল : রাতে থাকার জায়গা পাওয়া মুশকিল। অচেনা মানুষকে কেউ এখানে আশ্রয় দেয় না। সেইজন্যই সন্ধের সময় বাঙালিবাবুকে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছে। তবে এখনও সময় আছে। টাঙা নিয়ে বাস-রাস্তায় গেলে সাতটার লাস্ট বাসটা ধরা যাবে। সেটাই বাবুজির পক্ষে ভালো হবে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে পথে নামলেন প্রিয়নাথ। সুনীত কি এখানে সত্যিই এসেছিল? রাতে কোথায় আশ্রয় নিয়েছিল ও? যদি রাতে কোথাও থাকার জায়গা না পাওয়া যায়...।

এইসব কথা ভাবতে-ভাবতে প্রিয়নাথ কাঁচা সড়ক ধরে টাঙা-স্ট্যান্ডের দিকে এগোচ্ছিলেন, হঠাৎই কানে এল মলের ছমছম শব্দ।

ঘুরে তাকালেন প্রিয়নাথ।

বছর তেরো-চোদ্দোর একটি ফুটফুটে কিশোরী। পরনে ঘাগরা, চোলি, চাদর, ওড়না। পোশাক-মলিন। তবে রূপ আছে। রাস্তার আলো কম— কিন্তু তা সত্ত্বেও মেয়েটির রূপ আড়াল করা যায়নি।

প্রিয়নাথ নানা জটিল ভাবনায় ব্যস্ত ছিলেন। মেয়েটি ওঁর চোখে তাকিয়ে এমন সরল সুন্দরভাবে হাসল যে, সব দুশ্চিন্তা কোথায় মিলিয়ে গেল।

মেয়েটি বাঁ-হাতে ঝুলছে অ্যালুমিনিয়ামের একটা তোবড়ানো ক্যান। আর ডান হাতের মুঠোয় বোধহয় পয়সা।

ওর হাসিতে কেমন একটা ভরসা ছিল, প্রচ্ছন্ন আবাহনও ছিল যেন। হয়তো সেই কারণেই প্রিয়নাথ ওকে জিগ্যেস করে বসলেন এখানে রাতে থাকার কোনও জায়গা পাওয়া যাবে কি না।

প্রিয়নাথের জোড়াতালি দেওয়া ভাষা মেয়েটি দিব্যি বুঝতে পারল। মিষ্টি হেসে জবাব দিল, 'কিঁউ নহী! জরুর মিলবে। হামার ঘর হ্যায় উধর—।' আঙুল তুলে পশ্চিমদিকের অন্ধকার দেখাল মেয়েটি।

দুশ্চিন্তা নিমেষে মুছে গেল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই প্রিয়নাথ ভীষণ ক্লান্ত বোধ করলেন। ভ্রমণের ধকল তাঁকে মুহূর্তে যেন কাবু করে দিল।

মেয়েটি তাঁকে ডাকতেই প্রিয়নাথ ওর পিছু নিলেন।

মলিন আলোয় এবড়োখেবড়ো পথ ধরে শীত আর কুয়াশা ভেদ করে দুটি প্রাণী এগিয়ে চলল।

একটু এগোতেই রাস্তার আলো আর চোখে পড়ল না। ভাঙা চাঁদের ঘোলাটে আলোই একমাত্র ভরসা।

গোলোকধাঁধার মতো পথ ঘুরে-ঘুরে অবশেষে একটা বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল ওরা। আবছা আলো-আঁধারিতে বাড়িটাকে ভূতুড়ে অবয়ব বলে মনে হচ্ছিল।

যতটুকু বোঝা যায়, টিনের চাল দেওয়া মাটির বাড়ি। বাড়ি ঘিরে উঠোন। উঠোনে বেশ কয়েকটা কলা গাছ, পেঁপে গাছ আর সুপুরি গাছ। উঠোনের একপাশে ধুনির আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। কুয়াশার স্তর ভেদ করে আগুনটাকে ঝাপসা দেখাচ্ছে।

সামান্য বাতাস বইছিল। বাতাসে গাছের পাতা নড়ে সরসর শব্দ হচ্ছিল।

প্রিয়নাথের মনে হল, ঘুমিয়ে নিথর একটা গাঁয়ের শেষ প্রান্তের শেষ বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। বাড়িটার চারপাশে অনেকটা করে ফাঁকা জমি। আর আলো বলতে মাথার ওপরে চাঁদ, আর বাড়ির একটা জানলা দিয়ে ভেসে আসা লণ্ঠনের আলো।

প্রিয়নাথের শীত করছিল। মাফলারটা আরও ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিলেন।

'এই আমাদের ঘর, বাবুজি।' মেয়েটি আলতো গলায় বলল।

প্রিয়নাথের হঠাৎই মনে হল, ওদের বাড়িতে আশ্রয় নেবেন অথচ এখনও ঠিকমতো আলাপ করা হয়নি। মানে, মেয়েটির নামে জিগ্যেস করা হয়নি।

'তোমার নাম কী?' প্রিয়নাথ জানতে চাইলেন।

তাঁর দিকে ঘাড় তুলে তাকিয়ে মেয়েটি মিষ্টি হেসে বলল, 'নেহা— নেহাকুমারী—।'

প্রিয়নাথ ওই শীতার্ত আঁধারে দাঁড়িয়ে সুনীতনারায়ণের ভয়ঙ্কর চিৎকার শুনতে পেলেন। তাঁর পা ফেলার ছন্দে গরমিল হয়ে গেল। সুটকেসটাও হাত থেকে পড়ে যেতে চাইছিল। সময়মতো সর্তক না হলে সেটাকে সামাল দেওয়া যেত না।

কাঁচা উঠোন পেরিয়ে সামনের ঘরটায় ঢুকতেই উষ্ণতার ওম পেলেন প্রিয়নাথ। ঘরের হ্যারিকেনের আলোয় নেহাকে ভালো করে দেখলেন। এই মিষ্টি মেয়েটা কি সুনীতের ভয়ের কোনও হদিস দিতে পারবে!

ঘরে একটা ভাঙা চেয়ারে একজন বৃদ্ধ বসেছিলেন। চাদর মুড়ি দেওয়া শরীরে শুধু মাথার সাদা চুল, সাদা গোঁফ আর ছানি-পড়া ঘোলাটে চোখ নজর টানে।

নেহা পরিচয় করিয়ে দিল, বলল, ওর বাপুজি। তারপর দেহাতি ভাষায় ওর বাবাকে কী যেন বলল। উত্তরে বৃদ্ধ মানুষটি আলতো করে বারকয়েক ঘাড় নাড়লেন।

নেহা প্রিয়নাথকে বসিয়ে ছুটে ভেতরের ঘরে ঢুকে গেল। একটু পরেই একজন বৃদ্ধা ও একজন তরুণকে একরকম হাত ধরে টানতে-টানতে নিয়ে গেল। নেহার মা ও দাদা।

বৃদ্ধার মুখের চামড়ায় অকালে বড় বেশি ভাঁজ পড়েছে। তবে চোখ দুটোয় মায়ের মমতা মাখানো। নাকে রুপোর নোলক, কানে দুল। মাথায় চুলে পাক ধরতে শুরু করেছে।

নেহার দাদার রোগা কালো চেহারা। চোখ দুটো কেমন যেন শূন্য, দৃষ্টিহীন। কপালে লম্বা একটা কাটা দাগ। মাঝে-মাঝেই কেশে উঠছে—বোধহয় ঠান্ডা লেগেছে।

একটা অদ্ভুত গন্ধ প্রিয়নাথের নাকে আসছিল। অনেকটা বুনো ফুলের গন্ধের মতো।

আলাপের পালা শেষ হলে নেহা প্রিয়নাথের ভেতরদিকের একটা ছোট ঘরে নিয়ে গেল। বলল, 'এ-ঘরেই আপনি থাকবেন। আপনি হাত-মুখ ধুয়ে নিন, আমি চা বানিয়ে নিয়ে আসছি।'

নেহা হাত-পা নেড়ে কথা বলছিল। ওর ভাষা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও ওর অঙ্গভঙ্গি ভূতনাথকে বুঝতে সাহায্য করছিল। নেহার সঙ্গে আলাদা কথা বলার জন্য ভূতনাথের আর তর সইছিল না।

সুটকেস খুলে দরকারি জিনিসপত্র বের করে খাটিয়ার ওপরে চাদর মুড়ি দিয়ে বসলেন ভূতনাথ। নেহার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরেই নেহা চা নিয়ে এল। প্রিয়নাথের হাতে চায়ের গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে মেঝেতে চাটাই পেতে বসে পড়ল। বুনো ফুলের গন্ধটা আবার প্রিয়নাথের নাকে এল।

'বাবুজি এখানে কী কাজে এসেছেন?'

'এই একটু-আধটু ঘুরে বেড়াতে...ফটো তুলতে।' একটু থেমে আচমকা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন প্রিয়নাথ, 'আচ্ছা, মাস দেড়-দুই আগে কোনও ছোকরা বাবু তোমাদের বাড়িতে এসেছিল? বাবুর খুব ফটো তোলার শখ ছিল...।'

নেহা সরলভাবে জবাব দিল, 'হ্যাঁ, এসেছিল। বড় রাস্তায় এদিক-ওদিক ঘুরছিল, আমিই ডেকে নিয়ে এসেছি। আমাদের বাড়িতে দু-চারদিন ছিল। এখানে আনজান আদমিকে কেউ বাড়িতে থাকতে দেয় না। কিন্তু আমরা কোনও মেহমানকে কখনও ফেরাই না। মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে মেহমান আসে। আমি ডেকে নিয়ে আসি।'

'সেই ছেলেটির নাম কী ছিল? সুনীত?' প্রিয়নাথ বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাঢ় টান দিলেন।

'নাম তো জানি না, বাবুজি।' নেহা হাসল ফিক করে, বলল, আপনার নামও কি জানি?'

প্রিয়নাথ নিজের নাম বললেন। বললেন ফটো তোলার শখের কথা। তারপর শহরের টুকটাক গল্প শোনাতে লাগলেন। চা-সিগারেট শেষ হয়ে গেল।

হঠাৎ গল্পের মাঝে লাফিয়ে উঠে পড়ল নেহা। বলল, 'এখন যাই, বাবুজি। দেরি হয়ে গেছে।'

ফুটফুটে প্রাণবন্ত কিশোরীটির মুখের দিকে তাকালেন প্রিয়নাথ। কীসের দেরি হয়ে গেছে! প্রিয়নাথের কপালে ভাঁজ পড়ল।

নেহা প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে থালা আর বাটিতে নিয়ে এল রুটি ও সবজি। প্রিয়নাথের 'ডিনার'।

মেঝেতে থালা-বাটি সাজিয়ে কাঁসার গ্লাসে জল দিয়ে গেল নেহা। সঙ্গে একটা বাড়তি হ্যারিকেন। কিন্তু সেই আলোয় মলিন ঘরটা যেন আরও মলিন হয়ে উঠল। প্রিয়নাথের অন্তত তাই মনে হল।

নেহা যাওয়ার আগে বলে গেল, খাওয়া হয়ে গেলে বাসনগুলো দরজার বাইরে রেখে দিতে। আর বাবুজি যেন বাইরের উঠোনে গিয়ে হাত ধুয়ে নেন।

নেহা খুব ব্যস্তভাবে চলে গেল। বলল, 'এখন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন—আবার কাল দেখা হবে।'

ঘড়িতে এখনও আটটা বাজেনি, অথচ শীত, অন্ধকার, আর নির্জনতা ঘড়ির কাঁটা যেন তিন-চার ঘণ্টা এগিয়ে দিয়েছে।

খাওয়াদাওয়া সেরে হাতমুখ ধুয়ে বিছানায় এসে জুত করে বসলেন প্রিয়নাথ। একটা সিগারেট ধরালেন। হ্যারিকেন দুটো নিভু-নিভু করে দিয়েছেন। ফলে সিগারেটের আগুনটাই বেশ জোরালো মনে হচ্ছে।

আষ্টেপৃষ্ঠে কম্বল মুড়ি দিয়ে নানান কথা ভাবছিলেন। দু-মাস আগে এখানে এসে সুনীত ঠিক কী-কী করেছিল? প্রিয়নাথ কি এখন সেই ভূমিকায় হুবহু অভিনয় করে যাচ্ছেন? টিভিতে দেখা অ্যাকশন রিপ্লের মতো?

নেহাদের চাপা কথাবার্তা কানে আসছিল। ওরা কি এখনও শোয়নি? নেহা তা হলে অমন ব্যস্তভাবে চলে গেল কেন?

একটু পরে সিগারেট শেষ করে শুয়ে পড়লেন প্রিয়নাথ। ওঁর ক্লান্ত শরীর খুব তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ল।

ভোরবেলা বেশ বেলা করে ঘুম ভাঙল প্রিয়নাথের।

আড়মোড়া ভেঙে দিন শুরু করতে গিয়েই বেশ অবাক হয়ে গেলেন। নেহারা কেউ বাড়ি নেই!

ওরা চারজন এই সক্কালবেলায় গেল কোথায়!

গোটা বাড়িটাই চক্কর মেরে দেখলেন প্রিয়নাথ! কেউ কোথাও নেই! সবক'টা দরজাই হাট করে খোলা। অথচ আসবাবপত্র, রান্নার জায়গা ইত্যাদি দেখলে মনে হয় ওরা আবার যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে আসবে।

এককাপ চায়ের জন্য মনটা আনচান করছিল। তাই মোটামুটি তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়লেন প্রিয়নাথ। সঙ্গে নিলেন ক্যামেরা আর কম্পাস।

কুয়াশা কম থাকায় সূর্যের দাপট নেহাত মন্দ নয়। সামান্য ঘোলাটে দিনের আলোয় এলাকাটা আরও ভালো করে দেখলেন।

নেহাদের বাড়িটা বলতে গেলে একেবারে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে। চাষজমি আর পুকুর পেরিয়ে আরও যে-দু-চারটে মাটির বাড়ি চোখে পড়ে সেগুলোতে কেউ বাস করে বলে মনে হল না। আর দুরে তাকালে শুধু ধূ-ধূ মাঠ আর বড়-বড় গাছপালার দল। মনে হয় যেন নেহাদের বাড়িটাই লোকবসতির শেষ সীমানা।

প্রিয়নাথ আন্দাজে ভর করে এগোলেন। খানিক দূর গেলে হয়তো কাল রাতের ঘর-বাড়ি দোকানপাট চোখে পড়তে পারে।

পথে বেশ কয়েকটা ছবি তুললেন। পকেট থেকে কম্পাস বের করে মাঝে-মাঝেই উত্তরদিকটা দেখে নিচ্ছিলেন। হঠাৎই দেখলেন, বেশ দূরে মেঠো পথ ধরে তিনজন মানুষ হেঁটে যাচ্ছে।

প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি পা চালাতে শুরু করলেন। একটু পরেই ওদের ধরে ফেললেন। একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। তার মধ্যে একজনের বয়েস এত কম যে, অনায়াসে 'মেয়ে' বলা যায়। আর পুরুষটির হাতে একটা সুটকেস।

প্রিয়নাথ হাঁফাতে-হাঁফাতে পুরুষটিকে জিগ্যেস করলেন, 'কোনদিকে গেলে খাবার-দাবারের দোকানপাট পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

লোকটি প্রিয়নাথের পোশাক-আশাক চেহারা খুঁটিয়ে মেপে নিল। তারপর বলল, 'চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা টাঙা-স্ট্যান্ডের দিকে যাচ্ছি —পথে দোকানপাট পড়বে।'

মেঠো পথ ধরে হাঁটতে-হাঁটতে লোকটির সঙ্গে আলাপ করলেন প্রিয়নাথ।

ওর নাম মহাবীর সাউ। সঙ্গে ওর বউ অমলাদেবী, আর ছোট মেয়ে হিরাকুমারী। ও দ্বারভাঙ্গার সিধৌলি গাঁয়ে থাকে। সদরিয়ায় এসেছিল বউয়ের জড়িবুটি চিকিৎসার জন্য। এদিকে একজন ধন্বন্তরী সাধুবাবা বসেন, তাঁর কাছে। ফেরার পথে লহরিয়াসরাই-এ একটু কাজ সেরে ফিরবে—তাই তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়েছে।

মহাবীরের কাছ থেকে এদিকটার খুব একটা বিশদ খবর পাওয়া গেল না। তবে ও প্রিয়নাথকে একটা চায়ের দোকানে পৌঁছে দিল। প্রিয়নাথ ওদের তিনজনের ফটো তুললেন। ওরা হাসিমুখে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

প্রিয়নাথ চায়ের দোকানে ঢুকে এক গ্লাস চা নিয়ে বসলেন। ঠিক করলেন, আজ সারাটা দিন নেহাদের সম্পর্কে, সুনীতের ব্যাপারে খোঁজ নেবেন। এখানকার মানুষজন কথাবার্তায় এত সহজ সরল, অথচ অচেনা মুসাফিরকে কিছুতেই আশ্রয় দেয় না। কেন? সে কি ভয়ে? তা হলে সবাই যে-ভয় পায় নেহারা সেই ভয় পায় না কেন! বরং নেহার কথা অনুযায়ী 'আমরা কোনও মেহমানকে কখনও ফেরাই না। মাঝে-মাঝেই আমাদের বাড়িতে...।'

সারাটা বেলা নানা জায়গায় ঘুরে-ঘুরে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছবি তুলে কাটালেন প্রিয়নাথ। কিন্তু তাঁর অনুসন্ধান এতটুকুও এগোল না। নেহাদের কেউ চিনতেই পারল না। ওদের বাড়িটা কোন দিকে সেটা আন্দাজ করে বলা সত্ত্বেও কোনও লাভ হল না। সবাই ঠোঁট উলটে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল, আর প্রিয়নাথকে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

সুতরাং, একরকম ব্যর্থ হয়েই, বেলা দেড়টা নাগাদ নেহাদের বাড়িতে ফিরলেন প্রিয়নাথ। তবে ফেরার কাজটা মোটেও সহজ হয়নি। বহু লোককে জিগ্যেস করে নানান গাছ আর বাড়ির নিশানা দেখে অবশেষে ফিরতে পেরেছেন।

কিন্তু আশ্চর্য। নেহাদের বাড়িটা সেই সকালের মতোই একা-একা দাঁড়িয়ে আছে। ওরা এখনও বাড়ি ফেরেনি।

খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা প্রিয়নাথ পথেই সেরে এসেছিলেন। এখন কোনওমতে স্নান সেরে নিয়ে নিজের ঘরে আস্তানা গড়লেন। নোটবই বের করে তাতে আধঘণ্টা ধরে নানারকম মন্তব্য লিখলেন।

প্রিয়নাথ যখনই কোনও অভিযানে বেরোন তখনই সঙ্গে নেন তাঁর বিশেষ সরঞ্জামের থলে। এবারও সেটা সঙ্গে এনেছেন। তাতে আছে ক্যামেরা, টর্চ, প্রচুর ব্যাটারি, মোমবাতি, মার্কার, থার্মোমিটার, কম্পাস আর পেন্ডুলাম।

হঠাৎ কী মনে হওয়াতে সুটকেস খুলে থলে থেকে পেন্ডুলামটা বের করে নিলেন। সুতো ধরে ঝুলিয়ে ওটাকে দোলাতে লাগলেন। দুলুনিটা সামান্য এলোমেলো হচ্ছে বলে প্রিয়নাথের মনে হল। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়ল। ঠান্ডা বাতাসে গায়ে কাঁটা দিল।

প্রিয়নাথ পেন্ডুলামটা রেখে দিলেন। দরজা বন্ধ করে কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন খাটিয়ায়। মনে-মনে ঠিক করলেন, এখানে দু-একদিনের বেশি তিনি আর থাকবেন না। সুনীতের ভয় পাওয়ার রহস্যের কাছে হয়তো

শেষ পর্যন্ত তাঁকে হার মানতে হবে।

সন্ধের আঁধার নেমে আসতেই প্রিয়নাথ হ্যারিকেন জ্বেলে নিয়েছেন। মনে-মনে ভেবেছেন, নেহারা যদি নিতান্তই আর না ফেরে তা হলে ওদের রান্নার জায়গা হাতড়ে যা পাবেন তাই দুটো মুখে গুঁজে দিয়ে কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে দেবেন। তারপর ভোর হলেই মহাবীরের চিনিয়ে দেওয়া পথ ধরে সোজা চম্পট।

কিন্তু তার আর দরকার হল না।

সন্ধে সাড়ে ছ'টা নাগাদ নেহাদের কথাবার্তার আওয়াজ শুনতে পেলেন প্রিয়নাথ।

বেশ অবাক হয়ে ঘর থেকে বেরোতে যাবেন, তার আগেই চঞ্চল পায়ে নেহা ঘরে এসে ঢুকল।

'বাবুজি, ভালো আছেন?' ওর মুখে সেই একই নিষ্পাপ হাসি।

'তোমরা হুট করে কোথায় চলে গিয়েছিলে!'

মাথা নীচু করল নেহা। তারপর অপরাধীর চোখে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবুজি, রাগ করবেন না। রোজ আমাদের ওরকম চলে যেতে হয়। রাত পেরোনোর আগেই আমরা চলে যাই...আবার অন্ধেরা নেমে এলে ফিরে আসি।'

'কোথায় যাও? কী দরকার সেখানে, যে রোজ যেতে হয়!' প্রিয়নাথ একটু যেন বিরক্তই হলেন।

'আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি। এসে সব বলছি—।' বেণী দুলিয়ে নেহা চলে গেল।

মিনিটপাঁচেক পরেই নেহা ফিরে এল। হাতে গরম চায়ের গ্লাস।

প্রিয়নাথের হাতে গ্লাসটা দিয়ে কাল রাতের মতোই মেঝেতে বসে পড়ল। তারপর খানিকটা যেন বিষণ্ণ গলায় বলল, 'রোজ আমাদের যেতে হয়, বাবুজি। কেন যেতে হয় সেটা...আপনি আজ আমাদের সঙ্গে যাবেন?'

নেহার প্রস্তাবটা এত আচমকা এল যে, প্রিয়নাথ সঙ্গে-সঙ্গে কোনও জবাব দিতে পারলেন না।

নেহা আপনমনে বিড়বিড় করে বলে চলল, 'আমাদের বাড়িতে যেসব মেহমান আসে তাদের আমরা সঙ্গে নিয়ে যাই। আমরা...ওখানে গেলে আপনি ফোটো খিঁচতে পারবেন।' শেষ কথাটা নেহা বেশ উৎফুল্ল ঢঙে বলল। উৎসাহ নিয়ে তাকাল ভূতনাথের দিকে।

প্রিয়নাথের মধ্যে কেমন একটা মরিয়া ভাব জেগে উঠেছিল। তিনি ঠান্ডা গলায় বললেন, 'সুনীতবাবু তোমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন...ছবি তুলতে...?'

'হ্যাঁ, গিয়েছিলেন।' ঘাড় নেড়ে বলল নেহা। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে শুধরে নিয়ে বলল, 'ওই বাবুর নাম তো জানি না—।'

'আমি আজ তোমাদের সঙ্গে যাব।'

চাটাই ছেড়ে উঠে পড়ল নেহা। খুশির গলায় বলল, 'যাই, মা আর পিতাজিকে বলে আসি। রাতে আপনার খাওয়া হলেই আমরা বেরিয়ে পড়ব।'

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে গাঢ় আঁধার ও শীতের মধ্যে প্রিয়নাথ যখন ওদের সঙ্গে বেরোলেন তখন রাত সাড়ে ন'টা।

শীতের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে প্রিয়নাথের চেহারা মাপে প্রায় সুমো যোদ্ধাদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছে। সঙ্গের ঝোলা ব্যাগে ক্যামেরা ছাড়াও নিয়েছেন টর্চ, টর্চের ব্যাটারি, কম্পাস, থার্মোমিটার, আর পেন্ডুলাম।

অন্ধকারে কুয়াশা ভেদ করে আরও অন্ধকার পাঁচটা ছায়া এগোচ্ছিল। সকলের আগে প্রিয়নাথ আর নেহা। পিছনে বাকি তিনজন। কারও মুখে কোনও কথা নেই। যেন শবানুগমনে চলেছে সবাই।

প্রিয়নাথ হঠাৎই হোঁচট খেলেন। নিজেকে সামলে নিয়ে টর্চ জ্বাললেন। নেহা সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আলো নিভিয়ে দিন, বাবুজি। আমি আপনার হাত ধরছি।'

অন্ধকারে প্রিয়নাথের হাত ধরল নেহা।

স্পর্শে সম্মোহন করা যায় কি না প্রিয়নাথ জানেন না। আর প্রিয়নাথের যেরকম মন এবং বয়েস তাতে কিশোরী নেহাকে নিয়ে কোনওরকম অন্যায় কল্পনা তাঁর কাছে নেহাতই হাস্যকর। কিন্তু তবুও কোন এক রহস্যময় কারণে নেহার হাত ছুঁতেই প্রিয়নাথ কেমন এক অলৌকিক ভরসা পেলেন।

আকাশ মেঘলা, চাঁদ দেখা যাচ্ছে না। প্রিয়নাথদের ঘিরে রেখেছে গাঢ় কুয়াশার স্তর। বেশি দূর নজর চলে না। ঠান্ডা বাতাস যেন বাতাস নয়—বরফ। প্রিয়নাথ জ্যাকেটের ওপরে শাল জড়িয়েছেন। সেটাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছেন শরীরে। আড়ষ্টভাবে সাবধানে পা ফেলছেন। অথচ নেহার চলা কত সহজ-স্বাভাবিক! এ পথ নিশ্চয়ই ওর অনেক চেনা।

বেশ কিছুক্ষণ পথ হাঁটার পর প্রিয়নাথের সময়, দিক, সবই গুলিয়ে গেল। অকারণেই একটা ভয় তাঁর মনের ভেতরে ঢুকে পড়তে চাইল। তিনি লড়াই করে সেটাকে চৌকাঠের বাইরে আটকে রাখলেন।

সেইরকম একটা মনের অবস্থাতেই তিনি চাপা গলায় নেহাকে জিগ্যেস করলেন, 'নেহা, আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'একটু পরেই দেখতে পাবেন—' নেহা এত অস্পষ্ট গলায় কথাটা বলল যে, বেশ চেষ্টা করে ওর কথা শুনতে পেলেন প্রিয়নাথ।

মিনিটখানেক চুপ করে থাকার পর নেহা আবার কথা বলল।

'যেখান দিয়ে আমরা হেঁটে যাচ্ছি, বাবুজি, বহত দিন পহেলে এখানে একটা গ্রাম ছিল। সে-গাঁয়ের নাম ছিল তিনকাহানি। তিনকাহানির শেষে ছিল বড়-বড় মাঠ, খেত। তারপরে সদরিয়া। তিনকাহানি আর সদরিয়ার বর্ডারে আমরা থাকতাম...।'

থাকতাম! তার মানে!

'নেহা!' প্রিয়নাথ ডেকে উঠলেন। নেহার হাতটা হঠাৎই শীতের চেয়েও ঠান্ডা মনে হল।

'ভয় পাবেন না, বাবুজি।' বলেই নেহা প্রিয়নাথের হাতটা ছেড়ে দিল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই ওর ছায়া-শরীরটা কুয়াশায় মিলিয়ে গেল।

'নেহা!' প্রিয়নাথ ডেকে উঠলেন আবার। পিছন ফিরে তাকালেন।

যে-তিনজন এতক্ষণ ধরে নিঃশব্দে ওঁদের অনুসরণ করছিল তারা কেউ নেই। সেখানে শুধুই কুয়াশা।

প্রিয়নাথ টর্চ জ্বাললেন। সেই আলোয় কম্পাসটা বের করে দেখলেন। উত্তরমুখী কাঁটা দক্ষিণদিকে মুখ করে স্থির হয়ে আছে!

'আলোটা নিভিয়ে দিন, বাবুজি।'

নেহার গলা!

হতবুদ্ধি প্রিয়নাথ টর্চ নিভিয়ে দিলেন। কিন্তু চারপাশে কাউকে দেখতে পেলেন না।

টর্চ আর কম্পাস ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখতেই নেহা আবার কথা বলল।

'দাঁড়াবেন না, বাবুজি, চলুন—আমি আপনার পাশে-পাশেই আছি।'

'তোমার পিতাজি-মাজি ওঁরা কোথায় গেলেন?'

অন্ধকার ভেদ করে নেহার গলা ভেসে এল : 'ওঁরা এগিয়ে গেছেন। একটু পরে আমরাও সেখানে পৌঁছে যাব।'

আন্দাজে ভর করে পা ফেলতে লাগলেন প্রিয়নাথ। তিনি পোড়খাওয়া মানুষ। তা সত্ত্বেও কিন্তু বেশ নাড়া খেয়ে গেছেন। সুনীতনারায়ণের বয়েস অনেক কম। ওর অবস্থাটা কী হয়েছিল তিনি সেটা মনে-মনে আঁচ করার চেষ্টা করলেন।

হঠাৎই শীতটা যেন বেড়ে গেল। সামনেই দেখা গেল একটা বিশাল পুকুর। এই গাঢ় আঁধারেও জলের কোথাও কোথাও প্রতিফলন চোখে পড়ছে। বাকি অংশটা এক অদ্ভুত কুয়াশায় ঢাকা।

পুকুরটা পেরোতেই কুয়াশা যেন ফিকে হয়ে এল। কয়েকটা ছোট-বড় গাছ চোখে পড়ল প্রিয়নাথের। গাছগুলো এপাশ-ওপাশ দুলছে। অথচ বাতাস তেমন জোরে বইছে না। আর তখনই গাছের ওপরে গাঢ় আকাশে একটা নীল আভা দেখতে পেলেন প্রিয়নাথ। অনেকটা মা-কালীর গায়ের গাঢ়-নীল রঙের মতো।

'নেহা—!' ডেকে উঠলেন প্রিয়নাথ।

'আমি আপনার পাশেই আছি, বাবুজি।' কেমন যেন ব্যথা-পাওয়া গলায় নেহা বলল। মনে হল, ওর ভেতরে একটা কষ্ট হচ্ছে।

এমন সময় একটা গুনগুন শব্দ শোনা গেল। যেন অনেকে মিলে চাপা গলায় সুর করে গান গাইছে।

খুব নীচু পরদায় শুরু হয়ে সেই সমবেত 'গান' উঁচু পরদায় উঠতে শুরু করল। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও প্রিয়নাথ সেই অদ্ভুত ভাষার অর্থ বুঝতে পারলেন না। তবে সেই কোরাস ক্রমশ আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলছিল।

হঠাৎই সামনে তাকিয়ে হকচকিয়ে গেলেন প্রিয়নাথ।

দূরের মাঝারি গাছের মাঝে কোথা থেকে এসে যেন হাজির হয়েছে প্রকাণ্ড এক মহীরুহ। তার ঝাঁকড়া মাথা থেকে ঝুরি নেমে এসেছে নীচের দিকে। কেমন অদ্ভুতভাবে হেলে গাছটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর গাছের অন্ধকার শরীরে জোনাকির মতো জ্বলছে অসংখ্য লাল আলোর বিন্দু।

ব্যাগ থেকে ক্যামেরা বের করলেন প্রিয়নাথ। অদ্ভুত গাছটা তাক করে শাটার টিপলেন। আর তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গেল সুনীতের তোলা ফটোগ্রাফটার কথা। এই সেই ফটোর রহস্য! কিন্তু এই গাছ দেখে ভয় পাওয়ার কী আছে!

ক্যামেরা ব্যাগে রাখতেই অদৃশ্য নেহার গলা শোনা গেল। 'ছবি দেখে সবকুছ মালুম হবে না, বাবুজি। আরও নজদিক চলুন—।'

সম্মোহিতের মতো এগোতে লাগলেন প্রিয়নাথ। হঠাৎই একটা বাতাসের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে গেলেন যেন। বরফের মতো বাতাস তাঁকে ঘিরে মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল। প্রিয়নাথের হাত-পা ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় যেন বুঝতে পারলেন, এখানে কম্পাস বা পেন্ডুলাম বের করে কোনও লাভ নেই। তিনি এক অন্য জগতে অন্য ঠিকানায় পা রেখেছেন।

কোরাস গান এখনও বেশ জোরালো ঢঙে শোনা যাচ্ছিল। উঠছে, নামছে। যেন কয়েকশো মানুষ প্রাণপণে গলা মিলিয়ে সুর ধরেছে। সঙ্গে কোনও যন্ত্র-অনুষঙ্গ নেই।

হঠাৎই আকাশের নীল আভাটা নেমে এল সেই অলৌকিক গাছের গায়ে। আর তখনই প্রিয়নাথ—এতক্ষণ যা দেখতে পাননি তাই দেখতে পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রিয়নাথের হাত-পা অবশ হয়ে এল। ভয়ঙ্কর শীতেও কুলকুল করে ঘেমে গেলেন। ভয়ে চিৎকার করার জন্য হাঁ করলেন, কিন্তু কোনও শব্দ বেরোল না।

অসংখ্য মানুষ জড়াজড়ি করে গাছটা তৈরি করেছে। গাছের ডালপালা নিছকই ওদের হাত-পা। নেমে আসা ঝুরি ওদের হাত, হাতের বাঁকানো আঙুল, মহিলাদের লম্বা ঝুলে পড়া চুল। উল দিয়ে বোনা সোয়েটারের মতো ওরা নিজেদের শরীর দিয়ে বুনে ফেলেছে এই প্রকাণ্ড গাছ। ওদের সমবেত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে-সঙ্গে গাছটা ফুলে উঠছে, চুপসে যাচ্ছে। আর হাপরের মতো ফোঁস-ফোঁস শব্দে নিঃশ্বাসের ঝড় উঠছে। সেই ঝড়ে প্রিয়নাথের চাদর উড়ছে, চুল উড়ছে।

মানুষগুলোর চোখের কোটরে ভয়ঙ্কর তীব্র এক লাল আলো জ্বলছে—যেন জ্বলন্ত কয়লার টুকরো। এই চোখগুলোকেই দূর থেকে লাল আলোর বিন্দু বলে মনে হচ্ছিল। সুনীতের তোলা ফটোয় যেমন উঠেছে।

প্রিয়নাথ কখনও ভয়ের এত কাছাকাছি আসেননি। তাঁর শরীরের ভেতরটা কেমন করছিল। মাথা টলে যেতে চাইছিল বারবার।

কোরাস আর শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কেমন যেন নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে গাঢ় নীল আলোর আভা, আর তার মাঝে উজ্জ্বল লাল বিন্দুর ঝাঁক যেন অলৌকিক এক সম্মোহন।

বহুদূর থেকে ভেসে এল নেহার গলা : 'গাঁয়ে মড়ক লেগেছিল, বাবুজি। তাতে তিনকাহানির সবাই খতম হয়ে গেল। সব কাহানি খতম হয়ে গেল। সে বহত সাল পহেলে কি বাত। তারপর থেকে আমরা...ওই গাছেই একজোট হয়ে থাকি। রোজ রাতে এসে এই গাছটা আমরা তৈরি করি। দিনের বেলা আমাদের কেউ দেখতে পায় না। আর, রাতে আমরা ইচ্ছেমতন কাউকে দেখা দিই, কাউকে দিই না। মেহমানদের সেবা করতে আমরা ভালোবাসি। তাই পরদেশিবাবুদের মদত করি, দেখা দিই। আমরা যে রাতে এখানে এসে এমন করে থাকি সে কথা কাউকে বোলো না, বাবুজি। কিসিকো নহি বাতানা...।'

সমবেত কণ্ঠস্বর নেহার কথায় সুর মিলিয়ে ফিসফিসে গলায় বলে উঠল, 'কিসিকো নহি বাতানা...কিসিকো নহি বাতানা...।'

সে-কথায় অলৌকিক শব্দের ঝড় বয়ে গেল যেন।

'আমি এবার ওখানে যাই, বাবুজি? আমার মাজি, পিতাজি, বড়ে ভাইয়া, সবাই ওখানে ডালপালা হয়ে আছে। আমি যাই? ফির কভি মিলেঙ্গে...।'

ফিসফিসে কোরাস আকাশ-বাতাস মাতিয়ে বলে উঠল, 'ফির কভি মিলেঙ্গে...ফির কভি মিলেঙ্গে...।'

প্রিয়নাথ আতঙ্কের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। তাঁর দমবন্ধ হয়ে যেতে চাইছিল, কোনও ইন্দ্রিয়ই যেন আর কাজ করছিল না। সেই অবস্থায় তিনি যে কেমন করে ছুটতে শুরু করলেন কে জানে!

দিগভ্রান্ত অবস্থায় পাগলের মতো ছুটছিলেন। কখনও হোঁচট খেয়ে পড়ছিলেন। কখনও ধাক্কা খাচ্ছিলেন গাছের গুঁড়িতে। চশমা ছিটকে পড়ল কোথায়। হাতঘড়িটাও বোধহয় ভেঙে গেল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছিলেন সদরিয়ায়।

সমস্তিপুর থেকে ট্রেনে কলকাতা ফেরার সময় প্রিয়নাথ ভাবছিলেন, এবার সুনীতনারায়ণকে সারিয়ে তোলার কাজটা অনেক সহজ হবে।





# মনের মতো বউ

'পাওয়া ভারী দুষ্কর।' পান চিবোতে-চিবোতে মন্তব্য করলেন বরেন মল্লিক।

'কেন, মনের মতো বউ পাওয়া দুষ্কর কেন?' চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে জানতে চাইলেন প্রিয়নাথ।

সুপ্রকাশ পালিতের বৈঠকখানায় বসে কথা হচ্ছিল। সময়টা চৈত্র মাস। সামনের বৈশাখে বরেন মল্লিক তাঁর বড় ছেলের বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছেন। তাই রোজই আনন্দবাজারের পাত্র-পাত্রীর বিজ্ঞাপনের পাতায় হুমড়ি খেয়ে পাত্রী খুঁজছেন। আর চেনা-জানা লোকজনকেও একটি 'ফরসা, সুন্দরী, গ্র্যাজুয়েট, গৃহকর্মে নিপুণা, বছর তেইশ-চব্বিশের সম্পন্ন ঘরের' সুপাত্রী খোঁজ করার জন্য বলেছেন।

বরেন মল্লিক আড়মোড়া ভেঙে হাতের পিঠ দিয়ে গলার ঘাম মুছে বললেন, 'এই তো একমাস ধরে হন্যে হয়ে খুঁজছি। মনের মতো বউ পেলাম কই!'

বৃদ্ধ জগৎ শ্রীমানী খিকখিক করে হেসে উঠলেন, বললেন, 'বাবা বরেন, তুমি বউ খুঁজছ, না বউমা খুঁজছ?'

এ-কথায় গম্ভীর প্রকৃতির সুপ্রকাশ পালিতও হেসে ফেললেন : 'না, না, জগৎবাবু, বরেনবাবু বউমা খুঁজছেন—বউ নয়। তাই তো, বরেনবাবু?'

প্রশ্নটার ভেতরে একটা চাপা ঠাট্টা ছিল। বরেন মল্লিক সেটা সহজেই টের পেলেন। খানিকটা উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে জবাব দিলেন, 'আমি রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটে থাকি, রাজা নবকেষ্ট নই। দুটো বউ খোঁজার আমার মুরোদ কোথায়! আমি বলছি, ইন জেনারেল, মনের মতো বউ খুঁজে পাওয়া খুব দুষ্কর। সে নিজের বউই হোক, বা ছেলের বউই হোক।'

ভূতনাথ বললেন, 'আপনার যা চাহিদা তাতে হয়তো সুপাত্রী খুঁজে পেতে আপনাকে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। তবে এটা জেনে রাখুন, কেউই নিখুঁত নয়। সংসার করার সময় খুঁতগুলোকে মানিয়ে নিতে হয়।'

'আপনি নিজে সংসারী না হয়েও সংসারের অনেক সিক্রেট খবর রাখেন দেখছি!'

ভূতনাথ খোঁচাটা গায়ে না-মেখে বললেন, 'একটা কথা আপনাকে জানিয়ে দিই, মল্লিকমশাই। মনে-মনে কারও যদি নিখুঁত মনের মতো বউয়ের চাহিদা থাকে, তা হলে তার কপালে অনেক দুঃখ আছে।'

'কেন, হঠাৎ এ-কথা বলছেন কেন?' সুপ্রকাশ পালিতের চোখে কৌতূহল ফুটে উঠল।

চায়ের পালা শেষ করে একটা সিগারেট ধরালেন প্রিয়নাথ। একটু সময় নিয়ে ধীরে-ধীরে বললেন, 'আপনাদের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে কথা হচ্ছিল...শুভ ব্যাপার। আর আমি যা বলব সেটা ঠিক শুভ নয়। এমনিতেই তো আমার বদনাম আছে, যে-কোনও আলোচনাতেই আমি ভূত-প্রেত-অলৌকিক এসব ব্যাপার টেনে আনি। আসলে আমি যা নিয়ে পড়াশোনা করেছি সেই সিলেবাসে শুধু এগুলোই ছিল। আর যে-ঘটনার কথা বলব বলে ভাবছি তার মধ্যেও আপনাদের অপছন্দের ওইসব ব্যাপার রয়েছে...।'

ভূতনাথের কথায় সবাই কেমন চুপচাপ হয়ে গেলেন। মাথার ওপরে কাঠের ব্লেডওয়ালা একটা সিলিং পাখা যথাসাধ্য জোরে ঘুরছিল। শুধু তারই ক্যাঁচকোঁচ শব্দ শোনা যেতে লাগল।

প্রিয়নাথের সিগারেটের ধোঁয়া পাখার বাতাসের ঘূর্ণিপাকে এলোমেলো ছুট লাগিয়ে মিলিয়ে গেল।

জগৎ শ্রীমানী শব্দ করে শ্বাস টানলেন। বরেন মল্লিক পান চিবোনো আপাতত বন্ধ করলেন। আর সুপ্রকাশ পালিত অপেক্ষা করছিলেন। ভূতনাথের কাহিনি তাঁর কাছে মদের নেশার মতো।

বরেন মল্লিক ইতস্তত করে জানতে চাইলেন, 'ব্যাপারটা কি বউ নিয়ে?'

'বউ নিয়ে নয়—মনের মতো বউ নিয়ে।' আবার সিগারেটে টান দিলেন প্রিয়নাথ।

জগৎ শ্রীমানীর মুখ থেকে মজা মিলিয়ে গিয়েছিল। বেশ সিরিয়াস গলায় তিনি বললেন, 'ব্যাপারটা কি আমরা শুনতে পারি? বরেন, তোমার নিশ্চয়ই গল্প শোনার ব্যাপারে কোন ছুচিবাই নেই?'

অন্য সবাই যখন চাইছেন তখন অ-রাজি হওয়ার কোনও মানে হয় না। মুখে অনেকটা এইরকম ভাব ফুটিয়ে বরেন মল্লিক বললেন, 'না, না, আপত্তির কী আছে!'

প্রিয়নাথ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। তারপর চোখের চশমাটা সামান্য ঠিক করে, ছোট্ট করে কাশলেন। এবং বলতে শুরু করলেন।

'ভদ্রলোকের নাম, ধরা যাক, বিধানপতিবাবু। পদবি নিয়ে আর মাথা ঘামাচ্ছি না। ওঁর সঙ্গে যখন আমার দেখা হয় তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার আমার নজরে পড়ে। ওঁর চোখের পাতা দুটো একসঙ্গে ওঠা-নামা করে না। নিজের খুশিমতো চোখের পাতা দুটো পড়ে। অর্থাৎ, আমাদের চোখের পাতাজোড়া যেমন সবসময় একসঙ্গে একই ছন্দে পড়ে, ওঁরটা একেবারেই তেমন নয়। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সিনক্রোনাস—আর, ওঁর বেলায় অ্যাসিনক্রোনাস। ওঁর জীবনে একটা বাজে দুর্ঘটনা ঘটেছিল। তারপর থেকেই ওঁর চোখের ব্যাপারটা ওরকম হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম ডাক্তার-টাক্তার দেখিয়ে চেষ্টাচরিত্র করেছেন। পরে শরীরের এই খুঁতটুকু মেনে নিয়েছেন।' একটু থেমে ভূতনাথ বললেন, 'অবশ্য...মানতে ওঁর বেশ কষ্ট হয়েছে। কারণ, বিধানপতিবাবু এমনিতে আগাপাস্তালা নিখুঁত মানুষ। অন্তত উনি তাই মনে করতেন। উনিও মনের মতো বউ চেয়েছিলেন...।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রিয়নাথ জোয়ারদার।

বিধানপতিবাবু চায়ের কাপে চুমুক দিয়েই মুখটা বিকৃত করে ফেললেন। বিরক্তির একটা শব্দ করে বিচ্ছিরিভাবে চেঁচিয়ে বললেন, 'চায়ে কেউ এত চিনি দেয়! চিনি তো বাজে খরচ হলই, চা-টাও মুখে দেওয়া গেল না। এরপর আবার ডায়াবেটিস হলে খরচের ফর্দ আরও লম্বা হবে। এত বছর ধরে চা করছ, চিনির আন্দাজটাও ঠিক করতে পারোনি!'

কথাগুলো এতটা চেঁচিয়ে না বললেও চলত। কারণ, বিধানবাবুর স্ত্রী শ্রীরাধা ডাইনিং স্পেসের লাগোয়া রান্নাঘরে তখন রান্না চাপিয়েছেন।

শ্রীরাধা কোনও জবাব দিলেন না। গত সাত বছরের অভিজ্ঞতায় শ্রীরাধা জেনে গেছেন স্বামীর এই ধরনের অভিযোগের সাফাই দিতে গেলে ওঁর বিরক্তি বেড়ে যায়—ব্যাপারটা আরও খারাপ দিকে গড়ায়। তাই ছোট্ট করে জবাব দিলেন—'অখেয়ালে ভুল হয়ে গেছে।'

বিধানবাবু আরও কিছুক্ষণ চাপা গলায় গজর-গজর করলেন। মনে হল, ব্যাপারটা আরও খানিক গড়ালে তিনি তৃপ্তি পেতেন।

চা খেতে খেতে টিভি দেখছিলেন বিধানপতি। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। টিভির দিকে চোখ রেখেই হাত বাড়ালেন কর্ডলেস ফোনের কালো হাতলটার দিকে।

এবং সঙ্গে-সঙ্গেই থমকে গেলেন।

'এ কী! টেলিফোনের কভারটা এরকম উলটোপালটা করে কে রাখল!'

শ্রীরাধা রান্না ছেড়ে ব্যস্ত পায়ে চলে এলেন ডাইনিং স্পেসে : 'কেন, কী হয়েছে?'

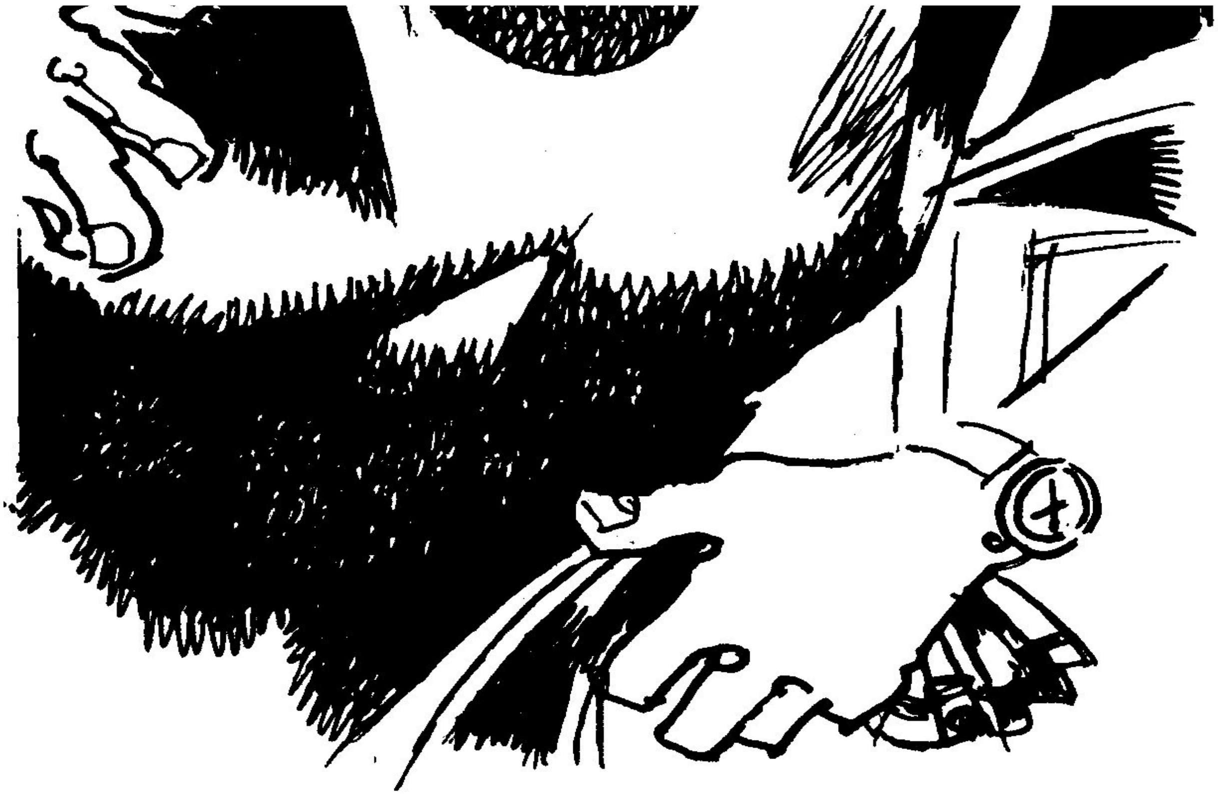
'কী আবার হবে!' ঝাঁঝিয়ে উঠলেন বিধানপতি, 'কভারটা কীভাবে রাখা আছে দেখেছ?'

ফোন তখনও একনাগাড়ে বেজে চলেছে।

শ্রীরাধা নরম গলায় বললেন, 'এখুনি ওটা ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি আগে ফোনটা ধরো...।'

বিধানবাবু ফোন তুলে 'হ্যালো' বললেন। ওঁর অফিসের বন্ধু সুজন ফোন করেছে। তিনি টেলিফোনে হেসে-হেসে কথা বলতে লাগলেন। অসুবিধে হওয়াতে টিভির রিমোটটা ডাইনিং টেবিল থেকে তুলে নিয়ে টিভির ভলিউম কমিয়ে দিলেন। তারপর কর্ডলেস ফোনের হাতল নিয়ে চেয়ারে এসে বসলেন। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে টেলিফোনে কথা চালিয়ে গেলেন।





শ্রীরাধা রান্নাঘরে ঢুকে পড়েছিলেন আবার। রান্না করতে-করতে নিজের কপালের কথা ভাবছিলেন।

শ্রীরাধার স্বামীকে দেখে অনেকেই ওঁকে হিংসে করে। কারণ, বিধানপতির চেহারা সত্যিই পুরুষের মতো। টকটকে ফরসা গায়ের রং, সুঠাম স্বাস্থ্য, সুন্দর নাক-মুখ-চোখ। বয়েস বিয়াল্লিশ হলেও দেখে মনে হয় পঁয়তিরিশ ছোঁননি।

বিধানবাবু কোনও কাজের ভার নিলে সেটা নিখুঁতভাবে শেষ করেন। কথা দিয়ে কথা রাখতে ভালোবাসেন। সময় ও নিয়ম মেনে চলাফেরা করা ওঁর আদর্শ।

বিয়ের সময় বিধানপতির সবকিছুই ভালো লেগেছিল শ্রীরাধার। কিন্তু তারপর ধীরে-ধীরে জানতে পেরেছেন ওঁর চব্বিশ ঘণ্টা অভিযোগের স্বভাব, আর খুঁটিয়ে জরিপ করে দেখতে পেয়েছেন ওঁর ফরসা কপালে তিনটে বিরক্তির ভাঁজ।

এমনিতে দোষটা হয়তো খুব মারাত্মক নয়, কিন্তু শ্রীরাধা যেন মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে ওঠেন। ওঁর দম বন্ধ হয়ে আসে। শরীরটা হাঁসফাঁস করতে থাকে।

ইদানীং শ্রীরাধার ব্লাড প্রেসারও খুব মাথাচাড়া দিয়েছে। প্রথমবার স্বামীকে যখন হাই প্রেসারের ব্যাপারটা আঁচ করার কথা বলেন, তখন যথেষ্ট যত্ন করে তাঁর মেডিকেল চেক-আপের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন বিধানপতি। তবে পথে যেতে যেতে ওঁকে আলতো গলায় বলেছেন, 'তোমাদের ফ্যামিলিতে নিশ্চয়ই হাই প্রেসারের ধাত আছে। তোমারটাও হয়তো বিয়ের আগে থেকেই ছিল।'

মাথায় আগুন জ্বলে গিয়েছিল, কিন্তু শ্রীরাধা কোনও জবাব দেননি। রাস্তার মাঝে বিশ্রী তর্কে ঢুকে পড়তে ওঁর মন চাইছিল না।

এরকম ছোট-ছোট ঘটনার চাপে শ্রীরাধা দিনকে-দিন যেন কাহিল হয়ে পড়েছেন। মাথাটা সবসময় কেমন পাগল-পাগল লাগে।

এই তো, একটু আগেই যে-মানুষটা চায়ের চিনি আর টেলিফোনের কভার নিয়ে অমন বিচ্ছিরিভাবে অভিযোগ করল এখন সেই মানুষটাই টেলিফোনে দিব্যি হেসে-হেসে কথা বলছে!

মানসিক চাপে অবসন্ন হয়ে কখনও কখনও আত্মহত্যার কথাও ভেবেছেন শ্রীরাধা। কিন্তু তখনই ওঁর মায়ের মুখটা ভেসে উঠেছে চোখের সামনে, তার পাশে অসহায় ছোট বোনের মুখ। শ্রীরাধা আর এগোতে পারেননি।

একদিন রাতে তর্ক অনেকটা এগিয়েছিল। কারণ শ্রীরাধা ওঁর মা-হতে না-পারা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। এই একটা ব্যাপারে বিধানপতি কখনও কোনও অভিযোগ করেননি। শ্রীরাধার ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য জেদও ধরেননি। কারণ, তিনি বোধহয় ভেতরে-ভেতরে জানতেন গোলমালটা কোথায় হতে পারে। তাই তীব্র কোণঠাসা হয়ে পড়লে শ্রীরাধা কখনও-কখনও এই অস্বস্তিকর প্রসঙ্গ তুলে বিধানপতিকে খোঁটা দিতে চাইতেন।

এইরকম টালমাটাল দিনযাপনের মাঝে একদিন দেওয়ালে মাথা ঠুকে কাঁদতে-কাঁদতে শ্রীরাধা বলেছেন, 'তোমার এই নিত্য অভিযোগের ঠেলায় কোনদিন অফিস থেকে ফিরে দেখবে আমি গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আছি।'

উত্তরে বিধানপতি ঠান্ডা গলায় বলেছেন, 'আলমারির ওপরে রাখা আমার ওই নাইলনের দড়ির বান্ডিলে যেন হাত দিয়ো না! আর সিলিং ফ্যানের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলে পোড়ো না—পাখার ব্লেড ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে। তারপর তো আবার থানা-পুলিশের ঝঞ্ঝাটে দু-চারদিন অফিস কামাই হয়ে যাবে।'

স্বামীর এই নির্লিপ্ত উত্তরে শ্রীরাধা খুব ধাক্কা খেয়েছিলেন। তর্ক থামিয়ে একেবারে চুপ করে গিয়েছিলেন।

বিধানপতির অভিযোগের স্রোত অবিরাম চলতে থাকল। সোয়েটারটা তিনদিন ধরে কাচা হচ্ছে না কেন? জুতোর কালি জায়গা মতো নেই কেন? বাথরুমের কল ঠিকমতো বন্ধ করা হয়নি কেন? সরষের তেল তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল কেন? ইস্তিরির তারটা ঠিকমতো গুছিয়ে রাখা হয়নি কেন? ফ্রিজের গায়ে এই দাগ কোথা থেকে...। ওঁর খুঁত ধরার আর শেষ নেই!

একদিন শ্রীরাধা মাথা গরম করে বলে বসলেন, 'খুঁত তো তোমারও আছে! আমি বললেই তুমি সেটা সারিয়ে ফেলতে পারবে? আমারগুলো আমি কিন্তু চেষ্টা করলেই সারাতে পারি। হুঁঃ...।' শেষের শব্দটার মধ্যে এমন তীব্র এক তাচ্ছিল্য আর ঘৃণা মেশানো ছিল যে, বিধানপতি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কয়েক সেকেন্ড কোনও জবাব দিতে পারলেন না।

তারপর কোনওরকমে থতিয়ে থতিয়ে বললেন, 'আমার ডিফেক্টের ব্যাপারটা তো এখনও মেডিক্যাল কনফার্মড হয়নি। তা ছাড়া এই ডিফেক্ট কি বাইরে থেকে দেখা যায়!'

শ্রীরাধা উত্তরে বিধানপতির কানে গরম সীসে ঢেলে দিলেন। মুখে আনা যায় না এমন নোংরা ভাষায় জবাব দিলেন স্বামীকে। তারপর হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'গোপন খুঁত হলেই তার সাত খুন মাপ!'

বিধানপতি এ-অপমান ভুললেন না। তাই পরদিন থেকে স্ত্রীকে কথায়-কথায় অভিযোগ আর অপমানে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগলেন। শ্রীরাধার মনে হল, ওঁর শরীরের দগদগে ঘায়ের ভেতরে গরম লোহার শিক গুঁজে দিয়ে কেউ যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কিছু খুঁজছে। যন্ত্রণায়-যন্ত্রণায় তিনি পাগল হয়ে গেলেন। যা-নয়-তাই করতে মন চাইল বারবার। মায়ের মুখ, ছোট বোনের মুখ মুছে যেতে চাইল চোখের সামনে থেকে।

একদিন সন্ধের আগে অফিস থেকে ফিরে বারবার কলিং বেল বাজিয়েও বিধানপতি শ্রীরাধার কোনও সাড়া পেলেন না। তখন পকেট থেকে চাবি বের করে সদর দরজার নাইটল্যাচে গুঁজে মোচড় দিলেন। দরজা তাও খুলল না।

বিধানবাবু বেশ অবাক হয়ে গেলেন। কারণ, শ্রীরাধা এ-সময়ে কখনও বাইরে যায় না।

দরজায় আবার ধাক্কা দিলেন। তবুও কেউ দরজা খুলল না।

যখন বিধানবাবু ভাবছেন দরজা ভাঙার জন্য লোকজন ডাকবেন কি না, ঠিক তখনই ভেতর থেকে কেউ দরজা খুলে দিল।

শ্রীরাধাকে দেখতে পেলেন বিধানপতি। কিন্তু শ্রীরাধা কোনও কথা না বলে ঘুরে চলে গেল বাড়ির ভেতর দিকে।

ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন বিধানবাবু। তারপর শ্রীরাধার ওপরে বিরক্ত হয়ে শোওয়ার ঘরে চলে গেলেন। অফিসের জামাকাপড় ছাড়তে শুরু করলেন।

সেখান থেকেই রান্নার আওয়াজ শুনতে পেলেন তিনি। শুনে একটু অবাক হলেন। এত তাড়াতাড়ি তো রান্না শুরু করেন না শ্রীরাধা!

ডাইনিং স্পেসের বেসিনে হাত-মুখ ধুতে এসে বিধানপতি দেখলেন, ডাইনিং টেবিলে ধোঁয়া-ওঠা গরম চা আর তার পাশেই প্লেটে দুটো বিস্কুট। এটা ঠিকই, তিনি অফিস থেকে ফিরে এসে রোজ চা-বিস্কুট খান। কিন্তু চোখের পলকে চা তৈরি হল কেমন করে!

হাত-মুখ ধুয়ে রান্নাঘরে উঁকি মেরে তিনি সে-কথাই জিগ্যেস করলেন শ্রীরাধাকে।

শ্রীরাধা একটা গোলাপি শাড়ি পরে রান্না করছিলেন। স্বামীর কথায় ফিরে তাকালেন না। শুধু অস্পষ্টভাবে বললেন, 'তৈরি যখন হয়ে গেছে তখন খেয়ে নাও।'

বিধানপতি আন্দাজ করলেন, কোনও কারণে শ্রীরাধা রেগে আছেন। তাই কথা না-বাড়িয়ে চা খেতে বসে গেলেন।

চায়ের কাপে দু-চার চুমুক দেওয়ার পরই হঠাৎ ওঁর মনে হল কলতলায় কাপড় কাচার শব্দ হচ্ছে। এ-বাড়িতে কোনও কাজের লোক নেই। শ্রীরাধা রান্নাঘরে রান্না নিয়ে ব্যস্ত। তা হলে কাপড় কাচছে কে!

চায়ের কাপ ফেলে রেখে উঠে পড়লেন বিধানবাবু। ভুরু কুঁচকে এগোলেন কলতলার দিকে।

সেখানে গিয়ে অবাক হয়ে দেখেন একটা আকাশি শাড়ি পরে শ্রীরাধা স্বামীর জামাকাপড় কাচছেন।

বিধানবাবু অবাক হয়ে বলে উঠলেন, 'কী ব্যাপার! তুমি না এক্ষুনি গোলাপি শাড়ি পরে রান্না করছিলে!'

কলতলার মেঝেতে উবু হয়ে বসে শ্রীরাধা কাপড় কাচছিলেন। ঘাড়-কাত করে তাকালেন স্বামীর দিকে। হেসে বললেন, 'রান্না তো এখনও করছি।'

বিধানপতি কেমন যেন বিমূঢ়ভাবে ছুটে এলেন ডাইনিং স্পেসে। রান্নাঘরে উঁকি মারতে সাহস পেলেন না। কিন্তু শুনতে পেলেন শ্রীরাধা কড়াইয়ে খুন্তি নাড়ছেন।

কী করবেন ভাবছেন, ঠিক তখনই বিধানবাবু দোতলার ছাদে পায়ের শব্দ পেলেন। ছাদে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। কিন্তু তাতে এত জোরে-জোরে শব্দ হচ্ছে কেন!

পাগলের মতো ছাদে ছুটে গেলেন বিধানপতি। গিয়ে যা দেখলেন তাকে কোনও কিছু দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না।

শ্রীরাধা ভেজা জামাকাপড় তারে ছড়িয়ে ক্লিপ আঁটছেন। পরনে একটা সবুজ ছাপা শাড়ি।

হতবাক বিধানপতি বউকে জিগ্যেস করলেন, 'এর মধ্যেই তোমার কাচাকুচি হয়ে গেল! শাড়িটাই বা বদলে নিলে কখন?'

স্বামীর দিকে চেয়ে হাসলেন শ্রীরাধা : 'আকাশি শাড়ি পরে কাপড় তো এখনও কাচছি! তোমাকে খুশি করতে হলে একটা নয়—চার-চারটে শ্রীরাধা দরকার।'

'কীসব বলছ তুমি। চারটে শ্রীরাধা দরকার! তার মানে! এসব কী ব্যাপার! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!'

উত্তরে তিন নম্বর শ্রীরাধা হাসলেন আবার। বললেন, 'চার নম্বর শ্রীরাধা ছাদের ওই কোণের দিকটায় আছে। ওকে দেখলেই সব বুঝতে পারবে।'

তৃতীয় শ্রীরাধার কথা মতো ছাদের কোণের দিকটায় এগিয়ে গেলেন বিধানপতি। সেখানে চতুর্থ শ্রীরাধাকে দেখতে পেলেন। ওঁকে দেখামাত্রই সবকিছু স্পষ্ট হয়ে গেল।

এই শ্রীরাধার দেহটা অগোছালোভাবে পড়ে রয়েছে। গলার নলী ফাঁক হয়ে সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। কয়েকটা মাছি উড়ে বেড়াচ্ছে। ওঁর পরনের হালকা হলুদ শাড়িতে রক্তের বিশ্রী ছোপ। অথচ ছাদে কোথাও রক্ত নেই। কারণ, মৃতদেহের চারপাশটা কেউ সুন্দর করে ধুয়ে-মুছে সাফ করে দিয়েছে।

সুতরাং, অভিযোগ করার মতো কিছুই পেলেন না বিধানপতি।

হঠাৎই শ্রীরাধার মৃতদেহ চোখ খুলে তাকাল বিধানবাবুর দিকে। ফ্যাকাসে ঠোঁট ফাঁক করে কথা বলল, 'ছুরিটা ধুয়ে মুছে আলামারিতে আগের মতো সাজিয়ে রেখে দিয়েছি। আলমারির চাবি আমার কোমরে গোঁজা আছে।'

বিধানপতি একটা ভয়ঙ্কর চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন।

তখন সন্ধের আঁধার গুড়ি মেরে নেমে আসছিল। বাতাস যেন হঠাৎই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। আশপাশের গাছ-গাছালির একটা পাতাও নড়ছিল না।

আর, তৃতীয় শ্রীরাধা তখনও কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলেন।

প্রিয়নাথ থামলেন।

ঘরে কোনও কথা নেই। আড্ডার পরিবেশ কেমন যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

প্রায় ফিসফিসে গলায় সুপ্রকাশ পালিত জিগ্যেস করলেন, 'তারপর কী হল?'

বিষণ্ণ হাসলেন প্রিয়নাথ। মাথা নীচু করে আঙুলের নখ খুঁটলেন কয়েকবার। তারপর সামান্য কেশে বললেন, 'শ্রীরাধার মৃত্যুর তদন্ত করতে পুলিশ এসেছিল। তারা বিধানপতিকে জেরা করে-করে একেবারে জেরবার করে দিল। পুলিশের বক্তব্য খুব পরিষ্কার ছিল। শ্রীরাধা মোটেই আত্মহত্যা করেননি। কারণ, ওইভাবে গলা কেটে দু-ফাঁক করার পর কেউ একমিনিটও বেঁচে থাকতে পারে না। তা ছাড়া সুইসাইডের অস্ত্রটা তো বডির কাছেই পড়ে থাকবে। ওটা তো আর ডানা মেলে আলমারিতে ঢুকে পড়তে পারে না! তার ওপর ছাদের রক্ত কে ধুয়ে-মুছে সাফ করল? ছুরিটাই বা কে ধুয়ে রাখল? আলমারিতে চাবি দিয়ে সেই চাবি শ্রীরাধার কোমরেই বা কে গুঁজে রাখল?

'বিধানবাবু পুলিশকে পুরো ঘটনাটা জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাভাবিক কারণেই পুলিশ ওঁর কথা বিশ্বাস করতে পারেনি। বাড়িতে ওঁরা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া আর কেউ ছিল না। তা হলে তৃতীয় কোনও মানুষ শ্রীরাধাকে এইরকম রহস্যময়ভাবে খুন করে চম্পট দিয়েছে—এ-কথা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না।

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিধানবাবুকে ছেড়ে দিল দুটো কারণে। এক : সারা বাড়িতে তন্নতন্ন করে খুঁজেও বিধানবাবুর কোনও রক্তমাখা জামাকাপড় পাওয়া যায়নি। দুই : ঘটনার দিন রাত ন'টা নাগাদ পাড়ার লোকজন যখন দরজা ভেঙে বিধানবাবুর বাড়িতে ঢোকে তখনও তিনি ছাদে মৃতদেহের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত পুলিশ কেসটাকে ''আনসলভড'' হেডিং দিয়ে ফাইল বন্ধ করে দেয়।

'ওই দুর্ঘটনার পর থেকে বিধানপতিবাবুর মাথাটা একটু-আধটু গোলমেলে হয়ে যায়। আর চোখের পাতার ওঠা-পড়া ওরকম এলোমেলো হয়ে যায়। ওঁর এই খুঁতটা কিন্তু আর গোপন নয়—বরং সবসময় সকলের চোখে পড়ে। বহু ডাক্তার এই খুঁত সারানোর চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছে। বিধানপতি মনে করেন, এটা শ্রীরাধার অভিশাপ...।'

প্রিয়নাথ একটু থামতেই বরেন মল্লিক প্রশ্ন করলেন, 'বাকি তিনজন শ্রীরাধার কী হল?'

প্রিয়নাথ সঙ্গে-সঙ্গে কোনও জবাব না দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রহস্যময় হেসে বললেন, 'আমি কী জানি! আপনারাই বলুন—।'





# আঁধারে মায়ার খেলা

প্রিয়নাথ বসবার ঘরে ঢুকতেই ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সৌজন্য দেখিয়ে হাতজোড় করে প্রিয়নাথ বললেন, 'সরি, আপনাদের অনেকক্ষণ বসে থাকতে হল। আসলে এ-সময়টা আমি পুজো করি।'

'না, না—তাতে কী আছে!' ভদ্রলোক হেসে বললেন, 'আমরাই আধঘণ্টা আগে চলে এসেছি।'

ওঁরা সোফায় বসে পড়লেন আবার। প্রিয়নাথও বসলেন।

ভদ্রমহিলা খানিকটা কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলেন, 'আপনি...আপনি ঠাকুর মানেন?'

হাসলেন ভূতনাথ। পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে বেশ সময় নিয়ে সিগারেট ধরালেন। তারপর লাইটার পকেটে রেখে জড়ানো গলায় বললেন, 'দুটোতেই বিশ্বাস করি, ম্যাডাম।'

'দুটো মানে?' এবার ভদ্রলোক জানতে চাইলেন।

'বুঝে নিন—।' রহস্যময় হাসলেন ভূতনাথ।

আজ সকালে ওঁরা—মানে এই ভদ্রলোক—প্রিয়নাথকে ফোন করেছিলেন। ওঁদের বাচ্চা মেয়েকে নিয়ে সমস্যা হচ্ছে, তাই ভূতনাথের পরামর্শ চান। রেফারেন্স হিসেবে ভদ্রলোক এ-পাড়ার শান্তি কমিটির সেক্রেটারি বিজন সরকারের নাম করেছিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে সন্ধে সাতটায় আসতে বলেছিলেন। কিন্তু ওঁরা সাড়ে ছ'টা নাগাদ এসে পড়েছেন। প্রিয়নাথ তখন পুজো করছিলেন। রোজ সকাল-সন্ধে ঠাকুরের আসনের সামনে বসে পুজো করা ওঁর বহু বছরের অভ্যেস।

দরজা খুলে ওঁদের বসতে বলে প্রিয়নাথ আবার অসমাপ্ত পুজোয় ফিরে গিয়েছিলেন। তারপর পাজামার ওপরে একটা শার্ট চাপিয়ে ওঁদের সামনে এসেছেন।

ভদ্রলোক-ভদ্রমহিলা নিজেদের পরিচয় দিলেন।

ভদ্রলোকের নাম প্রমথেশ নাহা, সঙ্গে ওঁর স্ত্রী মাধুরী। ওঁরা দমদম স্টেশনের কাছে ঘুঘুডাঙায় থাকেন।

কিছুদিন ধরে ওঁরা ওঁদের এক বছরের মেয়েকে নিয়ে অদ্ভুত এক সমস্যায় পড়েছেন।

প্রিয়নাথ ওঁদের দেখছিলেন।

পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েসি প্রমথেশের মাথায় কোঁকড়ানো চুল। তাতে কোথাও-কোথাও পাক ধরেছে। চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। ফরসা কপালে-দু-তিনটে ভাঁজ। গোঁফ কলপ করা। পোশাক-আশাকে উচ্চবিত্তের ছাপ। জামার বুকপকেট থেকে মোবাইল ফোন উঁকি মারছে।

মাধুরী দেখতে সাধারণ হলেও রুচিসম্মত পোশাক পরেছেন। সাজগোজ চড়া মাপের নয়। বাঁ-হাতের কড়ে আঙুলে চকোলেট রঙের নেলপালিশের ছোঁয়া। কপালে-সিঁথিতে প্রথাগত সিঁদুর—যা আজকাল খুব কম চোখে পড়ে।

হালকা পারফিউমের গন্ধ প্রিয়নাথের নাকে আসছিল। কিন্তু সেটা প্রমথেশ না মাধুরীর শরীর থেকে—সেটা ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না।

প্রিয়নাথ বুঝতে পারছিলেন, বাইরে ওঁরা শান্ত ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করলেও ভেতরে-ভেতরে বেশ উদ্বিগ্ন। হয়তো মেয়েকে নিয়েই।

সিগারেটে টান দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, 'আপনাদের কথা শুনছি। আগে দোকানে একটু চা বলে আসি—' উঠে দাঁড়ালেন, হেসে যোগ করলেন, 'আমার চা-পাতা ফুরিয়ে গেছে।'

প্রমথেশ হাত নেড়ে ভূতনাথকে বাধা দিলেন : 'কোনও প্রয়োজন নেই, মিস্টার জোয়ারদার। আমরা চা খেয়েই এসেছি। আপনি নিশ্চিন্তে বসুন। বসে আমাদের প্রবলেমটা কাইন্ডলি শুনুন।'

মাধুরীর চোখ ঘরের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সর্বত্র ছন্নছাড়া ছাপ। বোঝাই যায়, এ-আস্তানার মহিলার ছোঁয়া পড়ে না। সোফা-টেবিল-চেয়ার সবই বেহাল। একপাশে দেওয়াল-তাকে গাদা-গাদা বই। সেই বইয়ের ঢল বর্ষার জলের মতো এলোমেলোভাবে নেমে এসেছে টেবিলে, সেখান থেকে গড়িয়ে মেঝেতে। তারপর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে গেছে। বইগুলোকে বাঁচাতে মেঝেতে অবশ্য একটা পুরোনো বেডশিট ভাঁজ করে পাতা আছে।

মাধুরী অবাক চোখে মাঝবয়েসি প্রিয়নাথকে দেখছিলেন। এই সাধারণ মানুষটা কি ওঁদের অসাধারণ সমস্যা থেকে বাঁচাতে পারবে?

হঠাৎ কী মনে হওয়াতে প্রিয়নাথ প্রমথেশবাবুকে সিগারেট অফার করতে গেলেন। কিন্তু স্মিত হেসে প্রমথেশ বললেন, 'ব্যস্ত হবেন না। আমার কাছে আছে—তবে আমি আজকাল একটু কম স্মোক করছি। মাস আস্টেক আগে আমার একটা ছোট্ট স্ট্রোক মতন হয়ে গেছে।

'যাকগে, এবার কাজের কথায় আসি। আমার কম্পিউটারের ব্যবসা আছে। ''এন-কম্পিউটার'' নামে একটা ব্র্যান্ডও চালু করেছি। ক্যামাক স্ট্রিটে আমার অফিস। আর ফ্যাক্টরি দমদমে—বাড়ির কাছাকাছি। রিসেন্টলি আমি সফটওয়্যার ডেভেলাপমেন্টেও হাত দিয়েছি। আমার কোম্পানিতে সাতজন বি. ই., বি. টেক., এনজিনিয়ার কাজ করে।

'এতসব কথা বলার কারণ—আমি টেকনোলজির লোক, ভূত-প্রেতে এক ইঞ্চিও বিশ্বাস আমার নেই। যে-জিনিসের অস্তিত্বই নেই তার ওপর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটাই তো হাস্যকর। কিন্তু...' প্রমথেশের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, 'কিন্তু গত একমাস ধরে আমার ধারণাটা চিড় খেয়ে গেছে। আমি পাজলড হয়ে গেছি।'

প্রিয়নাথ আগ্রহ নিয়ে শুনছিলেন। পাশের ঘরের ঠাকুরের আসন থেকে ধূপের গন্ধ ভেসে আসছিল। ঠুনঠুন ঘন্টি বাজিয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে একটা টানা-রিকশা চলে গেল। তারপরই মালাইবরফওয়ালার সুরেলা হাঁক শোনা গেল।

'ব্যবসা দাঁড় করাতে গিয়ে আমি বিয়ে করার ব্যাপারে বেশ লেট করে ফেলেছি, মিস্টার জোয়ারদার। তাই এ-বয়েসে পৌঁছেও আমাদের একটিমাত্র ইস্যু—মাত্র এক বছরের একটি মেয়ে। নাম প্রথমা। তবে আমরা মাম্পি বলে ডাকি।

'আমাদের প্রবলেমটা মাম্পিকে নিয়েই...।' ঘরের সিলিংয়ের দিকে উদাস চোখে তাকিয়ে শেষ কথাটা বললেন প্রমথেশ। তারপর : 'আমাদের নিজের বাড়ি। বাবা প্রায় ন'বছর আগে এক্সপায়ার করেছেন। আর মা মারা গেছেন মাত্র মাসতিনেক আগে। বাড়িতে এখন আমরা তিনজন—আর আমার একমাত্র বোন সাবিত্রী আমাদের কাছে থাকে। সাবিত্রী উইডো। ওর হাজব্যান্ড আর্মিতে ছিল—এনকাউন্টারে বছর চারেক আগে মারা গেছে।

'আমি বিজনেসের কাজে সারাদিন ব্যস্ত থাকি। মাধুরী আর সাবিত্রীই সবকিছু দেখাশোনা করে। মাম্পি ওদের দু-চোখের মণি। মাধুরী মা—ওর তো টান থাকবেই। তবে সাবিত্রীর টান বোধহয় তার চেয়েও বেশি—' আড়চোখে স্ত্রীর দিকে তাকালেন প্রমথেশ।

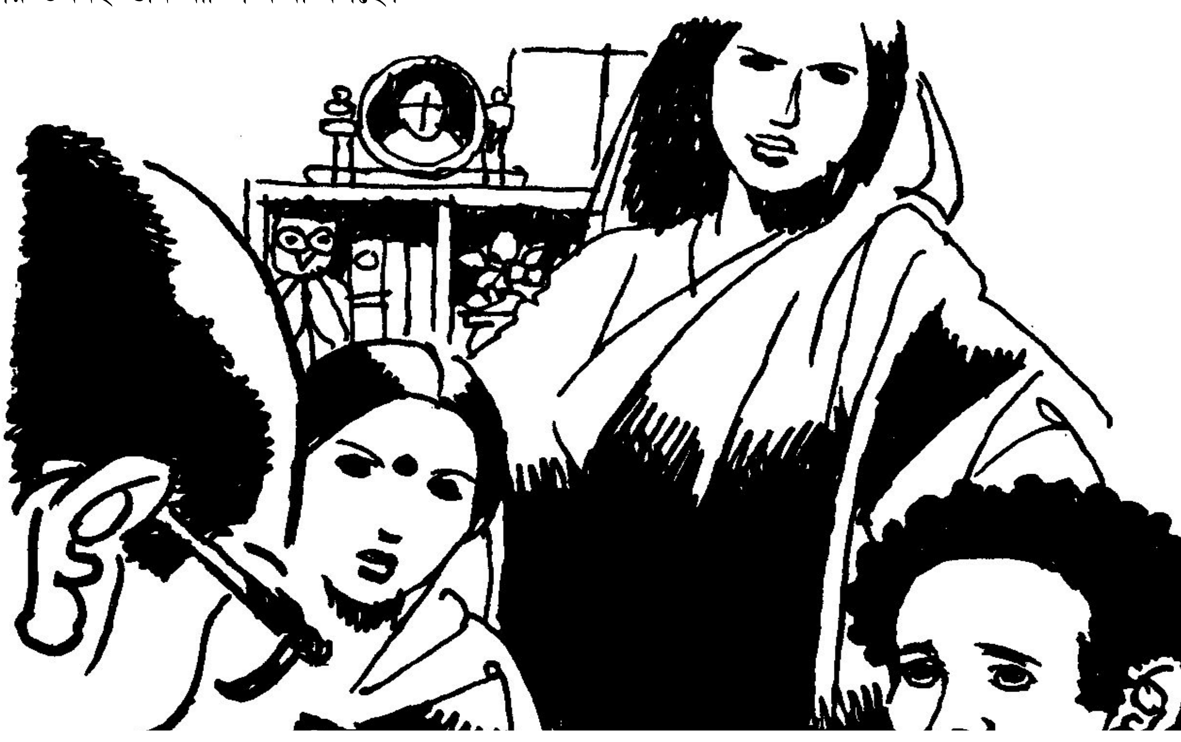
প্রিয়নাথের মনে হল না স্বামীর কথায় মাধুরী অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

একটু থেমে প্রমথেশ আবার বললেন, 'মাম্পিকে সারাটা দিন ওরা দুজনে আগলে-আগলে রাখে। কিন্তু এত আগলে রেখেও শেষ রক্ষা হয়নি। মাম্পি মনে হয় কোনও বিপদে জড়িয়ে গেছে। আর সেই সঙ্গে আমাদের প্রত্যেককেও জড়িয়ে ফেলেছে।'

'এইটুকু মেয়ে আবার বিপদে জড়াবে কেমন করে!' অবাক হয়ে বললেন ভূতনাথ।

চোখ নামালেন প্রমথেশ। কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে তারপর স্ত্রীর দিকে তাকালেন : 'এবারে তুমি বলো—আমি একটু আনইজি ফিল করছি...।'

মাধুরী একটু কেশে নিলেন, প্রিয়নাথ এবং স্বামীকে একপলক করে দেখলেন, তারপর বেশ নীচু গলায় বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের মেজর প্রবলেম হল মাম্পি হঠাৎ কথা বলতে শুরু করেছে। আপনি তো জানেন, এক বছর বয়েসের বাচ্চার পক্ষে কথা বলাটা কীরকম অস্বাভাবিক! মাসখানেক আগে একদিন হঠাৎ মাম্পি কথা বলতে শুরু করে। তখন প্রায় মাঝরাত্তির। আচমকা এক অস্বস্তিতে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল, আর তখনই শুনি মাম্পি কথা বলছে।'





'কার সঙ্গে?'

'প্রথমটা মনে হয়েছিল বোধহয় আপনমনে কথা বলছে। আমি বেশ অবাক হয়ে গিয়ে ধাক্কা দিয়ে ওর ঘুম ভাঙাই—' ইশারায় স্বামীর দিকে দেখালেন মাধুরী : 'তারপর অন্ধকারে চুপটি করে আমরা মাম্পির কথা শুনতে থাকি। কিছুক্ষণ শোনার পর বুঝতে পারি, ও আপনমনে কথা বলছে না—কারও সঙ্গে কথা বলছে।

'একটু পরে আমি ভয় পেয়ে গিয়ে ঘরের আলো জ্বেলে দিই। আলো জ্বালতেই দেখি মাম্পি চোখ বুজে আঘোরে ঘুমোচ্ছে। সেই অবস্থাতেই ওর ঠোঁট নড়ে উঠল। ও বলল, ''আলো নিভিয়ে দে—অসুবিধে হচ্ছে।'' তক্ষুনি আমি আলো নিভিয়ে দিই। তার মিনিটকয়েক পর মাম্পির কথা বন্ধ হয়ে যায়। আর পরদিন সকাল থেকেই ও আবার স্বাভাবিক। সেই দু-একটা আধো-আধো কথা : মা...বা...পিচি...এইরকম। তারপর...।'

হঠাৎই পাখির ডাকের শব্দে প্রমথেশের মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

প্রমথেশ পকেট থেকে ফোন বের করে কথা বললেন। ব্যবসার কাজের ফোন। সংক্ষেপে কথা শেষ করে প্রমথেশ বললেন, 'এখন আমাকে ফোন করে ডিসটার্ব কোরো না। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে জরুরি কথা বলছি।'

প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে আলতো গলায় 'সরি' বলে সেলফোনটা বুকপকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন।

আগের কথার খেই ধরে মাধুরী আবার বলতে শুরু করলেন।

'তারপর—দু-চারদিন সবে কেটেছে—মাম্পি আবার ওইরকম কথা বলল। সেদিকের কথায় স্পষ্ট বোঝা গেল ও কারও সঙ্গে কথা বলছে। আর মাঝে-মধ্যেই প্রথমদিনের মতো তুই-তোকারি করে মন্তব্য করতে

লাগল। তখনও আমরা বুঝতে পারিনি মাম্পি ঠিক কাকে তুই-তোকারি করছে—ওকে, না আমাকে। সেটা বোঝা গেল আরও কিছুদিন পর।

'একদিন রাতে ওইরকম কথা বলতে-বলতে হঠাৎই ও বলল, ''পিনু যে লুকিয়ে নন্দা নামে ইস্কুলের ওই দিদিমণির সঙ্গে প্রেম করে সে আমি বহু আগেই টের পেয়েছি।'' এ-কথা শুনে ও একেবারে চমকে উঠল—' প্রমথেশের দিকে ইশারা করলেন মাধুরী। তারপর মাথা সামান্য হেঁট করে বললেন, 'পিনু আমার হাজব্যান্ডের ডাক নাম।'

প্রিয়নাথ সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে বসলেন। কয়েকবার ঘন-ঘন টান দিয়ে সিগারেটটা শেষ করে ফেললেন। সিগারেটের টুকরোটা টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, 'মাম্পি কি তা হলে ওই ঘোরলাগা অবস্থায় আপনার শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলে?'

উত্তরে শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রমথেশ। বেশ হতাশ

ভঙ্গিতে বললেন, 'হ্যাঁ—ঠিকই ধরেছেন। কারণ, বয়েসকালে নন্দা নামে একটি মেয়ের সঙ্গে আমার ইয়ে—মানে, একটা অ্যাফেয়ার ছিল। মেয়েটি পাড়ার করপোরেশন স্কুলে পড়াত। একেবারেই ছেলেমানুষি ব্যাপার।' বিষণ্ণ হাসলেন প্রমথেশ : 'কী বলব বলুন! মাম্পি এই টাইপের আরও সব এমন-এমন কথা বলছে যে, মাধুরীর সঙ্গে আমার রিলেশানটাই বিষিয়ে যাচ্ছে। আপনিই বলুন, এইসব পুরোনো ইস্যুর জের টেনে অশান্তি করার কোনও মানে হয়! নিজেকে আমার ভীষণ অকওয়ার্ড লাগছে। একে তো বিজনেসের টেনশান—তার ওপরে এই বাড়তি অশান্তি। বলুন তো কার ভালো লাগে!'

এ-ধরনের কথায় প্রিয়নাথ অস্বস্তির মধ্যে পড়ে যাচ্ছিলেন। তাই লৌকিক ব্যাপার থেকে অলৌকিক প্রসঙ্গ ফিরিয়ে নিয়ে এলেন।

'তার মানে আপনার মায়ের প্রেতাত্মা আপনার মেয়েকে ডিসটার্ব করছে?' প্রমথেশকে সরাসরি প্রশ্ন করলেন প্রিয়নাথ।

'এ ছাড়া আর কী বলব বলুন! অস্বীকার করার তো কোনও পথ নেই...।'

'আপনার মা মাম্পিকে খুব ভালোবাসতেন?'

উত্তর দিলেন মাধুরী : 'প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। বলতেন, ''মাধুরী, ও তোমারও মেয়ে, আমারও মেয়ে। ভাগ্যচক্রে আমার নাতনি হয়ে জন্মেছে।'' মাম্পিকে ছেড়ে মা একটা মিনিটও থাকতে পারতেন না। প্রায়ই বলতেন, ''মায়ার টান বড় সাঙ্ঘাতিক। কিছুতেই ছেড়ে যেতে দেয় না।'' শেষ দিকটায় মা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারতেন না। উনি বুঝতে পেরেছিলেন, সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাই এ-কথাটা আরও বেশি করে বলতেন। আর...আর মারা যাওয়ার ঠিক আগে মা বলেছিলেন...।'

মাধুরী কথা শেষ না-করে চুপ করে গেলেন।

'কী বলেছিলেন?' প্রিয়নাথ আগ্রহ চেপে রাখতে পারছিলেন না। শিকারের গন্ধ-পাওয়া চিতাবাঘের মতো ভেতরে ভেতরে ছটফটিয়ে উঠছিলেন।

মাধুরী আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকালেন। নীরব প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন

যেন : বলব, নাকি বলব না?

প্রমথেশ আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর ক্লান্ত গলায় বললেন, 'তুমি বলো—আমি কিছুই মাইন্ড করব না। বাচ্চাটাকে তো যে-করে-হোক বাঁচাতে হবে!'

শাড়ির আঁচলটা সামান্য ঠিক করে নিয়ে মাধুরী বললেন, 'মারা যাওয়ার ঠিক আগে মা বলেছিলেন, ''মাম্পিকে ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হচ্ছে। দেখো, মাধুরী, এই মায়ার টান আমাকে কিছুতেই তোমাদের ছেড়ে যেতে দেবে না। আবার আমাকে ফিরিয়ে আনবে...মায়ার টান আবার আমাকে ফিরিয়ে আনবে...তোমরা দেখো...।'' '

মাধুরী হঠাৎই ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

প্রমথেশ ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন, মাধুরী ছোট্ট একটা রঙিন রুমাল চোখে চেপে ধরে হাত তুলে স্বামীকে ব্যস্ত না-হতে ইশারা করলেন।

প্রিয়নাথ আর প্রমথেশ অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই মাধুরী চোখ মুছে সহজ হলেন। দু-একবার নাক টেনে তারপর সামান্য ধরা গলায় অনুনয় করে বললেন, 'আমাদের বাচ্চা মেয়েটাকে আপনি বাঁচান, প্রিয়নাথবাবু। অনেক আশা নিয়ে আমরা আপনার কাছে এসেছি।'

প্রিয়নাথ গম্ভীর হয়ে খানিকক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন, 'দেখি চেষ্টা করে। আচ্ছা, আপনারা কি মাম্পির কথাবার্তা টেপ করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি—' উত্তর দিলেন প্রমথেশ, 'ঘটনাটা শুরু হওয়ার কয়েকদিন পরেই টেপ করার চিন্তাটা আমার মাথায় আসে। তখন আমি একটা ক্যাসেটে মাম্পির কথাবার্তা টেপ করি—মানে, একটানা পারিনি—একটু স্ক্যাটার্ডভাবে টেপ করতে পেরেছি। তাতে মাম্পির দু-চারদিনের কথাবার্তার টুকরো ধরা আছে। স্ক্যাটার্ড হলেও ব্যাপারটা বেশ বোঝা যায়। আর...আর টেপটা প্লে-ব্যাক করে শুনলে কেমন যেন ভয়-ভয় করে। মাধুরী তো একদিন চিৎকার করে উঠেছিল।'

'মাম্পিকে আমার দেখা দরকার...ওর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।'

'অফ কোর্স!' জোর দিয়ে বললেন প্রমথেশ, 'আপনি চাইলে এখনই আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন—আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।'

একপলক ভেবে প্রিয়নাথ বললেন, 'না, এক্ষুনি হবে না। আমি বরং কাল বিকেলে আপনাদের বাড়িতে যাব। আপনি অ্যাড্রেসটা আমাকে দিয়ে যান— ।'

'তার কোনও দরকার নেই। কাল পাঁচটায় আমি গাড়ি পাঠিয়ে দেব। তাতে কাজটা সহজ হয়ে যাবে।'

প্রিয়নাথ মাথা নাড়লেন : 'ঠিক আছে। আমি তৈরি হয়ে থাকব।'

মাধুরী চোখের ইশারায় স্বামীকে কিছু বলতে চাইছিলাম। সেটা লক্ষ করে প্রমথেশ একটু ইতস্তত করে প্রিয়নাথকে বললেন, মিস্টার জোয়ারদার, আপনাকে কী...মানে, আপনার ফিজটা...অ্যামাউন্টটা যদি কাইন্ডলি বলেন...।'

হাসলেন প্রিয়নাথ। বললেন, 'ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। যদি মাম্পিকে নরমাল করে দিতে পারি তা হলে দু-হাজার টাকা দেবেন।'

প্রমথেশ প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিলেন, প্রিয়নাথ বললেন, 'উঁহু, পেশেন্টকে সারাতে না পারলে আমি টাকা নিই না।'

অপ্রস্তুত হাসি হাসলেন প্রমথেশ আর মাধুরী। তারপর আরও বারকয়েক অনুরোধ-অনুনয় করে উঠে পড়লেন।

ওঁদের সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এলেন ভূতনাথ। সামান্য ঠান্ডা বাতাস ওঁর মুখ-চোখ ছুঁয়ে গেল। বুঝতে পারলেন, শীত বেশ কিছুদিন হল চলে গেলেও এখনও পুরোপুরি মায়া কাটাতে পারেনি।

মায়া বড় অদ্ভুত জিনিস।

'ঠাম্মা—।'

'কী বল।'

'তুমি আমাকে ছেড়ে যেয়ো না।'

'পাগল!' অদ্ভুত খলখল হাসি : 'তোকে ছেড়ে কখনও যেতে পারি।'

'তুমি কোথায়?'

'সোনামণি আমার, আমি তো তোর ভেতরেই আছি। তোর আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে আছি। শঙ্খ-লাগা সাপ যেমন একটা আর-একটাকে জড়িয়ে থাকে, আমি ঠিক সেরকম করে তোর আত্মাকে জড়িয়ে আছি।' আবার

আকুল অট্টহাসি। যেন কেউ হেসে কুটিকুটি হয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

তারই মধ্যে শোনা গেল এক ভয়ের আর্তচিৎকার। তারপরই কান্না। কান্না-ভাঙা গলায় মাধুরী চেঁচিয়ে বললেন, 'মা! মা! আপনি মাম্পিকে ছেড়ে দিন! আপনার দুটি পায়ে পড়ি, আমার মেয়েটাকে বাঁচান! দোহাই আপনার...।'

উত্তরে রক্ত-হিম-করা হাসি শোনা গেল। যেন বহু উঁচু জলপ্রপাত থেকে জলের বদলে রাশি-রাশি ভাঙা কাচের টুকরো গড়িয়ে পড়ছে।

তারপর আর কোনও শব্দ নেই।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার টেপ রেকর্ডার বন্ধ করলেন। আপনমনেই নানা কথা ভাবছিলেন তিনি। টেপের সব কথাবার্তাই মাম্পির গলায়। তবে ঠাকুমার সংলাপগুলো বলার সময় অদ্ভুত এক বুড়োটে ঢং ফুটে উঠেছে। আর হাসিটা? একটা বাচ্চা কি সত্যিই ওভাবে হাসতে পারে?'

প্রিয়নাথের মুখোমুখি বসে ছিলেন প্রমথেশ আর মাধুরী—প্রমথেশ একটি সুদৃশ্য মোড়ায়, আর মাধুরী বিছানায়। বিছানার একপাশে দাঁড়িয়ে সাবিত্রী। পরনে রঙিন শাড়ি। গায়ের রং ময়লা। বয়েস পঁয়তিরিশ-ছত্তিরিশ হবে। লম্বাটে মুখ, গাল সামান্য বসা, চোখের নজরে সতর্ক ভাব।

ওঁরা গেস্টরুমে বসে কথাবার্তা বলছিলেন। সামনের টেবিলে প্রমথেশদের একশো ওয়াট বিপিএল টেপরেকর্ডার।

প্রিয়নাথ ওঁর ঝোলাব্যাগ নিয়ে ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছেন। ঝোলাব্যাগে রয়েছে প্রেত-পিশাচ ইত্যাদির তদন্তের নানারকম যন্ত্রপাতি আর হাতিয়ার। মাধুরী জানিয়েছেন, মাম্পি এখনও ঘুমোচ্ছে—তবে একটু পরেই উঠে পড়বে। তখন প্রিয়নাথ ওকে দেখতে পারবেন। সেইজন্যই প্রিয়নাথ শুরুতেই প্রমথেশের রেকর্ড করা ক্যাসেট শুনতে বসে গেছেন।

ক্যাসেটের প্রথম অংশটা শোনার পর প্রিয়নাথ ভাবতে বসলেন।

ব্যাপারটাকে কি 'ভূতে-ধরা' গোছের বলা যায়? ইংরেজিতে এ-ধরনের ব্যাপারকে 'পোল্টারগাইস্ট ফেনোমেনন' বলে। মাম্পির ঠাকুমা তো মাম্পিকে খুব ভালোবাসতেন। তা হলে বাচ্চাটাকে তিনি এ-ভাবে কষ্ট দিচ্ছেন কেন? এমন কি হতে পারে যে, বাচ্চাটার কষ্ট তিনি বুঝতে পারছেন না! তা নইলে বাচ্চাটার আত্মার সঙ্গে নিজের প্রেতাত্মাকে তিনি কেন জড়িয়ে রাখতে চাইছেন?

'আপনার মায়ের কোনও ফটো থাকলে আমাকে দিন।' প্রমথেশকে লক্ষ্য করে বললেন ভূতনাথ।

প্রমথেশ তাকালেন সাবিত্রীর দিকে : 'সাবি, বেডরুমের বড় বাঁধানো ফটোটা নিয়ে আয়।'

সাবিত্রী চলে গেলেন।

এবং ফিরে এলেন একটু পরেই। হাতে প্রমাণ মাপের বাঁধানো একটা ফটো।

ফটোটা টেবিলে চিত করে নামিয়ে রাখতেই ভূতনাথের সেদিকে চোখ গেল। তিনি যেন সম্মোহিতের মতো ফটোটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ফটোর নীচে নাম লেখা : নয়নপ্রভা নাহা। আর তার দু-পাশে জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ।

বছর সত্তর-বাহাত্তরের এক বৃদ্ধা উজ্জ্বল চোখে প্রিয়নাথকে দেখছেন। তাঁর মাথায় শোনপাপড়ির মতো ধবধবে সাদা অঢেল চুল। ফরসা কপালে বাঁদিকে একটা কালো আঁচিলের মতন। ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি।

সব মিলিয়ে বৃদ্ধাকে কেমন যেন জীবন্ত বলে মনে হচ্ছিল।

ঝোলাব্যাগ থেকে আতসকাচটা বের করে ফটোটার ওপরে ঝুঁকে পড়লেন প্রিয়নাথ। ওটা খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর মুখ তুলে আতসকাচটা ঝোলাব্যাগে ঢুকিয়ে মাধুরীকে জিগ্যেস করলেন, 'এই ফটোটা আপনাদের বেডরুমে থাকে?'

মাধুরী মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বললেন।
প্রিয়নাথ ফটোটা সাবিত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা আবার জায়গামতো টাঙিয়ে দিন।'
সাবিত্রী ফটো নিয়ে চলে গেলেন।
প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই পাশের কোনও ঘর থেকে বাচ্চার কান্না ভেসে এল।
মাধুরী উঠে দাঁড়ালেন : 'আমি যাই। মাম্পি উঠে পড়েছে। ওকে খাওয়াতে হবে।'
মাধুরী চলে যেতেই প্রিয়নাথ আবার টেপ চালু করলেন। কিছুক্ষণ খালি টেপ চলার ঘসঘস শব্দ হল। তারপরই মাম্পির গলা পাওয়া গেল।
'ঠাম্মা, ঠাম্মা, তুমি কী করছিলে?'
'অন্ধকারে এক্কা-দোক্কা খেলছিলাম?'
'কার সঙ্গে?'
'তুই চিনবি না—অন্ধকার-অন্ধকার সব লোকজনের সঙ্গে।'
'আমি মায়ের সঙ্গে খেলা করি।'
'তোর মা বাজে।'
'কেন?'
'তোর বাবাকে নিয়ে সবসময় দরজা বন্ধ করে দেয়। ভাবে আমি কিছু বুঝি না! আমার দিকে কোনও খেয়াল নেই, শুধু নিজেদের ফুর্তি। দিন-রাত শুধু ওই নিয়েই ব্যস্ত। পিনুকে আমি চিনি না! ওর জীবনে অনেক নোংরা-নোংরা ব্যাপার আছে। সেই যে ওই স্কুলের দিদিমণি...।'
'না, আমার মা-বাবা ভালো।'
'মোটেই না! তোমার মা-বাবা বাজে, বাজে, বাজে! তোমার ঠাম্মা খুব ভালো। সোনামণি লক্ষ্মীটি আমার। তোমার ঠাম্মা খুব ভালো, খুব ভালো খুব ভালো...।'
'হ্যাঁ-হ্যাঁ। ঠাম্মা ভালো। মা বাজে। বাবা বাজে। পিসি বাজে। সবাই বাজে। শুধু ঠাম্মা ভালো।'
'ভালো...ভালো...ভালো।'
তারপরই মাম্পির গলায় কান্না শোনা গেল। তবে শুনে মনে হচ্ছিল, কোনও বৃদ্ধা যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।
তারপর সব চুপচাপ।
প্রমথেশ মাথা নীচু করে বসেছিলেন। প্রিয়নাথ টেপ বন্ধ করে বললেন, 'আরও যে রেকর্ড করেছেন সেসব কথাবার্তা কী টাইপের?'
হতাশ ভঙ্গিতে হাত উলটে প্রমথেশ বললেন, 'ওই একই টাইপের। ছলছুতো পেলেই আমাকে আর মাধুরীকে অপদস্থ করার চেষ্টা। অথচ বিশ্বাস করুন, মায়ের জন্যে আমরা কী না করেছি!'
প্রিয়নাথ হাত নেড়ে প্রমথেশকে শান্ত করতে চাইলেন : 'আত্মা আর প্রেতাত্মায় অনেক তফাত আছে, প্রমথেশবাবু। কেউ লোক ভালো হলেই তার প্রেতাত্মা ভালো হয় না। এরকম বহু গরমিল আমি দেখেছি। আপনার মায়ের প্রেতাত্মা কিন্তু আপনার মা নন—এটা মনে রাখবেন!' টেপরেকর্ডারের বোতাম টিপে ক্যাসেটটা বের করলেন : 'এটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। কাজ হয়ে গেলে ফেরত দেব। এবারে চলুন, মাম্পির সঙ্গে একটু দেখা করি—।'
প্রমথেশদের বেডরুমের দরজায় পা দিয়েই প্রথমাকে এই প্রথম দেখলেন প্রিয়নাথ।
বিছানার ওপরে মায়ের কোলে বসে ছিল মাম্পি। পশ্চিমের জানলা দিয়ে অবাধ্যভাবে ঢুকে পড়া মরণাপন্ন সূর্যের কমলা রং ওর মুখে-গালে-মাথায় মাখামাখি। ওর মিষ্টি মুখ, ডাগর চোখ, আর ফুলো-ফুলো গাল যে-কোনও রত্নাকরকে পলকে বাল্মীকি করে দিতে পারে। এক বছরের এই ফুটফুটে বাচ্চা মেয়েটিকে দেখে প্রিয়নাথ তক্ষুনি ওর প্রেমে পড়ে গেলেন। এই মেয়েটির আত্মার সঙ্গে ওর ঠাকুমার প্রেতাত্মা আষ্টেপৃষ্ঠে

জড়িয়ে রয়েছে এ-কথা ভাবলেই কেমন গা শিরশির করে ওঠে। সন্ধ্যা ছুঁই-ছুঁই গোধূলির আলোয় প্রিয়নাথ হঠাৎই শিউরে উঠলেন।

নিজেকে সামলে নিয়ে মাম্পিকে আদর করে ডাকলেন, 'মাম্পি সোনা...মাম্পি...প্রথমা...।'

বাচ্চাটা মায়ের কোলে বসে-বসেই ঘাড় ফেরাল প্রিয়নাথের দিকে। আর ঠিক তখনও ওর মাথায় একটা অদ্ভুত জিনিস প্রিয়নাথের নজরে পড়ল। সূর্যের আলো মরে এলেও ভূতনাথের দেখতে কোনও ভুল হল না।

মাধুরীকে ইশারা করে তিনি মেয়েটাকে কাছে নিয়ে আসতে বললেন। মাধুরী বসে-বসেই মেয়েকে নিয়ে এগিয়ে এলেন বিছানার কিনারায়।

প্রিয়নাথ বাচ্চাটার মাথা বেশ ভালো করে দেখলেন।

না, তিনি ভুল দেখেননি। মাম্পির মাথায় দু-গাছা শনের মতো সাদা চুল চিকচিক করছে। এরকম লম্বা সাদা চুল ওর মাথায় কেমন করে এল!

'ওর মাথার এই পাকা চুল দুটো আপনারা খেয়াল করেননি?'

প্রিয়নাথের প্রশ্নের উত্তরে মাধুরী মেয়ের মাথার ওপরে ঝুঁকে পড়লেন। প্রমথেশ আর সাবিত্রী তাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে এলেন মাম্পির কাছে। ওঁরা তিনজনে অবাক হয়ে লম্বা সাদা চুল দুটো দেখতে লাগলেন।

মাধুরী ভয়ার্ত গলায় বললেন, 'কখন এই চুল দুটো এল!'

তারপর সবাই চুপচাপ। শুধু মাম্পি হাত-পা নেড়ে অর্থহীন সব শব্দ করছিল।

ঘর অন্ধকার হয়ে আসছিল। সাবিত্রী আলো জ্বেলে দিলেন। ঠিক তখনই ঘরের ইলেক্ট্রনিক ঘড়ি মিষ্টি শব্দ করে জানিয়ে দিল ছ'টা বাজে।

মাম্পির তিনজন অভিভাবক ফ্যাকাসে মুখে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে বিভ্রান্তভাবে অপেক্ষা করছিলেন। প্রিয়নাথের চোখ একবার মাম্পিকে দেখছিল, আর-একবার দেওয়ালে টাঙানো নয়নপ্রভার ফটোর দিকে দেখছিল। বৃদ্ধা কি চাইছেন তাঁর শরীরের ছায়া মাম্পির ওপরে পড়ুক? দু-গাছা সাদা চুল দিয়েই কি তার শুরু?

সাবিত্রী প্রায় ফিসফিস করে উচ্চারণ করলেন, 'কী হবে এখন!'

প্রিয়নাথ যেন আপনমনেই বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, 'আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে না। আজ রাতেই একবার চেষ্টা করে দেখি...।'

মাধুরী প্রিয়নাথকে জিগ্যেস করলেন, 'পাকা চুল দুটো তুলে দেব?'

প্রিয়নাথ তড়িঘড়ি বলে উঠলেন, 'না, না—একদম না! আমাদের কপাল ভালো হলে ওগুলো নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবে।'

তারপর প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ সময় কাটালেন মাম্পির সঙ্গে। ওকে আদর করলেন, ওর সঙ্গে কথা বললেন।

ওঁরা তিনজন ভূতনাথের এই আচরণে একটু অবাক হলেন। কিন্তু প্রিয়নাথ আসলে নিজের ভেতরের টেনশানটা কাটাতে চেষ্টা করছিলেন।

একটু পরে তিনি বললেন, 'আজ রাতে আমরা সবাই এ-ঘরে থাকব। একটা টেবিল আর চারটে চেয়ারের ব্যবস্থা করুন। তারপর আপনাদের সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

প্রমথেশ সাবিত্রীকে বললেন সব ব্যবস্থা করতে।

এমন সময় বেডরুমের দেওয়াল-তাকে রাখা টেলিফোন বেজে উঠল। প্রমথেশ তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরলেন, কথা বললেন।

প্রিয়নাথ মাধুরীকে জিগ্যেস করলেন, 'মারা যাওয়ার পর নয়নপ্রভাকে আপনারা কখনও দেখেছেন?'

মাধুরী মাম্পিকে মেঝেতে ছেড়ে দিয়ে স্বামীর দিকে প্রশ্ন নিয়ে তাকালেন।

প্রমথেশের কথা বলা হয়ে গিয়েছিল। রিসিভার নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, 'একবারই মাত্র দেখেছিলাম। দিন-দশ-বারো আগে মাঝরাতে হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গিয়েছিল। কিছুতেই আর ঘুম আসছিল না। তখন একটা

সিগারেট ধরিয়ে ওই জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎই মাকে দেখতে পেলাম। সাদা থান-পরা একটা ছায়া যেন অন্ধকারে শূন্যে ভাসছে। তবে স্পষ্ট করে দেখতে পাইনি। একটা কালো রঙের বিশাল ফ্যানের ব্লেড যেন মায়ের সামনে ধীরে-ধীরে ঘুরছিল। তার আড়াল দিয়ে আমি মাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। মায়ের ধবধবে সাদা চুল বাতাসে উড়ছিল। হঠাৎই মা দু-হাত সামনে বাড়িয়ে দিল—যেন কোনও বাচ্চাকে কোলে নিতে চাইছে। তারপরই ছবিটা মিলিয়ে গেল। সেটাও বেশ পিকিউলিয়ারভাবে। যেন পাউডার দিয়ে কেউ মায়ের ছবিটা তৈরি করেছিল। হঠাৎ করে জোরে ফুঁ দিয়ে পাউডারের গুঁড়োগুলো উড়িয়ে দিল বাতাসে।'

প্রমথেশ থামলেন।

মাম্পি টলোমলো পায়ে মেঝেতে হাঁটতে চেষ্টা করছিল। থেকে-থেকেই মায়ের শাড়ি খামচে ধরছিল।

প্রিয়নাথ অবাক চোখে বাচ্চাটাকে দেখছিলেন। ওকে নিয়েই যত গোলমাল যত কাণ্ড—অথচ ওর কোনও ভ্রূক্ষেপই নেই।

সাবিত্রী কাজের লোকদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। টেবিল-চেয়ার ঠিকমতো সাজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই আবার চা আর স্ন্যাক্স নিয়ে ফিরে এলেন। সেগুলো টেবিলে রেখে প্রমথেশকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দাদা, তোমরা চা খেতে-খেতে কথা বলো।' তারপর প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে : 'আপনি আজ আমাদের এখানে খাবেন—আর রাতে তো থাকছেনই। গেস্ট-রুমে আপনার শোওয়ার ব্যবস্থা করেছি।'

প্রমথেশ হেসে বললেন, 'শুধু আজ কেন! যদি দরকার মনে করেন তা হলে পাঁচ-সাত দিনও থাকতে পারেন। উই ডোন্ট মাইন্ড অ্যাট অল।'

প্রিয়নাথ বেশ চিন্তিতভাবে বললেন, 'কে জানে, ব্যাপারটা আজ রাতে মিটবে কি না!'

সাবিত্রী বোধহয় রান্নাবান্নার তদারকি করতে চলে গেলেন। মাধুরী ওঁকে বললেন, 'তুমি যাও, আমি একটু কথা বলেই যাচ্ছি—।'

চা খেতে-খেতে নয়নপ্রভা সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন মাধুরী আর প্রমথেশ। প্রিয়নাথ মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। ঝোলাব্যাগ থেকে ডায়েরি বের করে মাঝে-মাঝে নোট নিলেন। তারপর চায়ের পাট চুকলে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'চলুন, নয়নপ্রভা দেবীর ঘরটা একবার দেখে আসি।'

প্রমথেশ মাধুরীর দিকে তাকালেন।

মাধুরী বললেন, 'মা সাবিত্রীর সঙ্গে থাকতেন। মা চলে যাওয়ার পর ও-ঘরে সাবিত্রীই একা থাকে। ওখানে তো মায়ের চিহ্ন বলতে সেরকম কিছু নেই—শুধু পুরনো আমলের একটা কাঠের আলমারি ছাড়া...।'

প্রিয়নাথ তবু যেতে চাইলেন।

মাধুরী স্বামীকে বললেন, 'তুমি মাম্পিকে দেখো—আমি ওঁকে ঘরটা দেখিয়ে নিয়ে আসছি।'

মাধুরী প্রিয়নাথকে নিয়ে চলে গেলেন সাবিত্রীর ঘরের দিকে।

কিন্তু সেখানে প্রিয়নাথকে হতাশ হতে হল। মনে দাগ কাটার মতো নতুন কিছুই চোখে পড়ল না।

সুতরাং একটু পরেই ওঁরা দুজনে ফিরে এলেন। প্রমথেশ মাম্পিকে কোলে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রিয়নাথ ফিরে আসামাত্রই জানতে চাইলেন, 'কিছু পেলেন?'

প্রিয়নাথ সিগারেটে আলতো টান দিয়ে বললেন, 'নাঃ...।' তারপর মাম্পির কাছে এগিয়ে এসে ওর গাল টিপে দিয়ে বললেন, 'আজ রাত দশটা নাগাদ আমরা ওই টেবিল ঘিরে বসব। মাধুরী দেবী,' মাধুরীর দিকে ফিরে তাকালেন ভূতনাথ, 'আপনার শাশুড়ির ছবিটা আমি দেওয়াল থেকে নামাচ্ছি। ওটা টেবিলে একটা পাশ ঘেঁষে দাঁড় করিয়ে রাখব। ওঁর ওপরে কনসেনট্রেট করার জন্যে ছবিটা দরকার।'

ছবিটা দেওয়াল থেকে খুলে নিলেন প্রিয়নাথ। বৃদ্ধার তীব্র চোখ প্রিয়নাথকে যেন বিদ্ধ করল।

কয়েক ঘণ্টা পর অন্ধকারে বসেও প্রিয়নাথকে বৃদ্ধার তীব্র দৃষ্টির চাপ সহ্য করতে হচ্ছিল। কারণ, টেবিলে দাঁড় করানো ছবির ওপরে প্রিয়নাথের টর্চ একটা আলোর বৃত্ত এঁকে দিয়েছিল। আর ওঁরা চারজন হাতে হাত

ধরে একমনে নয়নপ্রভার কথা ভাবছিলেন।

অন্ধকারে ওঁদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শোনা যাচ্ছিল। পশ্চিমের খোলা জানলা দিয়ে মরা চাঁদের আলো আর বাতাস ঢুকে পড়ছিল ঘরের ভেতরে।

টেবিল ঘিরে বসার আগে প্রিয়নাথ কয়েকটা কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন মাধুরী, প্রমথেশ ও সাবিত্রীকে।

'আমি যা বলব সেটা অক্ষরে-অক্ষরে মানতে হবে। এর যেন একফোঁটা নড়চড় না হয়। কেউ কোনও কথা বলবেন না, বা আননেসেসারি কোনও আওয়াজ করবেন না। আর সবাই একমনে নয়নপ্রভার কথা ভাববেন —যেন উনি ছাড়া দুনিয়ায় আর কেউ নেই। যদি আচমকা নয়নপ্রভার প্রেত-শরীর ঘরে দেখা দেয় তা হলে আপনারা যেন ভয় পেয়ে চিৎকার-টিৎকার করবেন না। তাতে কাজের অসুবিধে হবে। আর লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল ইনস্ট্রাকশন হল : কোনও অবস্থাতেই চেয়ার ছেড়ে কেউ উঠবেন না।'

কথাগুলো বলার সময় প্রিয়নাথকে কেমন অন্যরকম মনে হচ্ছিল। এতক্ষণ দেখা নিপাট ভদ্রলোক-ভদ্রলোক চেহারাটা বদলে গিয়ে জেগে উঠল আত্মবিশ্বাসে টগবগ করা প্রেতসিদ্ধ এক নিষ্ঠুর মানুষ।

মাধুরীর কেমন ভয়-ভয় করছিল। চেয়ারে বসে বারবার চোখ ফেরাচ্ছিলেন বিছানার দিকে। মাম্পি সেখানে অঘোরে ঘুমিয়ে রয়েছে। ওকে অন্য ঘরে রেখে আসতে চেয়েছিলেন মাধুরী, কিন্তু প্রিয়নাথ আপত্তি করেছেন। বলেছেন, 'মাম্পি এই ঘরে না থাকলে প্রেতচক্র বসানোর কোনও মানেই হয় না।'

সাবিত্রীও ভয় পাচ্ছিলেন। তবে যা কিছু করা হচ্ছে সবই মাম্পির ভালোর জন্য—এই বলে মনকে প্রবোধ দিচ্ছিলেন।

প্রমথেশের মনে খানিকটা আশঙ্কা যে ছিল না তা নয়। তবে তার চেয়ে বেশি হচ্ছিল কৌতূহল। তাঁর যুক্তিবাদী মন অবাক কৌতূহল নিয়ে বিচিত্র মানুষটার বিচিত্র কার্যকলাপ লক্ষ করছিল।

ইলেকটনিক পেন্ডুলাম ঘড়ির শব্দে অসুবিধে হবে বলে ঘড়ির ব্যাটারিগুলো খুলে রাখতে চেয়েছিলেন প্রিয়নাথ। তখন প্রমথেশ বলেছেন, তার দরকার নেই। কারণ, ঘড়ির ঘণ্টার শব্দটা লাইট অ্যাকটিভেটেড। ঘরের আলো জ্বললে ঘণ্টা বাজে, নইলে নয়।

ঝোলাব্যাগ হাতড়ে দুটো মোমবাতি বের করে ঘরের এক কোণে সে-দুটো জ্বেলে দিলেন প্রিয়নাথ। একটা খড়ির ডেলা বের করে টেবিলে একটা ত্রিভুজ এঁকে সেই ত্রিভুজের মাঝখানে একটা বড়সড় কড়ি বসিয়ে দিলেন। তারপর ঘরের সব আলো নিভিয়ে দিলেন।

আবছা আঁধারে চেয়ারে এসে বসলেন প্রিয়নাথ। ঝোলাব্যাগ থেকে একটা সরু টর্চ বের করে জ্বাললেন। জ্বলন্ত টর্চটা টেবিলে এমনভাবে রাখলেন যাতে আলোর বৃত্তটা সরাসরি নয়নপ্রভার মুখের ওপরে গিয়ে পড়ে। তারপর বিড়বিড় করে মন্ত্রের মতো কীসব আওড়াতে শুরু করলেন।

মন্ত্র পড়া শেষ হলে প্রিয়নাথ চাপা গলায় বললেন, 'স্টার্ট। আর কেউ কোনও কথা বলবেন না।'

অন্ধকারে প্রেতচক্র শুরু হল।

চুপচাপ বসে নয়নপ্রভাব কথা ভাবতে-ভাবতে সময়ের হিসেব যখন গুলিয়ে গেছে ঠিক তখনই একটা শব্দ হল। তারপর আবার...আবার।

টেবিলের ওপরে রাখা কড়িটা নড়ছে।

সবার কেমন শীত-শীত করে উঠল। প্রিয়নাথ থার্মোমিটারে না দেখেই বুঝলেন ঘরের উষ্ণতা কমছে। সেইসঙ্গে জানলা দিয়ে ঢুকে পড়া বাতাসও কেমন যেন উদ্দাম মাতাল হয়ে উঠল।

হঠাৎই মাম্পি কেঁদে উঠল।

প্রিয়নাথের বাঁদিকে বসেছিলেন মাধুরী। প্রিয়নাথ টের পেলেন, ওঁর হাত কেমন যেন শক্ত হয়ে গেছে।

আরও কয়েকবার কাঁদল মাম্পি। তারপর বড়দের মতো গলায় বলে উঠল, 'পিনু, তোরা কী চাস?'

প্রিয়নাথের ডানদিকে বসা প্রমথেশ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন। সেটা বুঝতে পেরে প্রিয়নাথ ওঁর হাতে চাপ দিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে টর্চটা নিভে গেল।

এতক্ষণ একটা আলোর আভা আবছাভাবে ঘরময় ছড়িয়ে ছিল। এখন সেই আলোকে ঝাঁট দিয়ে কেউ যেন জড়ো করে দিল মোমবাতিগুলোর কাছে।

প্রশ্নটা ভেসে এল আবার : 'তোরা কী চাস?'

এবার জবাব দিলেন ভূতনাথ, 'মাম্পিকে ফেরত চাই।'

'তুই কে?' মাম্পির গলায় যেন সন্দেহের বিষ ঝরে পড়ল।

'আমি ভূতনাথ। মাম্পিকে ফেরত নিতে এসেছি।' বজ্রস্বরে বললেন প্রিয়নাথ।

'আ-হা! আহ্লাদ!' ব্যঙ্গ করে উঠল কণ্ঠস্বর। তার পরই শুরু হল খলখল হাসি।

প্রিয়নাথ বিছানায় শোয়া মাম্পির দিকে দেখলেন। বাচ্চাটা নিথর হয়ে ঘুমোচ্ছে।

মাধুরী আর কান্না চাপতে পারছিলেন না। সাবিত্রী থরথর করে কাঁপছিলেন।

হাসি থামলে পর শোনা গেল : 'মাম্পিকে আমি ছাড়তে পারব না—ওর ওপর আমার মায়া পড়ে গেছে। মায়ার টান কি সহজে কাটানো যায়!'

আচমকা প্রিয়নাথ মাধুরী আর প্রমথেশের হাত ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। দু-হাত শূন্যে তুলে চিৎকার করে বললেন, 'মাম্পি মানুষ—আর তুই পিশাচ। পিশাচের আবার মায়ার টান কীসের! তোর টানে মাম্পি খতম হয়ে যাবে। মাম্পিকে তুই ছেড়ে দে!'

'আ-হা! ছেড়ে দে বললেই হল!' ব্যঙ্গের ধারালো টান ফুটে উঠল কণ্ঠস্বরে। তারপর একটু হেসে : 'পিনু, এই লোকটাকে বাড়ি থেকে বের করে দে!'

প্রমথেশ আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। কাতর গলায় বলে উঠলেন, 'মা, তোমার জন্যে আমরা শেষ হয়ে গেলাম...আমরা সব্বাই শেষ হয়ে গেলাম...।'

মাধুরী এবার জোরে কেঁদে উঠলেন।

'মায়ার টান রে, মায়ার টান! আমি কী করি বল!' প্রেত-কণ্ঠস্বর স্নেহ-মাখা গলায় বলল।

প্রিয়নাথ হাত-পা ছুড়ে প্রায় উন্মত্তের মতো লাফিয়ে উঠলেন। ওঁর শরীরের ধাক্কায় চেয়ারটা পিছনে উলটে পড়ে গেল। খোলা জানলা দিয়ে হাড়-কাঁপানো বাতাস ধেয়ে এল। ঘরের উষ্ণতা পলকে আরও কয়েক ডিগ্রি নেমে গেল।

প্রিয়নাথ ছুটে গেলেন বিছানার কাছে। সবাইকে অবাক ঘরে ঘুমন্ত মাম্পিকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নিলেন। তারপর ঘরের সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে বললেন, 'তোর মায়ার টানে ফুলের মতো এই শিশুটা দিনকে-দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। তুই ওকে ছেড়ে দে! ছাড়তে তোকে হবেই! নইলে তোর নিস্তার নেই!'

প্রিয়নাথের গর্জনে মাম্পির ঘুম ভাঙল না। তবে মাধুরী আর সাবিত্রী ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমন্ত মাম্পি খলখল করে হেসে উঠল। কানের ঠিক পাশেই হঠাৎ ওরকম হাসির শব্দ হওয়ার ভূতনাথ চমকে উঠলেন।

আর তখনই বটগাছের ঝুরির মতো অসংখ্য ধবধবে সাদা চুল নেমে এল ঘরের সিলিং থেকে। ঘূর্ণি বাতাসে শনের মতো সেই চুল এদিক-ওদিক উড়তে লাগল। কোথা থেকে এক অলৌকিক আলো ছড়িয়ে পড়ল ভেসে বেড়ানো সেই চুলের ওপরে। সেখানে রামধনুর সাত রং খেলে বেড়াতে লাগল।

চুলের তন্তুজালে প্রিয়নাথ দিশেহারা হয়ে পড়লেন। এক হাতে বাচ্চাটাকে আঁকড়ে রেখে অন্য হাতে মুখে-চোখে ঢলে পড়া সাদা চুলগুলো সরাতে চাইলেন।

মাধুরী, সাবিত্রী আর প্রমথেশ—ওঁরা তিনজনে তখন আতঙ্কে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছেন। অন্ধকারে চুলের মায়াজালে দিশেহারা হয়ে ওঁরা যেখানে-সেখানে ধাক্কা খেতে লাগলেন। মাধুরী আর সাবিত্রী ডুকরে কেঁদে উঠছিলেন বারবার। আর তারই মধ্যে মাম্পির নাম ধরে ডাকছিলেন।

প্রমথেশ দম-বন্ধ-করা গলায় ডেকে উঠলেন, 'মিস্টার জোয়ারদার! প্রিয়নাথবাবু!'

প্রিয়নাথ তখন রাগে পাগল হয়ে গেছেন। এক প্রেতের সঙ্গে এক প্রেতসিদ্ধের চ্যালেঞ্জ যেন চকমকি পাথরের ঠোকাঠুকি...তা থেকে বেরিয়ে আসছে আগুনের ফুলকি।

কয়েক লাফে প্রিয়নাথ ছিটকে চলে এলেন প্রেতচক্রের টেবিলের কাছে। মাম্পিকে টেবিলে শুইয়ে দিলেন। ঝোলাব্যাগ হাতড়ে বের করে নিলেন একটা মাঝারি মাপের ছুরি। তারপর সবাইকে হতবাক করে দিয়ে বাঁ-হাতে মাম্পির চুলের মুঠি ধরে ছুরিটা ছোঁয়ালেন ওর গলায় কাছে।

হিংস্র বাঘের মতো গর্জন করে উঠলেন প্রিয়নাথ, 'তুই যখন ওকে ছাড়বি না, তখন আমিই ওকে শেষ করে দেব!'

মাধুরী ছুটে এলেন প্রিয়নাথের কাছে। কাঁদতে-কাঁদতে ওঁর হাত চেপে ধরতে চাইলেন।

প্রিয়নাথ এক ঝটকায় ছিটকে ফেল দিলেন মাধুরীকে। ভয়ংকর গলায় চিৎকার করে উঠলেন, 'তোর হাতে তিলতিল করে মরার চেয়ে এ অনেক ভালো। এই দ্যাখ, তোর আদরের মাম্পিকে আমি খতম করে দিচ্ছি!'

মাম্পি এতক্ষণ অসাড়-অচেতন ছিল। হঠাৎই ওর মুখ দিয়ে কান্নার শব্দ বেরিয়ে এল।

প্রেত কণ্ঠস্বর কাঁদছে।

'না! না! ওকে মারিস না। আমি ওকে বড় ভালোবাসি...ওকে মারিস না...।'

তুই যদি সত্যিই ওকে ভালোবাসিস তা হলে এই মুহূর্তে ওকে ছেড়ে দে! তোর মায়ার টানে ও শেষ হয়ে যাচ্ছে...।'

ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কান্না শোনা গেল। সাত রঙের আঙায় রঙিন চুলের ঢল ভেসে বেড়াতে লাগল ঘরের বাতাসে। বাতাস আরও কয়েক গুণ হিম হয়ে গেল যেন।

ইনিয়েবিনিয়ে কান্নার মাঝেই শোনা গেল : 'আমি চলে যাচ্ছি...আমি চলে যাচ্ছি...।'

আর ঠিক তখনই নয়নপ্রভাব বাঁধানো ফটোটা টেবিল থেকে পড়ে গেল মেঝেতে। ঝনঝন শব্দে কাচ ভেঙে গেল।

সাবিত্রী চিৎকার করে উঠেই টাল খেয়ে পড়ে গেলেন। বোধহয় অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

প্রিয়নাথ লক্ষ করলেন, চুলের ঢল ক্রমে আবছা হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। ঘরের উষ্ণতা বেড়ে উঠেছে আবার।

ঘরের দরজায় কারা যেন ধাক্কা দিচ্ছিল, কিন্তু সে-শব্দ এতক্ষণ কারও কানে যায়নি।

মাম্পি হঠাৎই যেন ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠল। তবে এ-কান্না কোনও বাচ্চার স্বাভাবিক কান্না।

প্রিয়নাথ ছুরিটা ফেলে দিলেন। মাম্পিকে তুলে নিয়ে মাধুরীর কোলে দিলেন।

মোমবাতির অদ্ভুত আলোয় ওঁদের ছায়া-শরীরগুলো নড়ে বেড়াচ্ছিল।

মাধুরী মেয়েকে বুকে জড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। মাম্পিকে তিনি অনেক আদরের কথা বলছিলেন কিন্তু কান্না মিশে গিয়ে কথাগুলো কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

অবসন্ন ভূতনাথ ঘরের মেঝেতে বসে পড়লেন। ক্লান্ত ভাঙা গলায় বললেন, 'প্রমথেশবাবু, আলো জ্বেলে দিন। আর দরজাটা খুলে দিন। আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে...।'

হতভম্ব প্রমথেশ শিথিলভাবে হেঁটে গেলেন আলোর সুইচের কাছে।

তিনি আলো জ্বালতেই প্রিয়নাথের চোখ গেল মেঝেতে পড়ে-থাকা নয়নপ্রভার ছবির দিকে। সেটা দেখিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, 'এ-ছবিটা নষ্ট করে ফেলবেন। ওঁর কোনও ছবি বাড়িতে না রাখাই ভালো। আশা করি মাম্পিকে আর কখনও উনি বিরক্ত করবেন না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রিয়নাথ। ক্লান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ালেন। বিড়বিড় করে আবার বললেন, 'আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে...।'





# সামান্য কুয়াশা ছিল

আগাম কোনও খবর না দিয়েই বর্ষা এবার সময়ের আগেই হাজির। আর শুধু হাজির নয়, ইনিংসের প্রথম বল থেকেই একেবারে ঝোড়ো ইনিংস খেলতে শুরু করেছে। যেমনই বৃষ্টির জোর তেমনই হাওয়ার দাপট। শুরুতে অবশ্য এতটা বোঝা যায়নি। বিকেল পড়ে আসার আগেই সুপ্রকাশ পালিতের বৈঠকখানায় সকলে এসে পড়েছেন—জগৎ শ্রীমানী, বরেন মল্লিক, বিজন সরকার আর প্রিয়নাথ জোয়ারদার। আজ ওঁরা অন্যদিনের তুলনায় একটু তাড়াতাড়ি এসেছেন। কারণ, আজ শোকসভা। ওঁরা এসে পৌঁছনোর কিছুটা পরে শুরু হয়েছে ঝড় আর বৃষ্টির ঘটা।

ওঁরা পাঁচজন নীচু গলায় কথা বলছিলেন। ওঁদের কথাবার্তায় কেমন যেন একটা বিষণ্ণ সুর মাখানো ছিল। আর একইসঙ্গে সদ্য-চলে-যাওয়া মানুষটার নানান স্মৃতি ওঁদের মনে অস্থিরভাবে উঁকিঝুঁকি মারছিল।

তিনদিন আগে এ-পাড়ার ডাকসাইটে উকিল বাসুদেব ভদ্র হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন। ওঁর বয়েস হয়েছিল প্রায় সত্তর বছর। কিন্তু শরীর জবরদস্ত ছিল। রোজ ভোর পাঁচটায় শিরদাঁড়া টান-টান করে হেঁটে গঙ্গাস্নানে যেতেন। ওকালতিতে অসম্ভব দাপট ছিল, জজসাহেবরাও তটস্থ হয়ে থাকতেন। বাসুদেববাবুর সঙ্গে পাড়ার অনেকেরই হৃদ্যতা ছিল। ওঁর আচমকা চলে যাওয়ায় অনেকেই কম-বেশি ধাক্কা খেয়েছেন। কেউ-কেউ আবার যেন ভগবানের অদৃশ্য নোটিশ দেখতে পেয়েছেন।

সুপ্রকাশ পালিতের সঙ্গে বাসুদেব ভদ্রর বয়েসের তফাত থাকলেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা ছিল। তা ছাড়া সুপ্রকাশবাবুদের রাঁচির জমিজমা ইত্যাদি নিয়ে বাসুদেববাবু মামলাও লড়েছিলেন। সেইজন্যই সুপ্রকাশবাবু নিজে উদ্যোগ নিয়ে সবাইকে খবর দিয়ে একটা ঘরোয়া স্মরণসভা গোছের আয়োজন করেছেন।

সুপ্রকাশ বাসুদেব ভদ্র সম্পর্কে নানা কথা বলছিলেন। অন্য চারজন একমনে ওঁর কথা শুনছিলেন। মাঝে-মাঝে সুপ্রকাশ থামলে অন্যরা নিজেদের দু-একটা মন্তব্য করছিলেন।

বরেন মল্লিক বললেন, 'বাসুদেবদা খুব মিশুকে ছিলেন। আমার লন্ড্রিতে যখনই যেতেন প্রাণ খুলে গল্প করতেন।'

বৈঠকখানার একটা জানলা খোলা ছিল। সেটা দিয়ে ঠিক টিভির সিনেমার মতো বাইরের ঝড়বৃষ্টি দেখা যাচ্ছিল। ঝোড়ো বাতাস হঠাৎই বেশ বেড়ে গেল। শনশন হাওয়া কাটার শব্দ উঠল বাইরে। জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছাট ভেতরে ঢুকে পড়ছিল। সেটা লক্ষ করে সুপ্রকাশ পালিত বিজন সরকারকে বললেন, 'জানলাটা একটু বন্ধ করে দিন না...।'

বিজন সরকার এ-পাড়ার শান্তি কমিটির সেক্রেটারি। বেশিরভাগ সময়েই খোশমেজাজে থাকেন। তবে এখন নিষ্প্রভ মুখে বসে আছেন।

সুপ্রকাশ পালিতের কথায় হাত বাড়িয়ে জানলার পাল্লা দুটো ভেতর থেকে এঁটে দিলেন। তারপর নীচু গলায় বললেন, 'ভদ্রবাবুর পদবির সঙ্গে তাঁর ক্যারেক্টারের দারুণ মিল ছিল। পাড়ার ব্যাপারে কখনও আমাকে খালি হাতে ফেরাননি।'

হঠাৎই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জগৎ শ্রীমানী বললেন, 'বাসুদেবটা মারা যাওয়ার সময়েও ওকালতি প্যাঁচ কষে গেল...।'

সকলে অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকাতেই তিনি যোগ করলেন, '...আমাকে সমন ধরিয়ে দিয়ে গেল। জানিয়ে দিল, আমার ওভারটাইম চলছে।'

'না, না—ও-কথা বলছেন কেন!' সুপ্রকাশ পালিত সামাল দেওয়ার সুরে জগৎবাবুকে লক্ষ্য করে বললেন। তারপর কাচের শার্সি-আঁটা জানলার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে যোগ করলেন, 'এরকম জোর বর্ষা এবারে এই প্রথম নামল। চার-ছ'ঘণ্টার মধ্যে থামবে বলে মনে হয় না।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সুপ্রকাশ। শার্সির গা বেয়ে জলের ফোঁটা গড়িয়ে নামছিল। সেই রেখার দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'আমাদের জীবনটাও যেন কাচের গায়ে জলের রেখার মতন। মাধ্যাকর্ষণের মতো কোনও একটা টানে কিছুক্ষণ এঁকেবেঁকে এগিয়ে চলা। তারপর-তারপর সব শেষ। কী বলো, ভূতনাথ?'

প্রিয়নাথ ভীষণ চুপচাপ ছিলেন। সকলের কথা যেন শুনছিলেন, অথচ শুনছিলেন না। ওঁর চশমার কাচে আলো পড়ে চকচক করছিল। চশমার গাঢ় রঙের মোটা ফ্রেমের সঙ্গে ভুরু জোড়া যেন মিশে গেছে। তার ওপরে কয়েকটা ছোট-বড় ভাঁজ স্পষ্ট নজরে পড়ছে।

অনেকক্ষণ ধরে সিগারেট খেতে পারেননি বলে প্রিয়নাথের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল, মুখের ভেতরটা কেমন বিস্বাদ লাগছিল। তিনি আপনমনে চুপচাপ বসে বাসুদেব ভদ্রর কথা ভাবছিলেন। সুপ্রকাশের শেষ কথাটার খেই ধরে ঠোঁটের কোণে দুর্জ্ঞেয় হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'মৃতেরা ছুটি নিয়ে বেড়াতে এলে সেটাকে বলা হয় জীবন। বেঁচে থাকা মানে স্বপ্ন দেখা—ঘুম ভাঙলেই মৃত্যু। বাসুদেববাবুর স্বপ্নটা বেশ লম্বা ছিল। নাকি বলব ছুটিটা বেশ লম্বা ছিল...।'

প্রিয়নাথের কথা শুনে সকলেই কেমন চুপ করে গেলেন। প্রিয়নাথ মৃত্যু নিয়ে এত ভাবেন! মৃত্যুকে যেন ওঁরা নতুনভাবে অনুভব করতে পারছিলেন। সুপ্রকাশ পালিত কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজলেন। ঘরের পরিবেশ যেন অনুভব করতে চাইলেন।

ওঁরা সকলে তক্তপোশের ওপরে বসে ছিলেন। তার কাছাকাছি ছিল একটা হাতলওয়ালা বড় চেয়ার। চেয়ারের রং পালিশ কিছু বোঝার উপায় নেই। তার ওপরে ধূপদানিতে কয়েকটা ধূপ জ্বলছিল। সেই ধূপের গন্ধে ঘরের ভেতরে স্মৃতিচারণের আবহাওয়া তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বাসুদেব ভদ্র সম্পর্কে ওঁরা যাঁর-যাঁর মতন করে দু-চার কথা বলছিলেন। প্রিয়নাথ চুপ করে ওঁদের কথা শুনতে লাগলেন।

প্রিয়নাথের মনে হল, ধূপের গন্ধের সঙ্গে প্রথম বৃষ্টির গন্ধ মিশে গিয়ে ঘরের ভেতরে কেমন এক অলৌকিক আমেজ তৈরি হয়ে গেছে। তিনি ঘরের দেওয়ালে টাঙানো অ্যানসনিয়া পেন্ডুলাম-ঘড়িটার দিকে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে তাকিয়ে রইলেন।

হঠাৎই প্রিয়নাথ বললেন, 'আপনারা বাসুদেববাবু সম্পর্কে নানা কথা বললেন। আমার সঙ্গে ওঁর তেমন কিছু ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তবে আমার ভূত-প্রেতের নেশার কথা তিনি জানতেন। তাই একদিন নিজের বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা অদ্ভুত কাহিনি শুনিয়েছিলেন—শুনলে বিশ্বাস হবে না এমন কাহিনি...।'

এমন সময় একজন মাঝবয়েসি লোক ঘরে ঢুকল। পরনে ধুতি আর হাতাওয়ালা গেঞ্জি। হাতে শৌখিন ট্রে। তাতে সাজানো চা আর বিস্কুট।

সুপ্রকাশ লোকটিকে ডেকে বললেন, 'আয়, নিরঞ্জন। সকলের হাতে-হাতে দিয়ে দে।'

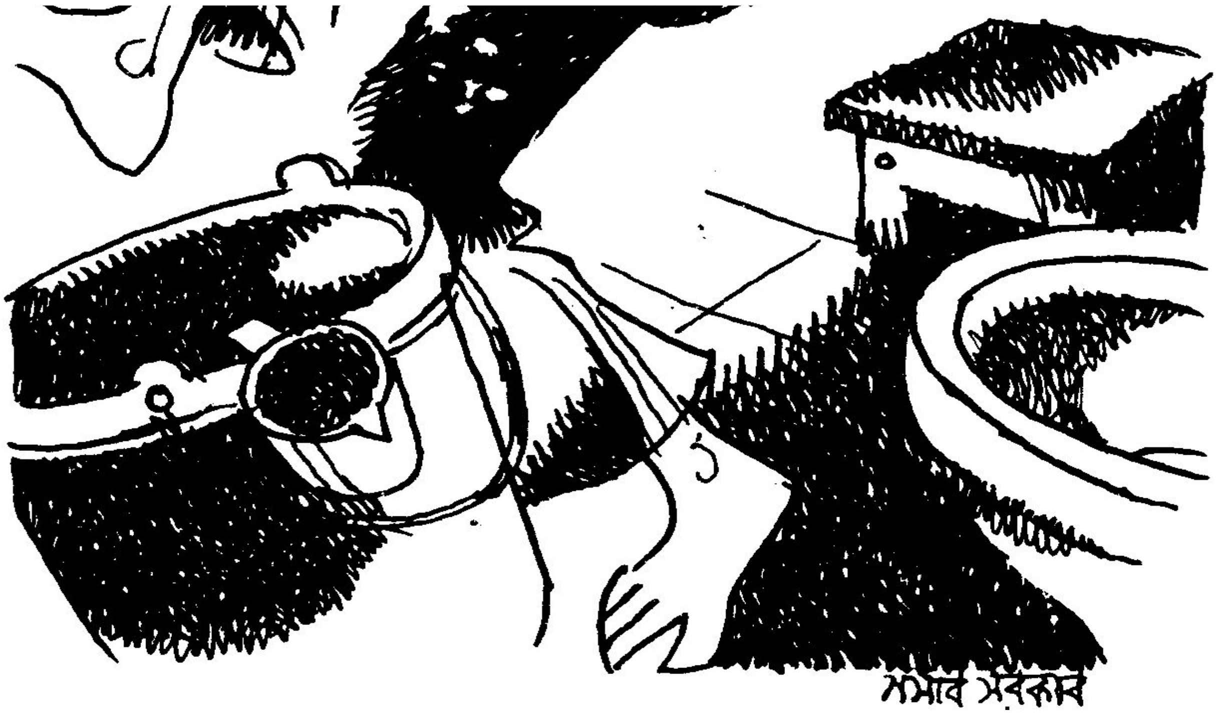
নিরঞ্জন প্রত্যেকের হাতে চায়ের কাপ-প্লেট তুলে দিল। বিস্কুটের প্লেটটা নামিয়ে রাখল সকলের হাতের নাগালে। তারপর ধীরে ধীরে পা ফেলে চলে গেল।

পেন্ডুলাম-ঘড়িতে আটটার ঘণ্টা বাজল।

চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়ে প্রিয়নাথ নীচু গলায় বললেন, 'বাসুদেববাবু ওকালতিতে হাতেখড়ি দেওয়ার আগে বছরখানেক নানা পেশায় যুক্ত ছিলেন। খাতা লেখার কাজ করেছেন, ওষুধের সেলসম্যান ছিলেন, হোটেলের ম্যানেজারি করেছেন, শাড়ির দোকানে চাকরি করেছেন। খানিকটা অস্থির মতির জন্যেই বোধহয় কোনও কাজেই টিকে থাকতে পারেননি। তারপর বাড়ির চাপে, আর ওঁর বাবার বকুনি খেয়ে ল' পড়তে ঢোকেন। ব্যস, ওঁর জীবনটা একটা পথ পেয়ে গেল।

'যে-ঘটনাটার কথা বাসুদেববাবু বলেছিলেন সেটা একটা ছোটখাটো হোটেলকে নিয়ে। তিনি তখন সেই হোটেলের ম্যানেজার ছিলেন...।'






বাসুদেবের বারবার হাই উঠছিল। এই ভয়ঙ্কর শীতে বারবার হাই তোলা মানে হিম-বাতাস বুকের ভেতরে টেনে নেওয়া। কিন্তু উপায় কী। কাউন্টার থেকে পাতাতাড়ি গুটিয়ে যে সরে পড়বেন তার উপায় নেই। ঠিক রাত এগারোটায় মালিকের ফোন আসবে। উনি দেখতে চান কাঁটায়-কাঁটায় রাত এগারোটা পর্যন্ত তাঁর হোটেল খোলা আছে কি না। বাসুদেবকে যে চোদ্দোশো টাকা মাস-মাইনে দেন, তার পাইপয়সা পর্যন্ত কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নেন। কিন্তু কাস্টমার কোথায়! খোলা দরজা দিয়ে শুধু অন্ধকার রাত আর শীতের হালকা কুয়াশা চোখে পড়ছে।

আর কখনও-কখনও দিল্লি রোড ধরে ছুটে যাওয়া ট্রাকের ঘোলাটে হেডলাইট।

যে-রাস্তাটা দিল্লি রোড থেকে ডানকুনির দিকে ঘুরে গেছে তারই বাঁকে দাঁড়িয়ে আছে বাসুদেবের হোটেল। দোতলা হোটেলটা যে অত্যন্ত কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তার জরাজীর্ণ চেহারার দিকে তাকালেই স্পন্ডিলাইটিসের পেশেন্ট বলে মনে হয়। হোটেলের পলেস্তারা থেকে শুরু করে জল-কল-আলোর ব্যবস্থা পর্যন্ত সবই নড়বড়ে অগোছালো।

হোটেলটার নাম 'দ্য হোস্ট'। সদর দরজায় তেরছা হয়ে থাকা রং-চটা একটা সাইনবোর্ডে ইংরেজি হরফে নামটা লেখা আছে। এ-হোটেলের ম্যানেজারিতে জয়েন করার পর থেকেই বাসুদেবের বারবার সাধ হয়েছে, হোটেলের নামের আগে একটা 'জি' হরফ বসিয়ে 'দ্য গোস্ট' করে দেন। বেকার জীবনের টানাপোড়েন ঘোচাতে কপাল ঠুকে এখানে কাজে লেগে গেছেন বটে, কিন্তু এখানে কাজ বলতে তেমন কিছু নেই। সারাদিন শুধু পালিশ-চটা কাউন্টারে বসে থাকো আর রাস্তার গাড়ি গোনো। আর মাঝে-মাঝে সাতকাজের ফরমাশের লোক এবং রাঁধুনি পঞ্চাননকে ডেকে একটু তম্বি করো।

বাসুদেব আরশোলাকে যথেষ্ট ভয় পান। কেন তিনি জানেন না। এ অনেকটা যেন মন্ত্রশক্তির মতো। যারা আরশোলা ভয় পায়, তারা জানে না কেন। আর, যারা ভয় পায় না, তারাও জানে না তার কারণ কী। এ-হোটেলে সুপ্রচুর আরশোলা আছে—নানা মাপের, নানা ধরনের। ফলে বাসুদেব আর পঞ্চানন বেশ ভয়ে-ভয়ে দিন কাটান। এবং রাতও।

হোটেলের মালিকের নাম হরেকৃষ্ণ মণ্ডল। জঘন্যরকম বড়লোক। তবে নানান কুসংস্কারে ভোগেন। আর ধর্ম-কর্ম নিয়ে থাকেন। অন্তত বাইরে থেকে দেখে তাই মনে হয়।

'দ্য হোস্ট'-এ হরেকৃষ্ণবাবু মাসে মাত্র একবার আসেন। হিসেবপত্র বুঝে নিয়ে চলে যান। তাঁর অন্যান্য আরও জমকালো ব্যবসা আছে। সেগুলো নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। তবে তাঁর নিয়মের এতটুকু নড়চড় হওয়ার জো নেই।

যেমন, ঢুকে থেকেই বাসুদেব দেখছেন এ-হোটেলে একটা নিয়ম চালু আছে। হোটেল কখনও ফাঁকা রাখা চলবে না—কমসে কম খাতায়-কলমে। অর্থাৎ, সব ঘর ফাঁকা থাকলেও অন্তত দুটো ঘর ভরতি বলে সবসময় দেখাতে হবে। কারণ, হোটেলে কোনও বোর্ডার যদি এসে দ্যাখে সব ঘরই ফাঁকা, তা হলে সে হয়তো ঘাবড়ে গিয়ে এ-হোটেলে আর উঠবে না। অন্য কোনও হোটেল খুঁজবে।

যুক্তিহীন কুসংস্কার। কিন্তু কোনও উপায় নেই।

সেই কারণেই হরেকৃষ্ণবাবুর ঠিক করে দেওয়া দুটো কাল্পনিক নাম-ঠিকানা সবসময় হোটেল-রেজিস্টারে লেখা থাকে। অরিন্দম পোদ্দার, পাদরীপাড়া, চন্দননগর, হুগলি। আর কালাচাঁদ নস্কর, ব্রহ্মপুর, গড়িয়া। প্রথমজনকে আপাতত রাখা হয়েছে রুম নম্বর বারোয়—দোতলার দ্বিতীয় ঘরে। আর কালাচাঁদ নস্কর আছেন তেরো নম্বর ঘরে। অর্থাৎ দোতলার তিন নম্বর ঘরে।

হোটেলে মোট সাতটা ঘর। একতলায় তিনটে, দোতলায় চারটে। তার মধ্যে একটা সিঙ্গল, বাকিগুলো ডাবল-বেড-এর ঘর। একতলার সিঙ্গলটায় বাসুদেবের থাকার কথা। তাই-ই থাকেন। তবে বেশিরভাগ সময়েই ঘর ফাঁকা থাকে বলে দোতলার চার নম্বর ঘরটায় তিনি রাত কাটান। ওই ঘরটায় দুটো জানলা বেশি আছে। হাওয়া-বাতাস ঠিকমতো খেলতে পারে। আর আরশোলার ভয় কম।

বাসুদেব শীতকাতুরে মানুষ। উলিকটের গেঞ্জি, ফুলহাতা সোয়েটার, মাফলার ইত্যাদি চড়িয়েও ওঁর শীত যাচ্ছিল না। তার ওপরে ঘুমে চোখ বুজে আসতে চাইছিল। বারবার রিসেপশনের দেওয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকাচ্ছিলেন। এগারোটা বাজতে এখনও মিনিট পনেরো মতন বাকি। পঞ্চানন বোধহয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ওর জন্য সিঁড়ির নীচের একটা খুপরি বরাদ্দ করা আছে। একটু আগেই ও বলে গেছে, বাসুদেবের রাতের খাবার ঘরে ঢাকা দেওয়া আছে।

সুতরাং শীত এবং একঘেয়েমিতে ক্লান্ত বাসুদেব দেওয়াল-ঘড়ির মিনিটের কাঁটার সঙ্গে হাত ধরে হাঁটছিলেন। কতক্ষণে ওটা বারোটার দাগে পৌঁছবে?

ঠিক তখনই ওরা এল।

খোলা দরজার ফ্রেমে কালো অন্ধকারের পটভূমিতে ঠিক ছবির মতো দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুরুষ ও একজন মহিলাকে দেখতে পেলেন বাসুদেব। দেখে খানিকটা চমকে উঠলেন। ওরা যেন আচমকা হাজির হয়েছে দরজায়। কারণ, বাসুদেব ওদের হেঁটে আসতে দেখেননি। কখন কোথা দিয়ে দরজার কাছে চলে এল ওরা!

সামান্য কুয়াশা গায়ে মেখে পুরুষ ও মহিলাটি ভেতরে ঢুকল। খানিকটা যেন ছন্দে পা ফেলে চলে এল কাউন্টারের সামনে—বাসুদেবের খুব কাছে। বাসুদেব উগ্র পারফিউমের গন্ধ পেলেন।

ওদের দেখে বাসুদেবের কেমন যেন সন্দেহ হল। ওরা কি অবিবাহিত দম্পতি? এ-হোটেলে রাত কাটাতে এসেছে? কিন্তু ওদের পোশাক-আশাক ভারী অদ্ভুত।

পুরুষটির বয়েস তিরিশের এপিঠ-ওপিঠ। ইয়োরোপীয় ধাঁচের কাটা-কাটা মুখ। চওড়া কাঁধ। চোখ ছোট-ছোট, কিন্তু চাউনি যেন বর্শার ফলা। মাথার চুল তেল-চকচকে। টান-টান করে পিছনদিকে আঁচড়ানো। দাড়ি-গোঁফ কামানো তামাটে মুখে কেমন যেন ফ্যাকাসে ভাব। আর চোয়ালের হাড় সামান্য উঁচু হয়ে থাকায় মুখে একটা নিষ্ঠুর ভাব ফুটে উঠেছে।

সঙ্গের মেয়েটির বয়েস পঁচিশ কি ছাব্বিশ। ফরসা, রোগা, ছোটখাটো চেহারা। এলানো চুল। চোখের পালক অস্বাভাবিকরকম দীর্ঘ। গালে হালকা লালচে ভাব। কপালে বড় টিপ।

পুরুষটির গায়ে চেক-চেক ফুল-হাতা শার্ট, তার ওপরে একটা সাধারণ হাত-কাটা সোয়েটার। আর মেয়েটি সিল্কের শাড়ির ওপরে একটা মামুলি শাল জড়িয়ে রেখেছে।

এই ভয়ংকর হাড়কাঁপানো শীতে এইরকম সাধারণ শীতের পোশাক পরে কী করে এরা চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে? এই প্রশ্নটাই বাসুদেবের মনে প্রথম দেখা দিল।

ওদের মুখ এতই স্বাভাবিক যে, মনেই হচ্ছে না প্রচণ্ড ঠান্ডায় ওদের এতটুকুও কষ্ট হচ্ছে। যদি ওরা 'দ্য গোস্ট'-এ উঠে এক-দু-দিন ফুর্তি করতে চায় তো করুক। মনে-মনে ভাবলেন বাসুদেব। এরকম অনেক জোড়া পায়রাই এখানে রাত কাটাতে আসে। অত বাছবিচার করতে গেলে বিজনেস চলে না। হরেকৃষ্ণ মণ্ডল প্রথমেই বাসুদেবকে এ-কথা জানিয়ে দিয়েছেন। শুধু কোনওরকম গোলমাল হুজ্জুতি না হলেই হল।

পুরুষটির প্রথম প্রশ্নে বাসুদেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ওঁর বুকের ভেতরে ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। গলা শুকিয়ে জিভটা গিরগিটির চামড়া হয়ে গেল পলকে।

'অরিন্দম পোদ্দার নামে কেউ এ-হোটেলে এসে উঠেছে?' ঠান্ডা গলায় জানতে চাইল পুরুষটি।

বাসুদেবের মাথা গুলিয়ে গেল। হোটেলের খাতায় গত তিন মাস ধরেই তো এই ভুয়ো নামটা লেখা রয়েছে! এর আগেও বহু বছর ধরে হরেকৃষ্ণ মণ্ডল হয়তো এই নামটা চালিয়েছেন। কিন্তু কোনওদিন কেউ এই কাল্পনিক বোর্ডারের খোঁজ করতে আসবে এ-কথা বাসুদেব কখনও আঁচ করতে পারেননি। এখন কী জবাব দেবেন এই প্রশ্নের?

'খাতা দেখে জলদি বলুন।' প্রায় ধমক দিয়ে উঠল পুরুষটি, 'অরিন্দম পোদ্দার নামে কেউ উঠেছে কি না দেখুন—।'

সব জেনেশুনেও খাতা খুললেন বাসুদেব। তিনি বলতেই পারতেন, 'আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই।' কিন্তু পুরুষটির চেহারা এবং গলায় এমন একটা কিছু ছিল যে, বাসুদেব কেমন যেন ভয় পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন। ওঁর মনের কোণে একটুকরো সন্দেহ উঁকিঝুঁকি দিল : এরা পুলিশের লোক নয় তো!

খাতা খুলে খুঁটিয়ে দেখার ভান করে বাসুদেব বললেন, 'হ্যাঁ—আছেন। দোতলার বারো নম্বর রুমে।'

পুরুষটি মেয়েটির দিকে তাকাল। অদ্ভুতভাবে হাসল। উত্তরে মেয়েটিও সামান্য হাসল। যেন কোনও গোপন ইশারা চালাচালি হল দুজনের ভেতরে।

এমন সময় ফোন বেজে উঠল।

রিসিভার তুললেন বাসুদেব। হরেকৃষ্ণ মণ্ডলের ফোন।

ওরা দু-জন তীব্র চোখে বাসুদেবকে দেখছিল। বাসুদেব কোনওরকমে 'হুঁ-হাঁ' বলে ফোনে কথা শেষ করলেন।

রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গে দেওয়াল-ঘড়িতে এগারোটার ঘণ্টা বাজতে শুরু করল।

ঘণ্টা বাজার শব্দ শেষ হলে পুরুষটি নীচু গলায় বলল, 'আমরা পুলিশের লোক। কাউকে এ-কথা জানাবেন না। আমরা অরিন্দম পোদ্দারকে একটা ক্রাইমের ব্যাপারে অ্যারেস্ট করতে এসেছি।'

বাসুদেব ফ্যালফ্যাল চোখে পুরুষটির দিকে তাকিয়ে ওর কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ওঁর মগজে কথাগুলো ঠিকমতো পৌঁছোচ্ছিল না। কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

'আজ রাতটা আপনার হোটেলে আমরা থাকব। আমাদের নাম-ধাম খাতায় লিখে নিন। সবাই জানবে আমরা অর্ডিনারি বোর্ডার।'

'সবাই' বলতে তো শুধু পঞ্চানন! আর খাতায় নাম-ধাম লিখলে তো মালিককে পয়সার হিসেব দিতে হবে! বাসুদেব মনে-মনে ভাবলেন।

পুরুষটির যেন বাসুদেবের মনের কথা বুঝতে পারল। পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে বাসুদেবের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'অরিন্দম পোদ্দারের পাশের ঘরটাই আমাদের দেবেন। তা হলে আমাদের কাজের সুবিধে হবে।'

বাসুদেব টাকাটা নিয়ে ড্রয়ারে রাখলেন। ব্যালান্সটা ফেরত দেওয়ার জন্য ড্রয়ার হাতড়াচ্ছিলেন, পুরুষটি বলল, 'বাকিটা রেখে দিন। বয়-বেয়ারাদের বকশিশ দিয়ে দেবেন।'

বাসুদেব খাতার সঙ্গে সুতলি দিয়ে বাঁধা ডট পেনটা বাগিয়ে ধরে ওদের নাম জানতে চাইলেন।

পুরুষটি হেসে বলল, 'আমার নাম কালাচাঁদ নস্কর, আর ওর নাম লিখুন রীতা...রীতা নস্করই লিখুন। তা হলে সবাই হাজব্যান্ড-ওয়াইফ ভাববে।'

বাসুদেব লিখবেন কী! ওঁর হাতে ধরা কলমটা তখন বরফের কলম হয়ে গেছে। চোখের সামনে গোটা দুনিয়াটা যেন টলে উঠল। পাছে মাথা ঘুরে পড়ে যান, তাই বাঁ-হাতে কাউন্টারটা শক্ত করে চেপে ধরলেন।

নামটা তিনি ঠিক-ঠিক শুনেছেন তো! কালাচাঁদ নস্কর! খাতার দ্বিতীয় কাল্পনিক মানুষটা জ্যান্ত হয়ে চোখের সামনে দেখা দিয়েছে! আজ কি মঘা, নাকি ভূত চতুর্দশী? বাসুদেবের কেমন পাগল-পাগল লাগছিল।

'লিখুন—' তাড়া দিল পুরুষটি, 'কালাচাঁদ নস্কর, রীতা নস্কর। আর ঠিকানা যা-হোক কিছু একটা বানিয়ে-টানিয়ে লিখে দিন। তবে অরিন্দমের পাশের ঘরটাই চাই কিন্তু।'

অতি কষ্টে বাসুদেব লিখতে পারলেন। খাতায় লেখা কালাচাঁদ নস্করের নামের নীচে রীতা নস্কর লিখে দিলেন। তবে সই করার জন্য খাতাটা ওদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন না। কারণ, কালাচাঁদ নস্করের কাল্পনিক সইটা আগে থেকেই করা রয়েছে।

কিন্তু কালাচাঁদ এবং রীতা উলটো দিকে দাঁড়িয়েও ব্যাপারটা বোধহয় বুঝতে পেরেছিল। কারণ ওরা দুজনেই কেমন ঠোঁট টিপে হাসছিল।

'তেরো নম্বর ঘরটা আপনাদের দিলাম।' কোনওরকমে বলতে পারলেন বাসুদেব, 'আপনারা কি ডিনার করবেন? তা হলে কাছেই একটা ভালো ধাবা আছে—সারা রাত খোলা থাকে। ওখান থেকে খাবার আনিয়ে দেব। আমাদের এখানে খাবারের কোনও ব্যবস্থা নেই।'

রীতা সাততাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'না, না—আমরা ডিনার সেরে এসেছি।'

পারফিউমের গন্ধে বাসুদেবের মাথা ঝিমঝিম করছিল। খাতা-পেন একপাশে গুছিয়ে রেখে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। হাত বাড়িয়ে দেওয়ালের কীবোর্ড থেকে তেরো নম্বর রুমের চাবিটা পেড়ে নিলেন। পঞ্চানন নিশ্চয়ই এতক্ষণে নাক ডাকা শুরু করে দিয়েছে। ওকে বিরক্ত করে আর লাভ নেই। সুতরাং বাসুদেব কাউন্টারের পিছন থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। হোটেলের সদর দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিয়ে বাইরের আলোটা নিভিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'চলুন, আমিই আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিই। আমাদের বেয়ারাটা ঘুমিয়ে পড়েছে।'

ওদের নিয়ে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে রওনা হতে যাবেন, ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ব্যাপার বাসুদেবের নজরে পড়ল।

রিসেপশনের আলোটা তেমন জোরালো নয়। একটি মাত্র টিউব লাইট—তার আবার একটা দিক কালচে হয়ে গেছে। কিন্তু তার সত্ত্বেও বাসুদেবের দেখতে ভুল হল না।

রীতা বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে কালাচাঁদকে কিছু একটা বলছিল। ফলে বাসুদেব ওর মুখের ডানপাশটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। রীতার কানের ওপর থেকে চুল সরে গেছে একপাশে। তাই কানের গহ্বরটা সরাসরি নজরে পড়ছে। সেই গহ্বরের মুখে ছোট মাপের একটা মাকড়সার জাল। যেন কোনও গুহার মুখ আগলে মাকড়সার জালটা তৈরি হয়েছে।

এবং সেই জালের কেন্দ্রবিন্দুতে একটা খুদে মাকড়সা সামান্য নড়াচড়া করছে।

বাসুদেব কেন যে ভয় পেলেন তা বুঝতে পারলেন না। কল্পনায় কানের গহ্বরটাকে তিনি ধূলিমলিন কোনও প্রাচীন সুড়ঙ্গ বলে ভাবছিলেন। মাকড়সার জাল ছিঁড়ে তার ভেতরে মনে-মনে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি। অজানা ভয়ংকর কিছু আবিষ্কারের ভয়ে বারবার কেঁপে-কেঁপে উঠছিলেন।

রীতা মাথা ঝাঁকাল। ওর চুল ঝটকা মেরে সরে এল কানের ওপরে। মাকড়সার জালটা ঢাকা পড়ে গেল। কিন্তু বিচিত্র এক আতঙ্ক বাসুদেবের হৃৎপিণ্ডটাকে আঠালো কাগজের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রইল।

হোটেলের ফাঁকফোকর দিয়ে কুয়াশা আর শীত পা টিপে-টিপে ঢুকে পড়ছিল। বাসুদেব হঠাৎই শিউরে উঠলেন।

সেটা লক্ষ করে কালাচাঁদ বলল, 'কী হল, মশাই। এই শীতেই কাবু হয়ে পড়ছেন! আমাদের ওখানে গেলে বুঝতেন ঠান্ডা কাকে বলে!'

রীতার সঙ্গে চোখাচোখি হল কালাচাঁদের। ওরা দুজনে একইসঙ্গে হেসে উঠল। হাসির দমকে ওদের ছিপছিপে শরীর দুটো সাপের মতো এঁকেবেঁকে যাচ্ছিল।

'আমাদের ওখানে' মানে! বাসুদেব কালাচাঁদের কথাটার মানে বুঝতে চাইলেন। কিন্তু কী ভেবে ওদের আর কিছু জিগ্যেস করলেন না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে রীতা জানতে চাইল, 'অরিন্দম পোদ্দার কবে এখানে এসে উঠেছে?'

'পরশুদিন...সন্ধেবেলা...।' বাসুদেব মরিয়া হয়ে গল্প তৈরি করছিলেন। যা মনে আসে তাই বলছিলেন।

'ওর সঙ্গে কেউ দেখা করতে এসেছিল?'

'না।'

এবার কালাচাঁদ নস্কর বলল, 'অরিন্দম পোদ্দারকে দেখে কি আপনার মনে হয়েছে যে, ও ভয় পেয়েছে?'

কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন বাসুদেব। এভাবে বাতাসে কতক্ষণ দুর্গ তৈরি করা যায়! আন্দাজে গল্প বলার তো একটা সীমা আছে! কিন্তু কিছু একটা তো বলতেই হয়! অতএব বললেন, 'ঘর ছেড়ে উনি খুব একটা বেরোন না। তবু দু-একবার যা দেখেছি তাতে ভয় পেয়েছেন বলে মনে হয়নি...।'

তেরো নম্বর ঘরের দরজায় ওরা তিনজন পৌঁছে গিয়েছিল। বাসুদেব যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। নাইট ল্যাচ খুলে ওদের ঘর দেখিয়ে দিলেন।

কিন্তু ফিরে আসার পথে আর-একবার হোঁচট খেলেন বাসুদেব।

বারো নম্বর ঘরের দরজার নীচ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে না!

বাসুদেবের পা আর কাজ করছিল না। আজ রাতে এসব কী শুরু হয়েছে! যারা নেই—কোনওদিন ছিল না—তারা সব একে-একে হাজির হচ্ছে! নাকি তিনিই ভুল করে কোনও এক সময়ে বারো নম্বর ঘরের আলো জ্বেলে গেছেন!

খানিক ইতস্তত করে ভয়ে-ভয়ে ঘরের কলিংবেল টিপলেন বাসুদেব।

টুং-টাং শব্দ শেষ হতেই ভেতর থেকে ভারী গলায় কেউ সাড়া দিল।

'কে?'

বাসুদেবের পাকস্থলীতে কেউ যেন বরফের ছুঁচ ফোটাতে শুরু করল। ওঁর হাত কাঁপতে লাগল থরথর করে। দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল। অনেক চেষ্টায় গলা দিয়ে স্বর বের করতে পারলেন তিনি।

'আমি, স্যার—হোটেলের ম্যানেজার।'

'কী চাই?' রুক্ষ্ম প্রশ্ন ভেসে এল বন্ধ দরজার ও-পিঠ থেকে।

'আমার রেজিস্টারে মনে হয় একটু গোলমাল হয়ে গেছে, স্যার। আপনাকে কি আমি বারো নম্বর ঘরই দিয়েছিলাম?'

'তাই তো মনে হয়।'

'আপনার নামটা কাইন্ডলি বলবেন, স্যার। রেজিস্টারের সঙ্গে একটু চেক করে নেব—।'

'অরিন্দম পোদ্দার...।'

নামটা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধ দরজা খুলে গেল।

এবং অপার্থিব এক হিমেল বাতাসের ঝাপটা বাসুদেবকে অসাড় করে দিতে চাইল।

অরিন্দম পোদ্দারকে ভালো করে দেখতে চাইলেন বাসুদেব। কিন্তু দেখতে পেলেন কি?

মাথায় ঘোমটা মুড়ি দিয়ে চাদর জড়ানো। তাতে মুখের অনেকটাই আড়াল হয়ে গেছে। তার ওপরে চোখে কালো চশমা। ঘরের আলোটা মাথার ঠিক পিছনে থাকায় মুখটা অস্পষ্ট অন্ধকার দেখাচ্ছে।

'আর কিছু জানতে চান?' সামান্য ফ্যাঁসফেঁসে গলায় প্রশ্ন করল অরিন্দম।

'না, স্যার।' মাথা নাড়লেন বাসুদেব।

সঙ্গে-সঙ্গে দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু তার আগেই একটা জিনিস বাসুদেবের নজরে পড়েছিল। অরিন্দমের চাদরে আর ঘরের মেঝেতে সাদা রঙের গুঁড়ো-গুঁড়ো কী যেন ছড়িয়ে রয়েছে। নুন, চিনি, নাকি মিল্ক পাউডার? বন্ধ কোনও কৌটো জোর করে খুলতে গিয়ে ওরকম ছিটকে ছড়িয়ে পড়েছে?

এলোমেলো বহু কথা ভাবতে-ভাবতে নীচে নেমে এলেন বাসুদেব। ওঁর শরীর তখনও কাঁপছিল। কতটা শীতে, কতটা ভয়ে তা বলা মুশকিল।

কাউন্টারের কাছে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ফোন করে ব্যাপারটা কি মালিককে জানানো যায়? উনি কি আদৌ বিশ্বাস করবেন? আর যদিও বা বিশ্বাস করেন, তা হলে কাল সকালের আগে কিছু করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কালাচাঁদ আর রীতা যদি সত্যি-সত্যি পুলিশের লোক হয় তা হলে পুলিশে খবর দিলে সেটা হাস্যকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু রীতার কানের মাকড়সার জালটা কি অস্বাভাবিক নয়? অরিন্দমের চাদরের সাদা-সাদা গুঁড়োগুলোই বা কী?

এইসব উলটোপালটা ভাবনা বাসুদেবের বুকের ভেতরে উথালপাথাল ঢেউ তুলছিল। একবার ভাবলেন পঞ্চাননের পাশটিতে গিয়ে শুয়ে পড়বেন। কিন্তু তারপরই আবার মনে হল, না, ওপরের ঘরে শোওয়াই ভালো। যদি রাতে কোনও কাণ্ড হয় তা হলে বাসুদেব জানতে পারবেন। আসলে ভয়ের পাশাপাশি কৌতূহলও বাসুদেবের মনে মাথাচাড়া দিচ্ছিল। অরিন্দম পোদ্দার যদি সত্যি-সত্যিই একজন মারাত্মক ক্রিমিনাল হয়, তা হলে কালাচাঁদ আর রীতা কি ওকে এখানেই অ্যারেস্ট করবে? কী করেছে অরিন্দম—খুন, চুরি, ডাকাতি? ও যদি মারাত্মক ক্রিমিনাল হয়, তা হলে ওকে অ্যারেস্ট করতে গেলে তো রিভলভার ইত্যাদি দরকার! অথচ কালাচাঁদ আর রীতা এ-হোটেলে এসে উঠেছে কোনও লাগেজ ছাড়াই। প্যান্টের পকেটে অথবা কোমরে কোনওরকম অস্ত্র লুকোনো আছে বলে তো মনে হয়নি!

আরও আধঘণ্টা পর নিজের ঘরের দিকে রওনা হলেন বাসুদেব। নিজের ঘর বলতে চোদ্দো নম্বর ঘর—কালাচাঁদ আর রীতার পাশের ঘরটা।

পা টিপে-টিপে ওপরে উঠে এলেন আবার। খিদেয় পেট চুঁইচুঁই করছিল। সুতরাং ঘরে ঢুকে হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় ছাড়লেন। উলিকট গেঞ্জির ওপরে হাতকাটা সোয়েটার চাপিয়ে তার ওপরে শাল জড়ালেন। তারপর খাওয়াদাওয়া সেরে নিলেন।

অন্যদিন হলে এরপর ঘুম। এবং বিছানায় শোওয়ামাত্রই ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির দাপট শুরু।

কিন্তু আজ? আজ দু-চোখের পাতা এক হয় কই!

ঘরের আলো নিভিয়ে বিছানায় অনেকক্ষণ ধরে উসখুস করলেন বাসুদেব। তারপর...রাত তখন কত ঠিক বলা মুশকিল...শুনতে পেলেন তীব্র শিসের শব্দ। আওয়াজটা এত মিহি যে, কানের পরদা যেন ফুটো করে দিতে চায়।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন বাসুদেব। ঘরের লাগোয়া অ্যাটাচড বাথে ঢুকে পড়লেন। ফলে দ্বিতীয় শিসের শব্দটা বেশ জোরে শোনা গেল। কারণ, তেরো আর চোদ্দো নম্বর ঘরের বাথরুম দুটো গায়ে-গায়ে লাগানো। এমনকী বেয়ে উঠে সামান্য চেষ্টা-চরিত্র করলে এ-বাথরুম থেকে ও-বাথরুমে ঢুকে পড়া যায়।

পরের বাথরুমে উঁকি মারার স্বভাব বাসুদেবের কোনওকালেই ছিল না। কিন্তু এখন, এই অদ্ভুত রাতে, একটা অচেনা আকর্ষণ ওঁকে নীতি থেকে সরিয়ে দিল। অন্ধকারের মধ্যেই জলের পাইপে পা দিয়ে

বাথরুমের দেওয়াল বেয়ে উঠে পড়লেন। ভেন্টিলেটারের কাচের পাল্লা খুব সাবধানে ঠেলে সরিয়ে পাশের বাথরুমে উঁকি মারলেন।

যে-দৃশ্য বাসুদেব দেখতে পেলেন, সন্দেহ নেই, সেটা ভারী অদ্ভুত।

পাশের বাথরুমে কেউ নেই। বাথরুমের পাল্লা খোলা। সেই খোলা অংশ দিয়ে ঘরের বেশ খানিকটা নজরে পড়ছে। ঘরের মেঝেতে সাদা রঙের গুঁড়ো-গুঁড়ো কী যেন ছড়িয়ে আছে। আর গোটা ঘরে নীল আলোর এক অলৌকিক আভা খেলে বেড়াচ্ছে। সেই আলোর আভা ঘরের কোনও-কোনও জায়গায় কমে গেলে তবেই গুঁড়োগুলোকে সাদা রঙের বলে চেনা যাচ্ছে।

বাসুদেব বোধহয় কৌতূহলে উন্মাদ হয়ে গেলেন। কারণ, গায়ের চাদর খুলে ফেলে দিয়ে শরীরটাকে সরীসৃপের মতো ভেন্টিলেটারের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিলেন। তারপর খুব সাবধানে দেওয়াল আর জলের পাইপ আঁকড়ে নেমে পড়লেন তেরো নম্বর ঘরের বাথরুমে।

একটা তুচ্ছ জিনিস বাসুদেবকে অবাক করল।

বাথরুমের মেঝে খটখটে শুকনো। সেখানে জলের কোনও ছিটেফোঁটাও নেই। অর্থাৎ, এসে থেকে কালাচাঁদ বা রীতা বাথরুম ব্যবহার করেনি!

বাথরুমের পাল্লার ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে উঁকি মারলেন বাসুদেব।

ঘরের ঠিক মাঝখানে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রীতা ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো করে শিস দিচ্ছে। আর কালাচাঁদ মূকাভিনেতার ভঙ্গিতে ধীরে-ধীরে পা ফেলে এগিয়ে আসছে রীতার কাছে। ওদের দুজনের শরীর থেকে ঠিকরে বেরোচ্ছে উজ্জ্বল নীল আলো।

রীতার খুব কাছে পৌঁছে যাওয়ামাত্রই কালাচাঁদের ঠোঁটজোড়া ছুঁচলো হল। কিসিং গোরামি মাছের মতো ওরা ঠোঁটে ঠোঁট এঁটে চুমু খেল। ওদের ঠোঁটজোড়া যেন লোহা আর চুম্বকের মতো গায়ে-গায়ে সেঁটে গেল। এবং একইসঙ্গে শিসের শব্দ থেমে গেল।

তারপর ওরা পায়ে-পায়ে পিছোতে শুরু করল। কিন্তু কী আশ্চর্য! ওদের ঠোঁটজোড়া একই অবস্থায় পরস্পরের গায়ে এঁটে রইল। শুধু কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় ওদের ঠোঁটের অংশ ইলাস্টিকের মতো লম্বা হয়ে ওদের শরীর দুটোর মাঝের দূরত্ব বাড়াতে লাগল।

হঠাৎই একটা 'চকাৎ' শব্দ হয়ে ঠোঁট দুটো ছেড়ে গেল। কালাচাঁদ আর রীতা বেহালার ছড় টানা তারের মতো তিরতির করে কাঁপতে লাগল। আর পাউডারের মতো মিহি সাদা গুঁড়ো ঘরময় উড়তে লাগল।

শীতে কেঁপে উঠলেন বাসুদেব। এবং তখনই সাদা গুঁড়োগুলোকে কুচো বরফ বলে চিনতে পারলেন। অরিন্দমের চাদরে আর ঘরের মেঝেতে তা হলে বরফকুচি ছড়িয়ে ছিল! এ ঘরের মেঝেতেও তাই। তা হলে কি...তা হলে কি...?

রীতা এবার মুখ খুলল।

'অরিন্দমকে এবার ডেকে নিয়ে আসি। ও কী বলতে চায় ওর মুখ থেকেই শোনা যাক।'

খিলখিল করে বিদ্রুপের হাসি হাসল কালাচাঁদ : 'কী আর বলবে! আমি ওর বাজে কথা শুনতে চাই না। আমি গয়নার ভাগ চাই। ও-দোকান থেকে আমরা যা হাতিয়েছি তা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ টাকার গয়না হবে...।'

'আর আমাকে যে তুমি ওর কাছে থেকে হাতিয়েছ!' চোখ মটকে বলল রীতা। অচেনা এক শীতের হাওয়া বুকের ওপর থেকে ওর শাড়ির আঁচল উড়িয়ে দিল।

'আমি তোমাকে ভালোবাসি। ভালোবাসা দিয়ে কাছে পেয়েছি—কারও কাছ থেকে চুরি করে নয়।'

কথা শেষ করার সঙ্গে-সঙ্গেই দুটো শরীর বিদ্যুৎঝলকের মতো ছুটে এল সামনে। সংঘর্ষ হল, কিন্তু কোনও শব্দ হল না। তারপর বাসুদেবকে স্তম্ভিত করে দিয়ে দুটো শরীর নাইলনের দড়ির মতো পাক খেয়ে গায়ে-

গায়ে জড়িয়ে গেল। প্রায় দশ সেকেন্ড ধরে চলল ওদের ভালোবাসাবাসি। তারপর ওরা পরস্পরকে ছেড়ে দিয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াল।

'চলো, এবার অরিন্দমকে নিয়ে আসি।' বলল কালাচাঁদ।

সঙ্গে-সঙ্গে ওদের চারটে হাত লম্বা হয়ে ধেয়ে গেল বারো নম্বর-আর তেরো নম্বর ঘরের পার্টিশন ওয়ালের দিকে।

একতাল ময়দার মধ্যে যেভাবে লোকে হাত ঢুকিয়ে দেয় ঠিক সেভাবেই চারটে হাত গেঁথে গেল দেওয়ালে। এবং পরমুহূর্তেই একটা অবয়বহীন শরীর টেনে নিয়ে এল ঘরের ভেতরে।

বাসুদেব দেখলেন, দেওয়ালটা যেন রবারের তৈরি। একটা চাদরের মতো টান-টান হয়ে অরিন্দমকে মুড়ে রয়েছে। সেই রবারের চাদরের আড়ালে অরিন্দমের দেহটা প্রাণপণ ছটফট করে চলেছে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইছে।

কিন্তু রীতা আর কালাচাঁদ নাছোড়বান্দা। অরিন্দমের চেষ্টা দেখে ওরা মজা পেয়ে হেসে উঠল। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে অরিন্দমকে দেওয়ালের চাদর ছিঁড়ে বের করে নিয়ে এল বাইরে।

হাড়কাঁপানো ঠান্ডা বাতাস পাক খেতে লাগল ঘরের ভেতরে। বাসুদেবের চোয়াল থরথর করে কাঁপছিল। দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি লেগে বিশ্রীরকম শব্দ হচ্ছিল।

অরিন্দমের পরনে সেই একই পোশাক। গায়ে চাদর মুড়ি দেওয়া, চোখে কালো চশমা। আর পায়ে হালকা নীল রঙের পাজামা।

ওকে খাটের ওপরে বসিয়ে রীতা আর কালাচাঁদ ওর দু-পাশে দাঁড়াল।

কালাচাঁদ প্রশ্ন করল, 'গয়নাগুলো কোথায়?'

'আমার কাছে নেই।' রুক্ষ বিরক্ত স্বরে জবাব দিল অরিন্দম। তারপর হঠাৎই চোখ থেকে কালো চশমাটা এক ঝটকায় খুলে ফেলল।

বাসুদেব অবাক হয়ে দেখলেন, অরিন্দম পোদ্দারের বাঁ-চোখের মণি ঘোলাটে সাদা। বড়সড় টল গুলির মতো মণিটা যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

কালাচাঁদ রীতার দিকে তাকিয়ে কী যেন ইশারা করল। তারপর ওরা দুজনে অরিন্দমের কাছ থেকে চার-পাঁচ পা করে পিছিয়ে গেল। তারপর ওরা দুজনেই ডান হাতের পাতা মেলে আঙুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে অরিন্দমকে তাক করল।

দশটা আঙুলের ডগা থেকে সবুজ শিখার বিদ্যুৎ-ঝিলিক ধেয়ে গেল অরিন্দমের দিকে। আর তৎক্ষণাৎ ওরা তিনজনেই পোশাকহীন হয়ে গেল। কিন্তু ওদের নিরাবরণ চেহারা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন বাসুদেব। তিনটে নগ্ন শরীর আপাদমস্তক স্বচ্ছ বরফ দিয়ে তৈরি। যেন কাটগ্লাসের তৈরি তিনটে ভাস্কর্য। তা থেকে নীল আলো প্রতিফলিত হয়ে ঠিকরে পড়ছে। স্বচ্ছ শরীরের কোনও কোনও জায়গা দিয়ে শরীরের ওপাশের জিনিসপত্র স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

সবুজ শিখার ছোঁয়ায় অরিন্দম পোদ্দারের শরীরে ফাটল ধরল। মাথা থেকে রক্তের ধারা শুরু হল। তারপর শরীর বেয়ে নামতে লাগল।

অরিন্দম টলতে-টলতে উঠে দাঁড়াল।

বরফের ওপরে লাল সিরাপ ঢেলে দিলে সেই সিরাপ বরফের নানা ফাটল বেয়ে চুঁইয়ে-চুঁইয়ে নেমে এলে যেমন দেখায়, অরিন্দমকে ঠিক সেরকম দেখাচ্ছিল। অনেকটা যেন বরফের ওপরে উজ্জ্বল লাল বাটিক প্রিন্টের কাজ।

যন্ত্রণায় ঝুঁকে পড়ে দাঁতে-দাঁত চেপে অরিন্দম বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি সব দিয়ে দিচ্ছি...।'

রীতা খিলখিল করে হেসে উঠল : 'তোমাকে দিতে হবে না। আমরাই নিয়ে নিতে পারব।'

'রীতা, তোমাকে আমি চিনতে পারিনি। ভুল জায়গায় আমার ভালোবাসা রেখেছিলাম। আমি কখনও ভাবিনি তোমার মতো...।'

অরিন্দম আর কথা বলতে পারল না। তার আগেই কালাচাঁদের আঙুলের ডগা থেকে বেরিয়ে আসা সবুজ বিদ্যুৎ ওকে শতচ্ছিন্ন করে দিল। পলকে বরফের ধুলো হয়ে গেল অরিন্দম। ওর শরীর কোন এক অলৌকিক বাতাসে ঘরময় উড়ে বেড়াতে লাগল। শীতের ঢেউ উথালপাথাল করতে লাগল ঘরের ভেতরে।

রীতা আর কালাচাঁদ হাত বাড়াল পার্টিশন ওয়ালের দিকে। ওদের হাত লম্বা হয়ে দেওয়াল ভেদ করে ঢুকে গেল অরন্দিমের ঘরে। একটু পরেই একটা ব্রিফকেস টেনে নিয়ে এল।

ব্রিফকেসটা আগের মতোই রবারের চাদর দিয়ে মোড়া। রীতা আর কালাচাঁদ হ্যাঁচকা টান মারতেই রবারের চাদর ছিঁড়ে ব্রিফকেসটা চলে এল ঘরের ভেতরে। ওটা বিছানায় রেখে একটানে ওটার ঢাকনা খুলে ফেলল কালাচাঁদ।

সোনালি আলোয় ঝলমল করে উঠল ঘর। সোনা-রং ঠিকরে পড়ল রীতা আর কালাচাঁদের বরফের শরীর থেকে।

ব্রিফকেস ভরতি সোনার গয়না।

বরফের শরীর বাঁকিয়ে-চুরিয়ে রীতা আর কালাচাঁদ হাসতে শুরু করল পাগলের মতো। তারপর হাসির দমক থামলে ওরা ব্রিফকেসের গয়নাগুলো আঁজলা ভরে বারবার তুলে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল। তখনই ব্রিফকেস থেকে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ অসাবধানে পড়ে গেল মেঝেতে। কিন্তু সেদিকে ওরা কোনও ভ্রূক্ষেপই করল না। ওরা পাগলের মতো গয়না ঘাঁটতে লাগল।

একসময় ওদের পাগলামি শেষ হল।

তখন ব্রিফকেসটা বন্ধ করে কালাচাঁদ সেটা রীতার হাতে দিল, বলল, 'চলো, আমাদের কাজ শেষ।'

তারপর ওরা ঠোঁট ঠোঁট ছোঁয়াল, শরীরে শরীর। ওদের ঘিরে বরফের গুঁড়ো তখনও পাক খাচ্ছে।

আবার তীব্র শিসের শব্দ শোনা গেল। আর একইসঙ্গে ভেসে বেড়ানো বরফের গুঁড়ো গাঢ় হল। বাসুদেব ভালো করে কিছু আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। তীব্র শীতে ওঁর শরীর ঠকঠক করে কাঁপছিল। তুষার ঝড়ে গোটা ঘরটা উত্তাল হয়ে গেল। রীতা কিংবা কালাচাঁদকে আর দেখা যাচ্ছিল না। শিসের শব্দটা তীব্র হতে-হতে হঠাৎই একসময় মিলিয়ে গেল।

আর তখনই বাসুদেব জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন বাথরুমের মেঝেতে।

বাসুদেবের জ্ঞান ফিরেছিল ভোরের দিকে।

গতরাতের ঘটনা ওঁর কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল। কারণ, বারো নম্বর আর তেরো নম্বর ঘর আগের মতোই পরিপাটি করে সাজানো। সম্প্রতি কেউ সেখানে থেকেছে বলে মনে হয় না। কালাচাঁদ, রীতা অথবা অরিন্দমের কোনও চিহ্নই সেখানে নেই।

ব্যাপারটা পুরোপুরি দুঃস্বপ্ন বলে বাসুদেব মেনে নিতেন, যদি না তেরো নম্বর ঘরের খাটের নীচে হঠাৎ করেই খবরের কাগজটা তিনি দেখতে পেতেন।

খবরের কাগজের পাঁচ নম্বর পৃষ্ঠার একটা খবর ওঁর নজর কাড়ল :

**পুলিশের গুলিতে ডাকাত প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু**

*১৬ জানুয়ারি, হুগলি : গতকাল সকাল দশটা নাগাদ বালি স্টেশনের কাছে মুখোমুখি সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে কালাচাঁদ নস্কর ও রীতা নস্কর নামে ডাকাত প্রেমিক-প্রেমিকার মৃত্যু হয়। ওদের কাছে প্রায় পঞ্চান্ন লক্ষ টাকার সোনার গয়না পাওয়া যায়। মৃত্যুকালীন জবানবন্দিতে রীতা জানায় যে, ওরা ওদের এক শাগরেদ অরিন্দম পোদ্দারকে গত ১৪ জানুয়ারি রাতে খুন করে। ভাগাভাগির বিবাদ থেকেই এই খুন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, এই তিনজনের ডাকাতদলই গত ১০ জানুয়ারি বউবাজারের একটি অভিজাত সোনার দোকানে দুঃসাহসিক ডাকাতি করেছিল। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ বালি স্টেশনের কাছে ফাঁদ পেতে রেখেছিল। কালাচাঁদ নস্করের কাছে একটি রিভলভার ও তিন রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়।*

ব্যাপারটা খুব পরিষ্কারভাবেই শেষ হত, যদি-না বাসুদেব হঠাৎই খবরের কাগজটার তারিখ খেয়াল করতেন।

কাগজের তারিখটা দশ বছরের পুরোনো।





# নগ্ন নির্জন রাত

*'যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে*
*অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখি নি,...'*

এ-গল্প আমি শুনেছি রিমকির কাছে। ডাক নাম রিমকি, আর পোশাকি নাম রূপশ্রী। আমার বড়দার মেয়ে সোনালির সঙ্গে রিমকি কলেজে পড়ত। এরকম সবুজ মেয়ে আমি খুব কম দেখেছি—সবসময় টগবগ করে ফুটছে। যদি কখনও জিগ্যেস করতাম, 'এত এনার্জি তুই পাস কোথা থেকে?' তাতে হেসে গড়িয়ে পড়ত মেয়েটা। বলত, 'মহাকাশ থেকে, কাকু, মহাকাশ থেকে!'

সূর্যের ভেতরে যেমনটা হয়, ওর ভেতরেও বোধহয় ক্রমাগত নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া হয়ে টন-টন হাইড্রোজেন বদলে যাচ্ছে হিলিয়ামে, আর তৈরি হচ্ছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি।

একটা সময়ে আমি বড়দার সঙ্গে একই বাড়িতে থাকতাম। তখন রিমকি প্রায়ই আসত সোনালির কাছে। আর আমার ভূতচর্চার কথা শুনে এক-একদিন এসে ভূতের গল্প শোনার আবদার ধরত।

ভূত-প্রেতের গল্প ও শুনতে চাইত কেন সেটা আমি প্রথম দিন থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। গল্প শেষ হলেই ও বলে উঠত, 'কী দারুণ বোগাস টু-স্টোরি! কাকু, সত্যি করে বলুন না, মিথ্যেকে সত্যিতে কনভার্ট করার চেষ্টা করে আপনার কী লাভ!' এবং তারপরই খিলখিল করে হাসি।

এইসব হাসি আর গল্পের মাঝেই চলত সরষের তেল দিয়ে মুড়ি-বাদাম-পেঁয়াজ-কাঁচলঙ্কা মেখে খাওয়া, আর বউদির তৈরি করে দেওয়া চা।

রিমকির সেই বয়েসের মুখটা বেশ মনে পড়ে। ফরসা লম্বাটে মুখ। টানাটানা চোখ। বাঁ-কানের নীচে একটা বড় তিল। কপালে কালো টিপ। পরনে উজ্জ্বল রঙের ঝলমলে চুড়িদার।

আমার বয়েসটা যদি বছর পনেরো-ষোলো কম হত তা হলে অবশ্যই আমি রিমকির প্রেমিক হতে চাইতাম। ও পাত্তা না দিলেও ওর আশেপাশে ঘুরঘুর করতাম। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, সত্যিই এরকমটা ভাবতাম। বেশ বুঝতাম, রিমকির মধ্যে এমন একটা টান আছে যে, যে-কোনও পুরুষই ওকে ভালোবাসতে চাইবে।

ভূত যে নেই, এ-কথা প্রমাণ করতে রিমকি প্রায়ই মহাতর্ক জুড়ে দিত আমার সঙ্গে। অনেক সময় বউদি আর সোনালিও ওর দলে যোগ দিত।

আমি ওকে শুধু বলতাম, 'রূপশ্রী, যেদিন তোমার হাড়ে-হাড়ে অভিজ্ঞতা হবে, সেদিন বুঝবে আমার গল্পগুলো বোগাস ট্রু-স্টোরি, না শুধু ট্রু-স্টোরি।'

সত্যি, বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের কত ধ্যান্ধারণা বদলে যায়! যাকে চিরকাল 'নেই' বলে ভেবে এসেছি তাকে 'আছে' বলে মেনে নিই। যেসব ঘটনা একসময় 'হয় না, হতে পারে না' বলে বিশ্বাস করতাম, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে সে-বিশ্বাস কেমন বদলে যায়—তখন মনে হয়, 'হয়, হতেও পারে।'

কিন্তু আমি কখনওই চাইনি, মর্মান্তিক কোনও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে রিমকির বিশ্বাস বদলে যাক।

অথচ তাই হয়েছিল।

প্রায় বারো বছর পর একটা বিয়ের অনুষ্ঠানে হঠাৎ করে দেখা হয়ে যেতেই বদলে যাওয়া রিমকিকে আমি চিনতে পারলাম। ওর টগবগে সবুজের ওপরে যেন সন্ধ্যার শান্ত ছায়া নেমে এসেছে।

একপাশে সরে গিয়ে কিছুক্ষণ কথা বলার পর একটু সহজ হয়েছিল রিমকি। নরম গলায় বলেছিল, 'কাকু, শেষ পর্যন্ত আপনিই জিতলেন।'

তারপর ওর গল্পটা আমাকে বলেছিল রিমকি—পুরোনো রিমকির ভাষায় 'বোগাস ট্রু-স্টোরি'। আর নতুন রিমকির ভাষায়? কী জানি!

শুরুর কবিতার লাইন দুটোও ওরই মুখে শোনা—গল্প বলার সময় গুনগুন করে আবৃত্তি করেছিল ও। শুনে আমার মনে হয়েছিল, গল্পের সব কথা যেন ওই মারাত্মক দুটো লাইনের মধ্যেই বলা হয়ে গেছে।

রিমকি আমাকে বলেছিল...।

আমি বাড়িতে পা দেওয়ামাত্রই একেবারে হইহই শুরু হয়ে গেল।

সুকান্তি একেবারে চেঁচিয়েই উঠল, 'মা, মা, মঙ্গলগ্রহ থেকে রূপশ্রী এসেছে। শিগগির নেমে এসো!'

দোতলা থেকে নামতে-নামতে পিসিমা বলে উঠলেন, 'রূপশ্রী আবার কে!'

'রূপশ্রী মানে রিমকি। ভুলেও তো আমাদের বাড়িতে আসে না, তাই বললাম মঙ্গলগ্রহ থেকে এসেছে। ও এখন কথায়-কথায় হিল্লি-দিল্লি করে বেড়াচ্ছে—বিগ বস। আমাদের আর পাত্তা দেবে কেন! দেখলে না, অত করে আসতে বললে, ছোড়দির বিয়েতেও এল না!'

আমি সুকান্তিকে ধমকে উঠলাম, 'তুই থামবি! নাকে অক্সিজেনের নল গুঁজে নে—নইলে বকবক করে হাঁফিয়ে পড়বি।'

পিসিমা ততক্ষণে নীচে নেমে এসেছেন।

পরনে সাদা থান, গলায় সরু চেন, হাতে দু-গাছা চুড়ি, চোখে চশমা। মাথার চুলে বেশ পাক ধরেছে। বয়েস কত হবে এখন? মনে-মনে হিসেব করলাম। ষাট পেরিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই। অথচ টকটকে ফরসা রং এতটুকু মলিন হয়নি। এখনও দারুণ সুন্দরী। ঠিক যেন দেবীপ্রতিমা। শুনেছি, পিসেমশাই পিসিমার রূপ দেখেই পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। সে-কথা বুড়ো বয়েসেও বারবার বলতেন। আরও বলতেন, পিসিমা আগে চলে গেল সে-কষ্ট তিনি সইতে পারবেন না। ভগবান বোধহয় পিসেমশাইয়ের মনের কথা শুনতে পেয়েছিলেন। তাই সময় হওয়ার অনেক আগেই ওঁকে ডেকে নিয়েছেন।

'রিমকিকে রূপশ্রী বললে কখনও চিনতে পারি!' পিসিমা হেসে বললেন। তারপর আমাকে জিগ্যেস করলেন, 'কী রে, ইতির বিয়েতে এলি না কেন?'

আমি কাঁধের ব্যাগটা বাঁ-হাতে সামলে ঝুঁকে পড়ে টিপ করে পিসিমাকে একটা প্রণাম করলাম।

পিসিমা আমার চিবুক ছুঁয়ে নিজের ঠোঁটে সে-আঙুল ছোঁয়ালেন : 'ইতি বারবার তোর কথা বলছিল...।'

'কী করব, পিসিমা। একটা কনফারেন্সে ব্যাঙ্গালোর যেতে হয়েছিল।'

সুকান্তির দুই দিদিঃ বড়দি শ্রুতি, আর ছোড়দি ইতি। শ্রুতিদি নাকি অনেকদিন আগেই পিসিমাকে জানিয়ে দিয়েছে ও বিয়ে করবে না। কেন তা খুলে বলেনি। পিসিমাই আমাকে এ-কথা বলেছিলেন। তখন পিসিমার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছিল পিসিমা সবই জানেন, কিন্তু আমাকে বলতে চাইছেন না। পরে অবশ্য কানাঘুষোয় আমি অনেকটাই জেনেছি।

ইতি আমার চেয়ে বছরতিনেকের বড়। আর সুকান্তি আমার পিঠোপিঠি। তাই সুকান্তির সঙ্গেই আমার আড্ডা বেশি জমে। পিসিমা সবসময় সবাইকে বলেন, 'রিমকি আর সুকান্তি এক জায়গায় হলেই সেখানে হইহই করে হাট বসে যায়। কী করে যে ওরা এত বকবক করতে পারে সে ওরাই জানে।'

আমাকে সঙ্গে নিয়ে সুকান্তি আর পিসিমা দোতলায় উঠল।

উঠেই দেখি, বাঁ-দিকের বড় বেডরুমটায় শ্রুতিদি বিছানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছে। দক্ষিণের খোলা জানলা দিয়ে ছুটে আসা এলোমেলো বাতাস খবরের কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে পাগল করে দিচ্ছিল। আর তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্রুতিদির চুল উড়ছিল। শ্রুতিদি কাগজের পৃষ্ঠাগুলোকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছিল।

আমাকে দেখে কাগজ থেকে মুখ তুলে সামান্য হাসল শ্রুতিদি : 'কীরে, রিমকি, কেমন আছিস?'

ওকে দেখে মনে হল ভোরবেলাতেই স্নান সেরে নিয়েছে।





শ্রুতিদি পিসিমার মুখ পেয়েছে। ফরসা রোগা। দেখলে একটু অসুস্থ বলে মনে হয়। আগে এরকম ছিল না। বোধহয় কানাঘুষোয় শোনা সেই বিচ্ছিরি ব্যাপারটার পর এরকম হয়ে গেছে। সব ব্যাপারেই কীরকম যেন ঠান্ডা—উৎসাহ উদ্দীপনার ছিটেফোঁটা নেই কোথাও।

আমি বললাম, 'তুমি কেমন আছ?'

আবার সামান্য হাসি। তারপর ইতির বিয়েতে না-আসা নিয়ে আর-এক প্রস্থ অনুযোগ।

ঘরে ঢুকে সবে একটা চেয়ারে বসে হাঁফ ছেড়েছি, পিসিমা বললেন, 'এবার তোকে ছাড়ছি না—দু-চারদিন থেকে যেতেই হবে। সুকান্তি রথীনকে আর শোভাকে ফোন করে খবর দিয়ে দেবে।'

আমি হেসে বললাম, 'আমার উত্তর শুনলে তোমরা ফ্ল্যাবারগাস্টেড হয়ে যাবে।'

'ফ্ল্যাবারগাস্টেড মানে কী রে?' সুকান্তি জিগ্যেস করল।

'এও জানিস না! হতবাক, হতভম্ব।'

পিসিমা বললেন, 'তা হতবাক হয়ে যাওয়ার মতো উত্তরটা শুনি।'

'আমি তোমাদের এখানে দু-চারদিন থাকতেই এসেছি। দেখছ না, ব্যাগটা কী ভারী!'

উত্তর শুনে সুকান্তি আর পিসিমা একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে গেল। হওয়ারই কথা। কারণ, আমার ছোটবেলা-বড়লোকের অনেকটা সময় শ্রীরামপুরে পিসিমাদের বাড়িতেই কেটেছে। আজ বুঝতে পারি, আমি যে 'আমি' হয়ে উঠেছি, তার জন্যে পিসিমা-পিসেমশাইয়ের কাছে অনেক ঋণ রয়ে গেছে আমার।

তাই ওদের সঙ্গে-সঙ্গে আমিও ছোট হয়ে যাচ্ছিলাম।

শ্রুতিদি একটু অবাক হয়ে তিনটে পাগলকে দেখছিল।

হঠাৎই একটা গ্যালপিং ট্রেন ছুটে গেল সামনের রেল-লাইন দিয়ে। পিসিমাদের পুরোনো বাড়ির জানলা-দরজা মিহি শব্দ তুলে কাঁপতে লাগল।

ট্রেনের এই কু-ঝিকঝিক শব্দ আমার বালিকা বয়েসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তখন পুজোর ছুটি আর গরমের ছুটি মানেই শ্রীরামপুরে পিসিমাদের বাড়ি। আর ট্রেনের কু-ঝিকঝিক।

পিসিমাদের বাড়িটা রাইল্যান্ড রোডের ধারে। বোধহয় একশো কি দেড়শো বছরের পুরনো। পিসেমশাই এটা কেনার পর জোড়াতালি দিয়ে সারিয়ে-টারিয়ে নিয়েছেন। একতলায় একটা ঘর আর কলতলা-বাথরুম।

দোতলায় দুটো ঘর আর পশ্চিমে রেল-লাইনের দিকে একটা টানা বারান্দা। আর একেবারে কোণের দিকে একটা আধুনিক ছাঁদের বাথরুম পিসেমশাই তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন।

আমি হাত-মুখ ধুয়ে শাড়ি-টাড়ি ছেড়ে এলাম।

পিসিমা চা করে দিলেন। তারপর ইতিদির বিয়ের গল্প শুরু হল। কোন বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল, খাওয়া-দাওয়ার মেনু কীরকম হয়েছিল, বাসী বিয়ের দিন কী-কী মজা হয়েছিল, শয্যা তোলার সময় ভালোমানুষ বরের কাছ থেকে কীভাবে চাপ দিয়ে কড়কড়ে পাঁচশো টাকা আদায় করা হয়েছিল, এইসব।

এর কিছু-কিছু আমি ব্যাঙ্গালোর থেকে ফিরে বাবা-মায়ের কাছে শুনেছি। কারণ, ওরা বিয়েতে এসেছিল। তবুও আর-একবার শুনতে খারাপ লাগছিল না।

আমাদের কথাবার্তা হাসি-ঠাট্টায় শ্রুতিদি ধীরে ধীরে সহজ হয়ে আসছিল। ছোট বোনের বিয়ে নিয়ে নানান কথা বলছিল। তারপর একসময় আমাকে বিয়ের ফটো দেখতে বসল।

এসেছিলাম সেই সকাল আটটায়। কখন যে বেলা বারোটা বেজে গেছে কারও খেয়ালই নেই।

পিসিমা একবার সুকান্তিকে বলেছিলেন, 'তুই আজ অফিসে বেরোবি না?'

সুকান্তি হেসে উঠে বলল, 'পাগল হয়েছ, মা! অ্যাদ্দিন পর রিমকি এসেছে আর আমি অফিস যাব! প্রণয়কে বলে দেব, ও খবর দিয়ে দেবে। আমার যা ছুটি পাওনা আছে তাতে দু-চারদিন ডুব মারাটা কোনও ব্যাপার না।'

পিসিমা আমাকে স্নান করতে যাওয়ার তাড়া দিতেই সুকান্তি বলল, 'না, মা। খাওয়ার দেরি আছে। তোমরা বসে গল্প করো—আমি মাংস কিনে নিয়ে আসি। বটতলায় গেলে পেয়ে যাব। আমি তো জানি, রিমকি ছোটবেলা থেকেই মাংসাশী প্রাণী।'

সুকান্তি চলে যেতেই পিসিমা আমার অফিসের কথা শুনতে চাইলেন। বিজ্ঞাপন কোম্পানির ধরন-ধারণ পিসিমার একেবারেই অচেনা। তাই বাচ্চা ছেলেকে বোঝানোর মতো করে আমি সব বোঝাতে লাগলাম। বললাম, বিজ্ঞাপন কোম্পানিগুলোর মধ্যে কী কম্পিটিশান। কেন আমাকে কলকাতা ছেড়ে বারবার বাইরে দৌড়োতে হয়।

শ্রুতিদি আমার কথা খুব মন দিয়ে শুনছিল। শোনার পর বলল, 'তোকে আমার হিংসে হচ্ছে, রিমকি। তোর মতো লাইফ আমার খুব পছন্দ।'

পিসিমা একবার অদ্ভুত চোখে বড় মেয়ের দিকে তাকালেন।

আমি শ্রুতিদিকে বললাম, শ্রুতিদি, সবই নদীর এ পার কহে...। সত্যিকারের সুখ-শান্তি বলতে যা বোঝায় সেটা কারওর নেই। ওটা শুধু খুঁজে বেড়ানোর জিনিস—কখনও পাওয়া যায় না।'

শ্রুতিদি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমার হঠাৎই বেশ খারাপ লাগছিল।

খটাখট শব্দে একটা লোকাল ট্রেন চলে গেল।

খোলা জানলা দিয়ে লাইনের ধারের গাছপালা দেখা যাচ্ছিল। কাছেই ইলেকট্রিকের তারে দুটো শালিক বসে রয়েছে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছিল। জোরালো রোদে কয়েকটা পাতা আয়নার মতো চকচক করছিল।

পিসিমা বললেন, 'শ্রুতিকে কত বলি, টিউশনি কর—ও করতে চায় না।'

'টিউশনি আমার ভাল্লাগে না।' শ্রুতিদি বলল।

আমি ওকে বললাম, 'তোমার তো আঁকার হাত ভালো ছিল। হাতের কাজটাজ কিছু করতে পারো...বাটিকের কাজ...।'

শ্রুতিদি মলিন হাসল। ছোট্ট করে 'হুঃ...' শব্দ করল।

এরপর গল্প আর তেমন জমল না। আমি স্নান করার তোড়জোড় শুরু করলাম। পিসিমাও রান্নাবান্নার ব্যাপারটা দেখতে চলে গেলেন।

রাতে সবাই মিলে একসঙ্গে যখন খেতে বসেছি, তখন পিসিমা সুকান্তিকে বললেন, 'কীরে, কী ঠিক করলি? তুই কি তা হলে একতলায় ঘরে শুবি? আর রিমকি তোর ঘরে শোবে?'

সুকান্তি খেতে-খেতে মায়ের দিকে তাকাল। জড়ানো গলায় বলল, 'আমাকে সব লটবহর নিয়ে তা হলে নীচে নামতে হবে। তা ছাড়া আমার ব্যাচিলার্স ডেন কি রিমকির ভালো লাগবে?' একটু হাসল সুকান্তি।

আমি সাত-তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'একতলায় শুতে আমার কোনও প্রবলেম নেই, পিসিমা।'

'না, তা না....যদি ভয়-টয় পাস....।'

আমি হাসলাম : 'চোর-ডাকাত হলে ভয় পেতেও পারি। তা ছাড়া আবার ভয় কীসের! আমার একা-একা শোওয়ার অভ্যাস আছে।'

সুকান্তি খাওয়া-থামিয়ে বলল, 'রিমকির আই. কিউ. দিন-দিন কমে যাচ্ছে। মা চোর-ডাকাতের ভয়ের কথা বলছে না—বলছে গোস্ট প্রবলেমের কথা।'

'ভূতের ভয়!' আমি আর হাসি চাপতে পারলাম না : 'পিসিমা, সত্যি....ভূত বলে কিছু থাকলে তবে না তাকে ভয় পাব! ভূত হচ্ছে বাচ্চাদের ভয় দেখানোর জন্যে বড়দের তৈরি একটা মিথ—মিথ্যেও বলতে পারো। আমি তো আর বাচ্চা নই!'

শ্রুতিদি কেমন অদ্ভুত চোখে আমাকে দেখছিল। ওর বলা সকালের কথাটা মনে পড়ল : তোকে আমার হিংসে হচ্ছে, রিমকি।

সুকান্তি পিসিমাকে বলল, 'রিমকি একটুও বদলায়নি। সেই ছোটবেলার মতোই—ঝাঁসি কি রানি। কী বল, রিমকি!'

আমি বললাম, 'তুই ছোটবেলা থেকে যা কুঁড়ে! তুই কখনও নিজের আস্তানা ছাড়বি! বিছানায় পাশ ফিরতে হলেও তো মাকে ডাকিস পাশ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্যে।'

সুকান্তির সঙ্গে লাঠালাঠি করতে-করতেই খাওয়া শেষ হল।

এরপর শুতে যাওয়ার পালা। সুকান্তি বলল, 'দাঁড়া, তোর জন্যে ক'টা ম্যাগাজিন নিয়ে আসি—।'

আমি বললাম, দরকার নেই—আমার সঙ্গে বই আছে, কিন্তু ও শুনল না। ওর ঘরে গেল ম্যাগাজিনগুলো নিয়ে আসতে।

দোতলার বড় ঘরটায় পিসিমা আর শ্রুতিদি শোয়। তার পাশের ছোট ঘরটায় সুকান্তি। ওর ঠিক নীচেই আমার জন্যে বরাদ্দ করা ঘরটা। এমনিতে ওটা বন্ধই পড়ে থাকে—ইতিও ওখানে শুত না। পিসেমশাই বেঁচে থাকতে ঘরটা ব্যবহার হত। এককালে ছিল বৈঠকখানা—পরে পিসেমশাইয়ের শোওয়ার ঘর। ঘর ছাড়া বাকিটা পুরোনো ধাঁচের বারান্দা, কলতলা আর বাথরুম।

খাওয়া-দাওয়ার পর পিসিমাদের সঙ্গে বসে আর-এক প্রস্থ গল্প, আর কিছুটা সময় টিভি দেখলাম। তারপর হাই উঠতে লাগল।

পিসিমা বললেন, 'আজকের মতো ঢের হয়েছে। এবারে শুতে যা—।'

সুকান্তি ম্যাগাজিনগুলো হাতে নিয়ে আমাকে খোঁচা দিল : 'চল, তোকে সি অফ করে আসি।'

একতলার ঘরের দরজায় এসে ও বলল, 'ঢুকেই বাঁ-দিকে সুইচবোর্ড—তুই তো জানিস। আর বাথরুম...।'

আমি ম্যাগাজিনগুলো ওর হাত থেকে নিয়ে বললাম, 'মায়ের কাছে মাসির গল্প করিস না। গুডনাইট। কাল সকাল-সকাল উঠবি—আমাকে এসকর্ট করে মর্নিং ওয়াকে নিয়ে যাবি, সানরাইজ দেখাবি।'

ও ভুরু উঁচিয়ে বলল, 'এটা কি পুরী নাকি! এখানে সানরাইজ রান্নাঘরের তাকে পলিপ্যাকে পাওয়া যায়।' হাসল সুকান্তি। তারপর গলাটা সিরিয়াস করে বলল, 'সত্যি তুই ভয় পাবি না তো!'

আমি হালকা গলায় বললাম, 'পেলে তোকে ডাকব।'

'তা হলে গলা ফাটিয়ে চেঁচাবি...জানিস তো আমার স্লিপ খুব ডিপ।'

ও চলে গেল।

আমি ঘরের আলো জ্বেলে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলাম। সাবধানের মার নেই ভেবে খিল আর ছিটকিনি—দুটোই এঁটে দিলাম। তারপর ম্যাগাজিনগুলো বিছানায় রেখে ঘরের এক কোণে গিয়ে শাড়ি ছেড়ে নাইটি পরে নিলাম।

ঘরে আলো বলতে একটিমাত্র টিউব লাইট। আর আসবাবপত্র বলতে একটা ছোট কাঠের আলমারি, একটা টেবিল, একটা চেয়ার, একটা বুককেস, আর একটা ছোট খাট। আলমারির মাথায় পুরোনো আমলের টুকিটাকি জিনিস—তার মধ্যে একটা পেতলের দোয়াত আর একটা পেতলের ফুলদানি। তবে এত ময়লা হয়ে গেছে যে, পেতলের বলে আর বোঝা যায় না।

ঘরে তিনটে জানলা : একটা ভেতরের কলতলার দিকে, আর দুটো রেল-লাইনের দিকে। তিনটে জানলাতেই শক্তপোক্ত গ্রিল লাগানো।

বিছানায় গা ঢেলে দিতেই এক অদ্ভুত তৃপ্তি পেলাম—যেন কেউ আমার জন্যে পালকের কোল পেতে দিয়েছে। অথচ বিছানাটা নিতান্তই মামুলি।

সামান্য আড়মোড়া ভেঙে একটা ফিল্ম ম্যাগাজিন হাতে তুলে নিলাম। ব্যাগে আরভিং ওয়ালেসের 'সিনস অভ ফিলিপ ফ্লেমিং' রয়েছে, কিন্তু সেটা আর বের করতে ইচ্ছে করল না।

রাতে বই পড়া আমার বহুদিনের অভ্যেস। তাই ক্লান্ত লাগলেও ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ বোলাতে লাগলাম। বহুদিন সিনেমার খবর নেওয়া হয় না। তাই ম্যাগাজিনটা পড়তে খারাপ লাগছিল না।

মাঝে-মাঝে ট্রেন ছুটে যাওয়ার শব্দে মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎই একটা ট্রেন চলে যাওয়ার পর কে যেন আলতো করে আমার নাম ধরে ডাকল।

'রূপশ্রী...।'

আমি চমকে উঠলাম। চোখ ফেরালাম দরজার দিকে। দরজায় ছিটকিনি, খিল সব ঠিকঠাকই আছে।

সুকান্তি কি দরজার বাইরে থেকে আমাকে ডাকল! কিন্তু ডাকটার ধরন যেন কেমন অদ্ভুত। কেউ যেন ভীষণ আহ্লাদ করে আমার নামটা উচ্চারণ করেছে।

বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত একটা বাজতে মিনিট পাঁচ-সাতেক বাকি। এ-সময়ে সুকান্তি কেন আমাকে ডাকতে আসবে! নাকি ও ঝাঁসির রানির সাহস পরীক্ষা করে দেখতে চায়।

ম্যাগাজিনটা মাথার কাছে রেখে আমি বিছানা ছেড়ে উঠলাম। একটু সতর্কভাবে দরজার কাছে গেলাম। দরজার পাল্লার জোড়ের কাছে মুখ নিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কে? সুকান্তি?'

উত্তরে কোনও সাড়া পেলাম না। তবে মনে হল যেন কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আবার প্রশ্ন করলাম আমি, 'কে? কে?'

কোনও উত্তর নেই।

পিসিমাদের সদরে গ্রিলের দরজা বসানো। তার ঠিক পরেই একটা ভারী কাঠের দরজা। দরজাগুলো তালা-খিল-টিল দিয়ে ঠিকঠাক বন্ধ থাকে। এ ছাড়া বাইরে থেকে উটকো লোক ঢুকে পড়ার কোনও পথ নেই। তিনতলার ছাদের দরজাতেও বরাবর রাতে খিল এঁটে দেওয়া হয়।

সুতরাং কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকার পর ভীষণ বোকা-বোকা লাগল। মনে হয় আমার নাম ধরে কেউ ডাকেনি। ম্যাগাজিনের দিকে মনোযোগ থাকায় আমি হয়তো ভুল শুনেছি। সামান্য এই কারণে যদি চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করি, তা হলে সুকান্তি টিটকিরি দিয়ে আর টিকতে দেবে না।

চুপচাপ বিছানায় ফিরে এলাম। ছোট টেবিলটায় জলের জগ আর গ্লাস রাখা ছিল। সেদিকে চোখ পড়তেই পলকে তেষ্টা পেয়ে গেল। বিছানা থেকে নেমে চলে গেলাম টেবিলের কাছে। গ্লাসে জল ঢেলে প্রাণভরে

তেষ্টা মেটাতে গিয়েও থেমে গেলাম। বেশি জল খাওয়া ঠিক হবে না। কারণ, রাতে আর বাথরুমে বেরোতে চাই না।

গলাটা সমান্য ভিজিয়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে দিলাম। অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘরের ভেতরে। আন্দাজে ভর করে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরের ঝোপঝাড় থেকে রাত-পোকার ডাক কানে আসছিল।

চোখটা একটু সয়ে আসতেই রেল-লাইনের দিকের খোলা জানলা দুটোর দিকে নজর পড়ল। ঘরের তুলনায় অন্ধকার সেখান খানিকটা যেন কম। কালো আকাশ, দু-একটা তারা, আর গাছ-গাছালির কয়েকটা ডালপালা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

আর-একটা ট্রেন ঝমাঝম করে ছুটে গেল। তারপরই যেন চারিদিক চুপচাপ হয়ে গেল। বাতাসে নড়ে ওঠা পাতার খসখস শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম আমি।

হঠাৎই ডাকটা শোনা গেল আবার।

'রূ-প-শ্রী...।'

আবেগ থরথর গলায় ভীষণ চাপা ফিসফিসে স্বরে আমার নাম ধরে ডেকে উঠল কেউ।

না, এবারে শুনতে আমার কোনওরকম ভুল হয়নি। তিনটে অক্ষরকে আলাদাভাবে টেনে-টেনে উচ্চারণ করেছে সে। ভালোবাসার জ্বরে বেপথু কোনও রোমান্টিক কণ্ঠস্বর।

পিসেমাশইয়ের গলা এটা নয়। তা ছাড়া তিনি অপঘাতে মারা যাননি যে ভূত-প্রেত হয়ে উপোসী ভালোবাসা নিয়ে ঘুরে বেড়াবেন।

তা হলে এমন করে কে ডাকছে আমায়!

আমি বিছানায় কাঠ হয়ে শুয়ে রইলাম। যেন সামান্য নড়াচড়া করলেই অতল খাদে পড়ে চিরকালের মতো তলিয়ে যাব।

এইভাবে কিছুটা সময় কেটে যাওয়ার পর ভাবতে শুরু করলাম, ঘরের আলোটা জ্বেলে দেব কি না। কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠতে আমার—স্বীকার করতে লজ্জা নেই—বেশ ভয়-ভয় করছিল। অথচ আমার মনের একটা অংশ ভেতর থেকে বারবার আমাকে বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, ভূত বলে কিছু নেই। যারা ভূতের ভয় পায় ভূতেরা তাদের দেখা দেয়। কিন্তু আমার মনের বাকি অংশ কিছুতেই সেসব যুক্তি মানতে চাইছিল না।

ঠিক তখনই 'খুট' করে একটা শব্দ হল। যেন কেউ ঘরের দরজা খুলল। অন্ধকারে বাইরে থেকে ছুটে আসা বাতাসের ঝাপটাও টের পেলাম আমি। অথচ একটু আগেই দেখেছি দরজায় খিল-ছিটকিনি ভালো করেই আঁটা রয়েছে।

আমি শুয়ে-শুয়েই ঘামতে শুরু করলাম। অথচ মাথার ওপরে সিলিং পাখা একই তালে ঘুরে চলেছে। এরপর কি আমি অজ্ঞান হয়ে যাব!

দরজার শব্দ হল আবার। তারপর অতি সাবধানে খিল লাগানোর শব্দ, ছিটকিনি আঁটার শব্দ।

তার মানে। কেউ কি ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজাটা আবার বন্ধ করছে! অসম্ভব!

নিজেকে বারবার বললাম, এ-সময় মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। অযথা ভয় পাওয়ার কোনও মানে হয় না। কারণ, ভূত-প্রেত বলে কিছু নেই। কিচ্ছু নেই।

যুক্তি দিয়ে সবই বুঝতে পারছিলাম, অথচ ভীষণ ভয় করছিল।

আমার খুব কাছে কে যেন নিঃশ্বাসে ফেলল। তারপর পা ফেলে হেঁটে বেড়ানোর অস্পষ্ট শব্দ পেলাম।

আমার চোখ খুব একটা কাজ করছিল না। তবে নাক আর কান দ্বিগুণ সজাগ ছিল। হয়তো সেইজন্যেই পারফিউমের হালকা গন্ধটা টের পেলাম।

এই পারফিউম আমি ব্যবহার করি না। কিন্তু কেন জানি না মনে হল, এটা পুরুষদের পারফিউম। আর গন্ধটা আমাকে যেন টানছিল, নেশা ধরিয়ে দিচ্ছিল।

ঠিক তখনই একটা জমাট ছায়া জানলার চৌকো ফ্রেমে দেখতে পেলাম—তবে মাত্র একপলকের জন্যে। তারপরই ওটা আলমারির দিকে সরে গেল।

এবার আমি চিৎকার করতে চাইলাম, কিন্তু ভোকাল কর্ড স্ট্রাইক করে বসল।

আশ্চর্য! যখন আমি চিৎকার করতে পারতাম তখন লজ্জায় সঙ্কোচে চিৎকার করতে চাইনি। আর এখন প্রাণপণে চিৎকার করতে চাইছি অথচ পারছি না।

হঠাৎই মনে হল আমার বিছানার খুব কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে—ঝুঁকে পড়েছে আমার শরীরের ওপরে। পারফিউম ছাড়া আমি যেন একটা উগ্র পুরুষালি গন্ধ পাচ্ছি। একই সঙ্গে পায়রার বুকের পালকের মতো নরম আলতো একটা ছোঁয়া আমাকে অবশ করে দিল। হাতে, পায়ে, গলায়, বুকে। টিভি চালিয়ে তার স্ক্রিনের খুব কাছে হাত নিয়ে গেলে যেরকম অনুভূতি হয়, এ-ছোঁয়া ঠিক সেইরকম।

আমার ঘুম পেয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তে তীব্র হুইসল দিয়ে ঝমাঝম শব্দে একটা ট্রেন ছুটে গেল।

আর সঙ্গে-সঙ্গে তাল কেটে গিয়ে সব ওলটপালট হয়ে গেল। পলকে পারফিউমের গন্ধ, অলৌকিক ছোঁয়া—সব উধাও। আমার ঘুমের ঘোরও কেটে গেল। গলা পর্যন্ত যে-ভয় উথলে উঠেছিল সেটা থার্মোমিটারের পারার মতো দ্রুত নামতে লাগল।

প্রচণ্ড এক চেষ্টায় বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলাম আমি। হাত বাড়িয়ে এক ঝটকায় আলোর সুইচ জ্বেলে দিলাম।

ঘরে কেউ নেই।

ঘরটা শেষ যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক তেমনটিই আছে।

হঠাৎই আমার চোখ গেল ঘরের দরজার দিকে।

দরজার খিল-ছিটকিনি দুটোই খোলা। দরজার পাল্লা দুটো ইঞ্চিদুয়েক ফাঁক হয়ে আছে।

তা হলে কি ঘরে চোর ঢুকেছিল! কিন্তু বাইরে থেকে তো খিল-ছিটকিনি খোলা অসম্ভব!

দরজা আবার ভালো করে বন্ধ করে খিল আর ছিটকিনি এঁটে দিলাম। পাল্লাদুটো বারকয়েক টেনেটুনে দেখলাম ঠিক আছে কি না। তারপর বিছানায় ফিরে এলাম।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত সওয়া তিনটে।

শরীর আর বইছিল না। আলো জ্বেলে রেখেই শুয়ে পড়লাম। কারণ, আলো নিভিয়ে দিলে আমার আর কিছুতেই ঘুম আসবে না।

দুমদুম করে দরজায় কেউ ধাক্কা দিচ্ছিল।

ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। হাতঘড়িটার দিকে তাকালাম। ন'টা বাজতে দশ মিনিট বাকি। জানলার দিকে তাকিয়েও বোঝা যাচ্ছে বেলা অনেক হয়ে গেছে।

দরজায় আবার ধাক্কা পড়ল। সেই সঙ্গে সুকান্তি আমার নাম ধরে ডাকল : 'রিমকি! রিমকি! ওঠ, ওঠ—ন'টা বাজে! তুই বলে মর্নিং ওয়াকে যাবি, সানরাইজ দেখবি!'

আমি সাড়া দিলাম : 'খুলছি, খুলছি! এক মিনিট...।'

এক মিনিটের কম সময়েই পোশাক পালটে টুথব্রাশে টুথপেস্ট লাগিয়ে দরজা খুলে দিলাম।

'কাল রাতে ভালো করে ঘুমোতে পারিসনি নাকি!'

আমি জড়ানো গলায় বললাম, 'না।'

তখনই ও দরজার কাছ থেকে জ্বলন্ত টিউব লাইটটা দেখতে পেল।

'কী রে, সারা রাত আলো জ্বেলে ঘুমিয়েছিলি নাকি!'

'হ্যাঁ। আলো-পাখা অফ করে দে। আমি হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে যাচ্ছি। গিয়ে সব বলছি। পিসিমাকে বল চা করতে—।'

ওপরে গিয়ে চায়ের কাপে প্রথম চুমুক দিয়েই আমি বললাম। 'পিসিমা, কিছু মাইন্ড কোরো না। তোমাদের ওই একতলায় ঘরটা কিন্তু হন্টেড।'

'হন্টেড মানে! ঠিক কী বলতে চাইছিস?' সুকান্তি জিগ্যেস করল।

আমি চায়ের কাপে আর-একটা লম্বা চুমুক দিয়ে নির্বিকারভাবে বললাম, 'হন্টেড মানে হন্টেড। ওই ঘরটায় ভূতের উপদ্রব আছে। আমাকে আগে বলিসনি কেন!'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

পিসিমা, শ্রুতিদি, সুকান্তি—সবাই বেশ ফ্যালফ্যাল চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। পিসিমা আর শ্রুতিদি তো মনে হল আমার কথায় বেশ ভয় পেয়ে গেছে। আর সুকান্তি আমাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছিল। বুঝতে চাইছিল আমি সত্যি-সত্যি ভূতের কথা বলছি, নাকি ঠাট্টা করছি।

কিছুক্ষণ পর সুকান্তি মুখ নীচু করে মিনমিন করে বলল, 'না...মানে... ভাবিনি যে, এখনও ও-ঘরটায় কোনও প্রবলেম হতে পারে।' মুখ তুলে পিসিমার দিকে তাকাল ও : 'মা, তুমি তো জানো, ছোড়দির বন্ধু ঈশিতা তো এসে রাতে ও-ঘরে ছিল। তখন তো কিছু হয়নি! তারপর...।'

লক্ষ করলাম, শ্রুতিদির চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। আর পিসিমাও কেমন যেন অস্বস্তি পেয়ে এক মুখে ওর মুখে চাইছেন।

সুকান্তি আমার কাছে ঝুঁকে এসে জানতে চাইল : 'তুই ঠিক কী দেখেছিস বল তো! কী হয়েছে কাল রাতে?'

'কী আবার হবে! একটা লোক ঢুকে পড়েছিল আমার ঘরের ভেতরে। অথচ রাত্তিরে শোওয়ার আগে খিল-ছিটকিনি ঠিকমতোই এঁটে দিয়েছিলাম।'

আমি চা খেতে-খেতে পুরো ঘটনাটা খুলে বললাম।

জানলা দিয়ে রোদ-ঝলমলে দিন দেখা যাচ্ছে। চারপাশে কোথাও অশরীরী—অলৌকিকের ছায়ামাত্র নেই। এই পরিবেশে কাল রাতের ব্যাপার-স্যাপারগুলো বলতে গিয়ে আমার হাসি পেয়ে যাচ্ছিল। মনে হল, এমন তো নয় যে, বাইরে থেকে কায়দা করে একতলার ঘরটার খিল-ছিটকিনি খোলা যায়! তা হলে কোনও বদমাশ লোক চুরি বা অন্য কোনও বদ মতলবে বাইরে থেকে খিল-ছিটকিনি খুলে মাঝরাতে ঘরে ঢুকে পড়েছে! তারপর ট্রেনের আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যাবে ভেবে পালিয়েছে।

সে-কথাই সুকান্তিকে বললাম।

সুকান্তি মানতে চাইল না। বলল, 'না রে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। ঘরটা বোধহয় সত্যি-সত্যিই হন্টেড। তোর আগে আরও দুটো এরকম কেস হয়েছে।'

'কীরকম, শুনি—।'

এবার পিসিমা মুখ খুললেন : 'জয়তীকে তুই চিনবি না। আমার ননদের বড় মেয়ে। বছর পাঁচেক আগে ও ওয়ালশ হসপিটালে ওর এক আত্মীয়কে দেখতে এসেছিল। কী একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল যেন। তখন ও আমাদের বাড়িতে এসে থেকেছিল। রাতে নীচের ওই ঘরটায় শুয়েছিল। ও কিন্তু ভীষণ ভয় পেয়েছিল—।'

'কী দেখেছিল রাতে?' আমার খুব জানতে ইচ্ছে করছিল।

পিসিমা শাড়ির আঁচলে হাত মুছলেন। তারপর বললেন, 'দাঁড়া, ভাতটা একবার দেখে আসি। আঁচটা কমিয়ে দিয়ে আসি।'

পিসিমা উঠে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

একটু পরেই ফিরে এসে বলতে শুরু করলেন।

'রাত কত হয়েছিল জয়তীর খেয়াল নেই। তবে খুব গভীর রাত নিশ্চয়ই। হঠাৎই ও দেখল রেল-লাইনের দিকে একটা জানলার গ্রিলের বাইরে একটা ছায়া। চুপচাপ দাঁড়িয়ে যেন ওকে লক্ষ করছে।

'জয়তী প্রথমটায় ভেবেছে চোর-ছ্যাঁচড় হবে। ও চিৎকার করতে যাবে, ঠিক তখনই দ্যাখে ছায়াটা গ্রিল ভেদ করে ঘরে ঢুকে পড়ল—ঠিক একতাল মাখনের মতো। জয়তী আর চিৎকার করতে পারেনি। ও কাঠ হয়ে শুয়ে ছায়াটাকে লক্ষ করতে চেষ্টা করছিল।

'তখন শুক্লপক্ষ ছিল। তাই আবছা হলেও লোকটাকে দেখতে পাচ্ছিল জয়তী। লোকটা ওর বিছানার ধার ঘেঁষে পায়চারি করছিল। জয়তী ওর নিঃশ্বাসের শব্দ পেয়েছিল। একটা সেন্টের গন্ধ পেয়েছিল। তারপর... তারপর...।'

সুকান্তি আচমকা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'মা, আমি একটু বাজারে বেরুচ্ছি। আচ্ছা, কাঁচালঙ্কা কি ফুরিয়ে গেছে, না আছে?'

'একশো নিয়ে আসিস।'

সুকান্তি একটা গানের কলি ভাঁজতে-ভাঁজতে বেরিয়ে গেল।

আমি পিসিমার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

'সুকান্তির সামনে পরের কথাগুলো বলতে অসুবিধে হত...।' পিসিমা বললেন, 'ও অবশ্য জানে—তাই আমার অসুবিধেটা বুঝতে পেরে চলে গেল। তোরা মেয়ে, তোদের সামনে বলা যায়...।

'এরপর লোকটা জয়তীর গায়ে হাত দিয়েছিল। ওর...ওর...এত...এত ভালো লেগেছিল যে, ও মুখ ফুটে বারণ করতে পারেনি।' পিসিমা চোখ নামালেন। ওঁর মুখে লালচে ভাব ফুটে উঠল।

শ্রুতিদিরও দেখলাম কান-টান লাল হয়ে গেছে। অনধিকারী ভালোবাসায় তৃপ্তি পাওয়া নিশ্চয়ই অন্যায়। কিন্তু শরীর যে সবসময় মনের কথা মানতে চায় না!

'এইসব করতে-করতেই লোকটা বিড়বিড় করে কবিতার মতো কী একটা আবৃত্তি করেছিল। জয়তী দু-চারটে লাইন মনে করে আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমার ঠিক মনে পড়ছে না। শুরুটা এইরকম ছিল : ''যে আমাকে চিরদিন...''। তারপর কী যেন—।'

শ্রুতিদি হঠাৎ বলে উঠল, '''যে আমাকে চিরদিন ভালোবেসেছে / অথচ যার মুখ আমি কোনোদিন দেখি নি, / সেই নারীর মতো''...তারপর খানিকটা ঝাপসা, মনে পড়ছে না...তারপর আবার ''আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃত চোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা, / আর তুমি নারী—/ এই সব ছিল সেই জগতে একদিন।'''

আমি অবাক হয়ে শ্রুতিদিকে দেখছিলাম। ও থামতেই বলে উঠলাম, 'নামটা তোমার শ্রুতির বদলে শ্রুতিধর হলে মানানসই হত।'

শ্রুতিদি হাসল।

পিসিমা আবার বলতে শুরু করলেন।

'তারপর ছায়াটা আলমারির কাছে যায়। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কীসব করতে থাকে। তারপর চলে আসে টেবিলের কাছে। সেখানে ঝুঁকে পড়ে খানিক সময় কাটিয়ে দেয়। জয়তী ভেবেছিল, লোকটা বোধহয় টেবিলের ড্রয়ারটা খোলার চেষ্টা করছে। যাই হোক, এরপর ছায়াটা চলে যায় আলমারির পেছনে। একদিক দিয়ে ঢুকে আর-একদিক দিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর আবার ফিরে আসে জয়তীর কাছে। আবার ওইসব শুরু করে দেয়। জয়তী যখন নেশার ঘোরে প্রায় তলিয়ে যাচ্ছে তখন হঠাৎই সামনের লাইন দিয়ে কানফাটানো শব্দ করে একটা ট্রেন ছুটে যায়। সঙ্গে-সঙ্গে জয়তীর সেন্স ফিরে আসে। ও চেঁচিয়ে ওঠে। তখন অন্ধকার ছায়াটা যেন হাওয়ায় ভেসে জানলার গ্রিল ভেদ করে পলকে পালিয়ে যায়।'

পিসিমার গল্প শেষ হতেই আমি হেসে বললাম, 'ভূত নয়, পিসিমা—চোর। খুব বদ টাইপের চোর। তোমাদের থানায় ইনফর্ম করা উচিত ছিল। লোকটা আলমারি খোলার চেষ্টা করে পারেনি। টেবিলের ড্রয়ারটাও খুলতে পারেনি। তখন তোমার ঘুমন্ত রিলেটিভকে নিয়ে অসভ্যতা করার চেষ্টা করেছে। ইস, আমি যদি কাল সময়মতো চেঁচিয়ে উঠতে পারতাম। তা হলে সুকান্তি লোকটাকে পাকড়াও করে কষে ধোলাই দিতে পারত—।'

পিসিমা মাথা নাড়লেন : 'না রে, চোর-টোর নয়। পাঁচ-সাত বছর ধরে লোকটা একই বাড়িতে একই ঘরে একই কাজ করে চলেছে—এ কখনও হয়! কই, পাড়ার আর কারও বাড়িতে তো কখনও এরকম শুনিনি! তা ছাড়া জানলার গ্রিলের মধ্যে দিয়ে লোকটা ঘরে ঢুকল কেমন করে, আবার পালালই বা কেমন করে! আর কাল রাতে বাইরে থেকে তোর ঘরের দরজার খিল-ছিটকিনি খুলল কেমন করে, বল!'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর জেদি গলায় বললাম, 'তুমি যে এত জোর দিয়ে বলছ, তুমি নিজে কখনও ভূতটাকে চোখে দেখেছ!'

পিসিমা পলকে কেমন উদাস হয়ে গেলেন। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে চোখ রাখলেন কিছুক্ষণ। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে কেমন এক অদ্ভুত গলায় বললেন, 'না, আমি দেখিনি। প্রথমবার এরকম ঘটনা শোনার পর আমি একা ও-ঘরে অনেক রাত কাটিয়েছি, কিন্তু কেউ আসেনি। আমাদের অনেক রিলেটিভ ও-ঘরে রাত কাটিয়েছে, কিন্তু কোনও প্রবলেম হয়নি। অবশ্য তারা বেশিরভাগই পুরুষ ছিল—আর দু-একজন বয়স্কা মহিলা। তাদের বেলা ওই নিশিকুটুম্ব দেখা দেয়নি। দ্বিতীয়বার সে দেখা দিল জয়তীর বেলায়। তখন জয়তী তোর মতোই—দেখতে-শুনতে সুন্দর, অল্প বয়েস। আমার মনে হয়, অল্পবয়েসি সুন্দরী মেয়েদের দিকে এই ভূতটার আলাদা কোনও টান আছে। ওদের প্রাণপণে ভালোবাসতে চায়। নইলে কেউ ওরকম করে! ওরকম কবিতা বলে!'

আমি ঠোঁট টিপে চোখ কপালে তুলে কিছুক্ষণ চিন্তা করলাম। তারপর মাথা নেড়ে বললাম, 'তুমি যতই বলো, পিসিমা, আমি ঠিক যেন ফুললি কনভিন্সড হাতে পারছি না।'

এবার শ্রুতিদি জবাব দিল, 'তুই তখন থেকে এরকম জেদ ধরে আছিস কেন, রিমকি। শুরুতে তুই-ই তো বললি ঘরটা হন্টেড। তা ছাড়া মা এই যে বলল, ছায়াটা আলমারির পেছনে ঢুকে গেল—একদিক দিয়ে ঢুকে আর-একদিন দিয়ে বেরিয়ে এল—এটা কি কোনও মানুষের পক্ষে ইমপসিবল নয়?'

'কেন, ইমপসিবল কেন!'

'আলমারির পেছনেই তো দেওয়াল। সেখানে দু-ইঞ্চিও ফাঁক নেই! তা হলে একটা গোটা মানুষ ঢুকবে কেমন করে!'

আমি দমে গেলাম।

শ্রুতিদি বলেই চলল, 'তোকে তো লোকটা টাচ করেছিল। ওটা কোনও মানুষের ছোঁয়া? তুই বল! তখন তোর মন-শরীর অবশ হয়ে যায়নি?' একটু চুপ করে থেকে শ্রুতিদি আবার নীচু গলায় বলল, 'ভাগ্যিস ট্রেনটা এসে গিয়েছিল...নইলে আরও বাজে কিছু হতে পারত!'

তার মানে! আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। কাল রাতে ঝমাঝম শব্দে ট্রেন ছুটে গেছে বলে আমি বাজে কিছু হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছি! পিসিমাদের ওই রিলেটিভ—জয়তী—সে-ও একইরকমভাবে বেঁচে গেছে!

শ্রুতিদি এত সব জানল কেমন করে! কী করে মনে রাখতে পারল কবিতার ওই রোমান্টিক লাইনগুলো!

শ্রুতিদির মুখ থমথম করছিল।

আমি জিগ্যেস করলাম, 'তুমি এত সব জানলে কেমন করে?'

শ্রুতিদির চোখে জল এসে গেল পলকে। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে ও উঠে দাঁড়াল। তারপর বলতে গেলে ছুট-পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমি খানিকটা অবাক হয়ে পিসিমার দিকে তাকালাম।

পিসিমা মাথা নীচু করে বসেছিলেন। সেই অবস্থাতেই বললেন, 'শ্রুতিকে দিয়ে ব্যাপারটা শুরু হয়। তার আগে কখনও কিছু হয়নি। সে-রাতেও ও একা শুয়েছিল ওই ঘরে। সেদিনটা আবার বাংলা বনধ ছিল। তাই কোনও ট্রেন চলেনি। অশরীরী সেই প্রেতটা সেদিন আর মাঝপথে থামেনি। ওর...ওর...সাধ মিটিয়ে তারপর উধাও হয়ে গেছে...।'

আমি পাথর হয়ে গেলাম। আমি এসব কী শুনছি।

পিসিমা কেঁদে ফেললেন : 'সেদিন থেকে শ্রুতি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিল। পরে...পরে...ওকে মানসিকভাবে সুস্থ করার জন্যে নকল অ্যাবরশন করাতে হয়। তোকে আমি লজ্জায় এ-কথা আগে বলিনি।

তা ছাড়া কেউই তো এসব কথা বিশ্বাস করবে না। সবই আমাদের কপাল...।

'জয়তীর ব্যাপারটার পর এত বছর পার হয়ে গেছে...তাই ভেবেছিলাম ঘরটার দোষ কেটে গেছে। এখন দেখছি যায়নি। আমাদের হয়তো বাড়িটাই ছেড়ে দিতে হবে...।'

শ্রুতিদির বিয়ে না করার কারণ হিসেবে কানাঘুষোয় কিছু-কিছু শুনেছিলাম। ভেবেছিলাম, আর-পাঁচটা ঘটনার মতোই ওর লাভার ওকে বিপদে ফেলে পালিয়েছে। কিন্তু এখন পিসিমার মুখে এসব কথা শোনার পর সবকিছু কেমন ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল।

আমি কল্পনায় এক অতৃপ্ত প্রেমিককে দেখতে পাচ্ছিলাম—যার বয়েস একশো, দুশো, তিনশো কি চারশো বছর। যার ভালোবাসার আকাঙ্ক্ষা আজও মেটেনি। এককালে সে হয়তো এইখানেই থাকত। পাগলের মতো আকুল ভালোবাসা নিয়ে কারও জন্যে অপেক্ষা করত।

আমি চোখ বুজে ফেললাম। পায়রার বুকের নরম পালক আমার শরীরে বিলি কাটতে লাগল। আমি একটা চেনা পারফিউমের গন্ধ পেলাম।

ঠিক তখনই পশ্চিমের রেল-লাইন ধরে ঝমঝম শব্দে একটা ট্রেন ছুটে গেল। তার হুইসলের শব্দটা আমার বুকের ভেতর পর্যন্ত পৌঁছে গেল।





# কনে-দেখা আলোয়

'সব মেয়েকেই ভালো দেখায়।' ছোট হয়ে-আসা বিড়িতে জোরালো টান দিয়ে মন্তব্য করলেন জগৎ শ্রীমানী।

'কনে-দেখা আলো কাকে বলে জানতে পারি কি?' বরেন মল্লিক পান চিবোচ্ছিলেন—একটু খোঁচা দিয়েই প্রশ্নটা ছুড়ে দিলেন জগৎ শ্রীমানীর দিকে।

আলোচনাটা শুরু হয়েছিল পাড়ার রবিশঙ্করবাবুর মেয়ের বিয়ে নিয়ে। গতকাল বিয়ের ব্যাপারটা মিটে গেছে। পাত্রের চেহারা একেবারে কার্তিকের মতো। অথচ মেয়ের চেহারা মোটেই মানানসই নয়। কালো-কোলো এই মেয়েটির পাত্রস্থ হওয়া নিয়ে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা ছিল অবশ্যই, তবে পাড়ার লোকেদের দুশ্চিন্তা ছিল যেন তার শতগুণ। তাই হঠাৎ করে সেই মেয়েটির বিয়ের নেমন্তন্ন পেয়ে অনেকেই বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন।

সুপ্রকাশ পালিত, জগৎ শ্রীমানী, বরেন মল্লিক, বিজন সরকার, আর প্রিয়নাথ জোয়ারদার—সকলেরই সেই বিয়েতে নেমন্তন্ন ছিল। তবে প্রিয়নাথের এক আত্মীয়ের বিয়ে ছিল গতকালই। ওঁকে সেখানে যেতে হয়েছিল—পাড়ার নেমন্তন্নে যেতে পারেননি।

বৈঠকখানায় বসে বেশ কিছুক্ষণ এই বিয়ে নিয়ে আলোচনার পর সুপ্রকাশ হঠাৎই বলেছিলেন, 'খোঁজ নিয়ে দেখুন, রবিশঙ্করবাবু হয়তো কনে-দেখা আলোয় মেয়েকে দেখিয়েছেন। তাই পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়ে গেছে...।'

তাঁর উত্তরে জগৎ শ্রীমানী মন্তব্য করেছেন এবং বরেন মল্লিক পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন।

বিড়ির শেষ টুকরোটা তক্তপোশে রাখা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন জগৎ শ্রীমানী। তারপর ভুরু উঁচিয়ে গোল-গোল চোখে বরেন মল্লিকের দিকে তাকিয়ে ভাঙা ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন, 'বরেন, তুমি কি সত্যিই জানতে চাইছ, না আমি জানি কি না সেটা টেস্ট করছ?'

বরেন মল্লিক ইতস্তত করে চোখ সরিয়ে নিলেন। বোঝা গেল, জগৎ শ্রীমানীর শেষের কথাটাই ঠিক।

প্রিয়নাথ গলাখাঁকারি দিয়ে অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন, বললেন, 'কনে-দেখা আলো কাকে বলে সবাই জানে। সূর্য ডুবে যাওয়ার ঠিক পরে—মানে, গোধূলির সময়—যে-আলোটা থাকে সেটাই কনে-দেখা আলো...।' হাসলেন ভূতনাথ : 'কিন্তু এটা কেউ বলতে পারেন, সেই আলোতে কেন কনেকে বা কাউকে ভালো দেখায়?'

চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক তুলে একে-একে তিনজনের মুখের দিকে তাকালেন ভূতনাথ।

সবাই চুপচাপ। মাথার ওপরে ব্রিটিশ আমলের কাঠের ব্লেডওয়ালা পাখা ঘুরছে, ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হচ্ছে।

হঠাৎই অ্যানসনিয়া পেন্ডুলাম ঘড়িতে ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। সকলে যেন ঘণ্টার শব্দ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

ঘণ্টার শব্দ শেষ হলে জগৎ শ্রীমানী বললেন, 'ওই আলোটা খুব নরম। মানে, মোলায়েমভাবে মুখের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে!'

বরেন মল্লিকের মুখ দেখে মনে হল, ব্যাখ্যাটায় তাঁর সায় আছে।

কিন্তু সুপ্রকাশ পালিত উসখুস করছিলেন, বারবার ভূতনাথের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

ভূতনাথ সিগারেটে মেজাজি টান দিয়ে জগৎ শ্রীমানীকে বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন—তবে ওটা ঠিক সায়েন্টিফিক এক্সপ্লানেশন হল না। আমি একটু ধার করা বিদ্যে জাহির করি। কারণ, বিজ্ঞান যেখানে শেষ সেখান থেকে আমার বিদ্যে শুরু। এটা আমি শুনেছিলাম এক সায়েন্টিস্ট বন্ধুর মুখে।

'কনে-দেখা আলোর মোদ্দা ব্যাপারটা হল, ওই আলোয় কোনও ছায়া পড়ে না। যাকে বলে ডিফিউজড লাইট। মানে, ঘষা কাচের মধ্যে দিয়ে আলো যেভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সেইজন্যেই মুখের ওপর আলোটা নরম মোলায়েম বলে মনে হয়।'

কিছুক্ষণ কেউই কোনও কথা বললেন না। বোধহয় প্রিয়নাথের ব্যাখ্যাটা মনে-মনে বুঝতে চেষ্টা করছিলেন।

হঠাৎই সবাইকে অবাক করে দিয়ে প্রিয়নাথ বললেন, 'রাতের কনে-দেখা আলোর কথা আপনারা কেউ কখনও শুনেছেন কি?'

'তার মানে!' হাই পাওয়ার চশমার কাচের পিছনে সুপ্রকাশ পালিতের চোখ দুটো অস্বাভাবিকরকম বড় দেখাল।

প্রিয়নাথ ম্লান হাসলেন। মাথা ঝুঁকিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়তে-ঝাড়তে বললেন, 'আমার তো বেশিরভাগ কাজ-কারবারই রাত নিয়ে। তবে এই ঘটনার শুরু হয়েছিল কনে-দেখা আলো দিয়ে। আর শেষও হয়েছে, বলতে পারেন কনে-দেখা আলো দিয়ে। তফাতের মধ্যে শুধু এই—প্রথমটা দিনের কনে-দেখা আলো, আর শেষেরটা রাতের।'

'রাতের কনে-দেখা আলো!' অস্ফুটে বললেন বরেন মল্লিক।

'হ্যাঁ, রাতের—' ভূতনাথ বললেন, 'ধরে নেওয়া যাক, ছেলেটির নাম সুজন—বয়েস আর কত হবে?—এই ছাব্বিশ-সাতাশ। আমার গল্পটা—মানে, সত্যি ঘটনাটা—ওকে নিয়েই। ও তখন ভালো চাকরি করে। মা-বাবা ওর জন্যে মেয়ে দেখে বেড়াচ্ছেন। একমাত্র ছেলেকে এবার সংসারী করে দেবেন ঠিক এইরকম একটা সময়ে ঘটনার শুরু...।'

ধানবাদ থেকে ট্রেনে ফিরছিল সুজন। সঙ্গে মা আর বাপি। মাসিমণির মেয়ের বিয়েতে ওরা চারদিনের জন্য ধানবাদ গিয়েছিল। মায়ের আরও ক'দিন থাকার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সুজন থাকতে চায়নি। কারণ, অফিস থেকে ও মাত্র চারদিনেরই ছুটি পেয়েছে। অফিসে জয়েন করেই ওকে আবার চেন্নাই ছুটতে হবে—অফিসের একটা নতুন প্রজেক্টের মিটিং আছে সেখানে।

বাপিরও অবশ্য বেশিদিন থাকার ইচ্ছে ছিল না। কলকাতায় ব্যবসার কাজ ছেড়ে কোথাও ওঁর মন বসে না। তাই সুজনের মায়ের মন খারাপ হওয়াটা খুব স্বাভাবিক।

ট্রেনে ওঠার পর থেকেই সান্ত্বনা দিচ্ছিল সুজন। বলছিল, ক'মাস পরেই ও ছুটি নিয়ে মাকে ধানবাদ ঘুরিয়ে নিয়ে যাবে। এবারে আর চারদিন নয়—কমপক্ষে দশদিন।

মা তবুও মুখ ভার করে বসেছিল।

বাপি কোনও কথা বলেননি। লম্বা সিটের এক কোণে বসে আপনমনে সিগারেট খাচ্ছিলেন, আর আড়চোখে সুজনদের দেখছিলেন।

সুজনের অনেক কথা গোমড়া মুখে শোনার পর শেষে মা বলল, 'তোর জন্যেই আরও দু-দিন থাকতে চেয়েছিলাম—আমার জন্যে নয়।'

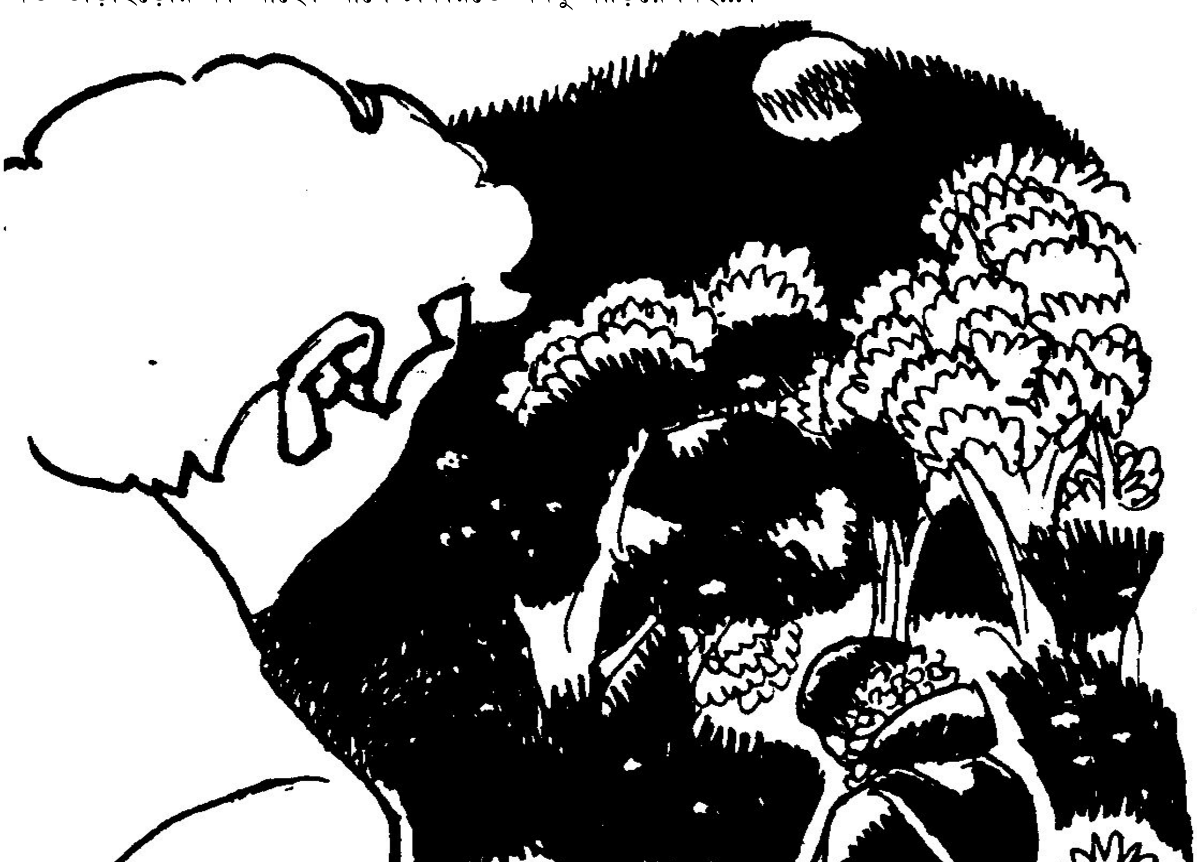
'কেন, আমার জন্যে কেন?' সুজন অবাক হয়ে জানতে চাইল।

'রুবিকে তোর জন্যে মেয়ে দেখতে বলেছিলাম। ও একটা মেয়ের খবর দিয়েছিল। দেখতে নাকি দারুণ। কাল বিকেলে ও রুবিদের বাড়িতে আসবে কথা ছিল। তোরা এমন করলি, মেয়েটাকে দেখার আর সময় পেলাম না।'

রুবি সুজনের মাসিমণির নাম। বিয়ের সম্বন্ধ করার ব্যাপারে মাসিমণির উৎসাহ অফুরন্ত। প্রায়ই অহঙ্কার করে বলেন, 'এ পর্যন্ত চোদ্দোটা বিয়ের সম্বন্ধ করেছি।'

সুজন মায়ের কাছেই শুনেছে, মাসিমণির টার্গেট নাকি পঁচিশটা সম্বন্ধ। তারপর তিনি এই গুরুদায়িত্বের কাজ থেকে রিটায়ার করবেন। তখন ভারতে বিয়ের হার নির্ঘাত গোত্তা খেয়ে নীচে নেমে যাবে।

সুজন জানে, ওর বিয়ের জন্য মা একেবারে আদা-জল খেয়ে লেগে পড়েছে। এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মেয়ের ফটো দেখেছে ও—কিন্তু ওর পছন্দ হয়নি। কোনও-কোনও সময় মাকে ও মিনমিন করে বলেছে, 'এত তাড়াহুড়োর কী আছে। আগে চাকরিতে একটু দাঁড়িয়ে নিই...।'






কিন্তু মা সেসবে আমল দেয়নি। অনুসন্ধান পুরোদমে চলেছে মায়ের আক্ষেপটা শোনার পর সুজন মাথা নেড়ে বলল, 'উফ, তোমাদের কিছু এনথু আছে বটে!'

'কী বললি?' ছেলের কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে মা প্রশ্ন করল।

সুজন বলল, 'না—কিছু না।'

তারপর জানলা দিয়ে বাইরের ছবি দেখতে লাগল।

গাছপালা, মাঠ-প্রান্তর, দিঘি, হাঁস, ফিঙে ঘুঘু—সব একে-একে ছুটে চলেছে উলটো দিকে। শুধু পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যটা জানলার ফ্রেমে নাছোড়বান্দার মতো আটকে রয়েছে।

কী অপূর্ব ছবি! এ-ছবি কেবল একজনই আঁকতে পারেন।

সুজন মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, আনমনা হয়ে গিয়েছিল। তাই খেয়াল করেনি, ট্রেন কখন যেন আসানসোল স্টেশনে এসে দাঁড়িয়েছে। চা আর শিঙারাওয়ালাদের চেঁচামেচি শোনা যাচ্ছে।

আজ রবিবার। তাই ট্রেন বেশ ফাঁকা। সুজনদের উলটোদিকের সিটে জানলার পাশ ঘেঁষে একজন মাত্র যাত্রী বসে আছেন। চোখে হাই পাওয়ার চশমা। থলথলে চেহারা। ধানবাদ থেকে ওঠার পরই একটা হিন্দি ম্যাগাজিন খুলে বসেছেন।

ট্রেন ছাড়ার হুইসল দিল। তারপর নড়ে উঠল। ঠিক তখনই সুজন দেখল তিনজনের একটি পরিবার ওদের কিউবিকল-এর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। তিনজনেরই চোখের নজর পছন্দসই সিট খুঁজছে।

লম্বা সিটটা প্রায় খালি দেখে পরিবারের কর্তা তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই, এখানে এসো—।'

সুজনদের উলটোদিকে ওরা তিনজন বসে পড়ল।

ভদ্রলোক প্রৌঢ়। তার স্ত্রীর বয়েসও মানানসই। আর ওঁদের মেয়ের বয়েস কত হবে? বড়জোর কুড়ি-বাইশ।

মেয়েটির বোধহয় জানলার কাছে বসার ইচ্ছে ছিল। কারণ, সুজন লক্ষ করল, খানিকক্ষণ উশখুশ করার পর ও হিন্দি-ম্যাগাজিন-পড়া ভদ্রলোককে নীচু গলায় কিছু একটা অনুরোধ করল।

ভদ্রলোক চমকে উঠে মেয়েটির দিকে তাকালেন। তারপর সৌজন্য দেখিয়ে বললেন, 'হাঁ, হাঁ, কিঁউ নহি—।' এবং কষ্ট করে উঠে সিটের একেবারে এ-প্রান্তে এসে বসলেন—যাতে ওরা তিনজন পাশাপাশি বসতে পারে।

সুজন মেয়েটিকে একটু খুঁটিয়ে দেখছিল—অনেকটা যেন পাত্রী দেখার চোখে। হলুদ-কালোয় ছাপা চুড়িদার। গলায় সরু চেন। কানে চকচকে পাথরকুচি বসানো দুল। বাঁ-হাতে ঘড়ি। কপালে সরষের দানার মতো টিপ।

গায়ের রং ময়লা। মুখটা সামান্য লম্বাটে। নাক—স্পষ্ট। তার ডান পাশে একটা বড় জরুল। ঠোঁট কালচে গোলাপি। চিবুকে ছোট্ট টোল রয়েছে।

মেয়েটির চোখ দুটি অতি সাধারণ। তবে চোখের পালক বেশ ঘন এবং লম্বা। মাথায়ও অনেক চুল। আলগা বেণীর বেশ খানিকটা সিটের ওপরে সাপের মতো এঁকেবেঁকে পড়ে আছে।

মেয়েটি মোটেই সুন্দরী নয়। তবে সুশ্রী বলা যায় অনায়াসেই। আচ্ছা, সুজন যদি পাত্রী দেখতে যেত তা হলে এই মেয়েটিকে কি ও সত্যি পছন্দ করত? বোধহয় না।

সুজনের এখন এই এক মুশকিল হয়েছে। অবিবাহিতা কোনও তরুণী দেখলেই ওর মন পাত্রী দেখার মাপকাঠিতে তার সৌন্দর্য মাপতে চায়। এ এক অদ্ভুত খেলা। মনকে হাজার বারণ করেও সুজন বাগ মানাতে পারেনি। এ জন্য নিজের ওপরে ওর মাঝে-মাঝে ভীষণ রাগ হয়।

নিজের এই পাগলামিতে সুজন আপনমনেই হেসে ফেলল। ওর খেয়াল ছিল না, তখন ও আনমনাভাবে তাকিয়ে ছিল মেয়েটিরই দিকে।

'হাসছেন কেন?'

সুজন একেবারে হকচকিয়ে গেল। কী বলবে ভেবে পেল না।

কারণ, মেয়েটিই সামান্য বিরক্ত গলায় প্রশ্নটা ছুড়ে দিয়েছে। ওর ভুরু কুঁচকে গেছে। চোখে সন্দেহের ছায়া।

দুজনেরই মা-বাবা পাশে বসা। সুজন খুব বিব্রত হয়ে পড়ল। ওর মুখ লাল হয়ে গেল। কানে উত্তাপ টের পেল।

কোনওরকমে ও বলল, 'আপনি মনে হয় ভুল বুঝেছেন। আমি আনমনা হয়ে স্কুল লাইফের কথা ভাবছিলাম। তখনকার একটা মজার ব্যাপার হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় হাসি পেয়ে গেছে...।'

মেয়েটি এই উত্তরে তেমন খুশি হল বলে মনে হল না। তাই সুজন সাততাড়াতাড়ি স্মৃতি হাতড়ে একটা স্কুলের গল্প শুনিয়ে দিল।

গল্পটা সত্যিই মজার ছিল। তাই মেয়েটিও হেসে ফেলল।

দুই পরিবারের গল্প শুরু হয়ে গিয়েছিল খানিক আগেই। কথায়-কথায় জানা গেল মেয়েটির নাম চন্দ্রা। ওদের 'দেশ' আসানসোল। সেখানে এক আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষে ওরা এসেছিল। এখন কলকাতায় ফিরছে। ধানবাদেও ওদের দু-চারজন আত্মীয় আছে। কখনও-কখনও ধানবাদেও ওরা বেড়াতে যায়।

টুকরো-টুকরো কথা হচ্ছিল, চা খাওয়া হচ্ছিল। তারই মধ্যে সুজন লক্ষ করল, মা বারবার ওর দিকে দেখছে। মনে হল যে ইশারায় কিছু একটা জানতে চাইছে। সুজন মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল।

চন্দ্রা তখন ওর জানলার তাকে বাঁ হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে ওর হাতের পিঠের ওপরে চিবুক রেখেছে। দু-চোখ মেলে দেখছে বাইরের দিকে। ওর কয়েক গোছা চুল হাওয়ার উড়ছে—কখনও কপালে পড়ছে, কখনও চোখের ওপর।

বাইরে তখন সূর্য ডুবে গেছে। কিন্তু তার দীপ্তির আভা থেকে গেছে আকাশময়। এ সময়ে মেঘের যা কাজ তাই করেছে। সূর্যের ভালোবাসায় কুটিকুটি হয়ে রামধনুর নানান রং মেখে পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে পড়েছে। অপরূপ এক আলো সবাইকে তখন সুন্দর করে তুলেছে। গাছপালা, ধানখেত, পুকুর, ইলেকট্রিক-তারে বসে থাকা পাখি—সবই কেমন যেন অন্যরকম দেখাচ্ছে।

চন্দ্রাকেও তখন অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

এই অসামান্য আলোয় ওকে দেখে সুজন মুগ্ধ হয়ে গেল। ওর বুকের ভেতরে এক অদ্ভুত অনুভূতি মুচড়ে উঠল। কিশোর বয়েসের প্রথম প্রেমের মতো ওর মনে হল, চন্দ্রাকে না পেলে বাঁচবে না।

কলকাতায় ফিরেও এই অনুভবটা ওর একটুও পালটাল না। অফিসে জয়েন করে, চেন্নাইয়ে মিটিং-এ গিয়ে, আবার বাড়িতে ফিরে—সবসময় ওর নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগল।

এর নাম যদি প্রেম হয় তা হলে মানতেই হবে এ বড় অদ্ভুত প্রেম!

ঠিকানা আদান-প্রদান ট্রেনেই হয়েছিল। সুতরাং বেশ কিছুদিন উদাসভাবে ছটফট করে কাটানোর পর সুজন একদিন চিঠি লিখল চন্দ্রাকে।

প্রথম চিঠিটা ছিল নির্দোষ বন্ধুত্বের চিঠি। উত্তরও এল অনেকটা সেইরকম।

কিন্তু ধীরে-ধীরে চিঠিগুলোর রং বদলাতে লাগল। সুজন আর চন্দ্রার নিয়মিত দেখা হতে লাগল। এক রহস্যময় টান সুজনকে চন্দ্রার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ফেলতে চাইল।

মা ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মনে-মনে খুশি হয়েছিল। তবে আক্ষেপের একটা ছোট্ট খোঁচা তাকে কখনও-কখনও বিরক্ত করছিল : চন্দ্রার চেয়ে সুন্দরী বেশ কয়েকটি মেয়েকে সুজন এর আগে নাকচ করেছে। যদিও তাদের বংশমর্যাদা, ধনসম্পদ, ইত্যাদি ছিল অনেক উঁচু মানের।

কিন্তু প্রেম কখনও অভিভাবকদের ইচ্ছেমতন পথ চলে না। সুতরাং, দুই পরিবারের সমঝোতায় আনুষ্ঠানিকভাবে বিয়ের কথাবার্তা শুরু হল। এবং বিয়ের দিনক্ষণও ঠিক হয়ে গেল।

ঠিক এইরকম একটা সময়ে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

চন্দ্রারা সপরিবারে রাতারাতি নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

নিরুদ্দেশই বলা যায়, কারণ সুজন একদিন ওদের বেলঘরিয়ার বাড়িতে গিয়ে দ্যাখে ওদের দরজায় তালা ঝুলছে।

আশপাশে খোঁজখবর করে স্পষ্ট কিছু জানা গেল না। দু-একজন ভাসা-ভাসা ভাবে বললেন, যে, ওদের কোন এক আত্মীয় নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সেই খবর পেয়ে ওরা তাড়াহুড়ো করে চলে গেছে।

এর বেশি আর কোনও খবর জোগাড় করতে পারল না সুজন। ভাঙচোরা মন নিয়ে ফিরে এল। ওর রঙিন হয়ে ওঠা জীবনটা চোখের পলকে সাদা-কালো হয়ে গেল।

বিষণ্ণ বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যে সুজনের দিন কাটতে লাগল। অবশ্য দিন না বলে সেগুলোকে রাত বলাই ভালো। চন্দ্রার কোনও খবর পাওয়া গেল না, কোনও চিঠিও এল না। সুজনের মা-বাপি ধাক্কাটা ধীরে-ধীরে সামলে নিতে পারলেও সুজন পারল না। ও কেমন চুপচাপ হয়ে গেল। অফিসের কাজে আরও বেশি করে ডুবে গেল। আগ বাড়িয়ে অফিসের টুরে যেতে লাগল, আর চলার পথে তিনটে চেনা মুখকে পাগলের মতো খুঁজে বেড়াতে লাগল। চন্দ্রাকে খুঁজে পাওয়ার আশা ছেড়ে দিয়েও ও ঠিক যেন ছাড়তে পারেনি।

প্রায় একবছর পর চলন্ত ট্রেনের কামরায় বিবাগী সুজন হঠাৎই চন্দ্রার বাবা অপরেশবাবুকে দেখতে পেল।

কিন্তু এ কী চেহারা হয়েছে অপরেশবাবুর!

সারা মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি। গাল চুপসে গেছে। চোখ গর্তে বসা। কপালের শিরা ফুলে উঠেছে। গায়ের রং আগের তুলনায় অনেক কালচে হয়ে গেছে। মাথার চুলের চেহারা দেখে মনে হয় বহুদিন তাতে তেল-জল পড়েনি।

অপরেশবাবুকে দেখেই চন্দ্রার কথা মনে পড়ে গেল সুজনের। উঃ কতদিন...কতদিন পর চন্দ্রার ঘনিষ্ঠ একজন আত্মীয়কে সুজন দেখতে পেল!

সুজন পূর্বা এক্সপ্রেস ধরে দিল্লি থেকে ফিরছিল। অফিস থেকে ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াতের সুযোগ থাকলেও ও সেকেন্ড ক্লাসে যাতায়াত করে। চন্দ্রারা নিরুদ্দেশ হওয়ার পর থেকে ও এই অভ্যেসটা রপ্ত করেছে। ওর মনে অদ্ভুত এক আশা ছিলঃ যদি আচমকা কোনও ট্রেনে চন্দ্রার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়! দিল্লির ট্রেন ধানবাদ আসানসোল ছুঁয়ে যায়। তাই অফিস থেকে ও প্রায়ই দিল্লি টুরের দায়িত্ব চাইত।

এবারে টুর সেরে ফেরার পথে ট্রেন যখন ধানবাদে দাঁড়িয়েছে তখনও ও বরাবরের মতোই জানলা দিয়ে চঞ্চল চোখ মেলে ধরেছে, আর্তের মতো খুঁজছে একটা চেনা মুখ—কিন্তু বরাবরের মতোই হতাশ হয়েছে।

ট্রেন প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লেটে চলছিল। সহযাত্রীরা অনেকেই বিরক্তির মন্তব্য করছিল। সুজনের সেগুলো কানে ঢোকেনি। ও চোখ বুজে বিভোর হয়ে চন্দ্রার কথা ভাবছিল।

আচমকা অপরেশবাবুকে চিনতে পেরে সুজনের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল গলার কাছে।

কামরার দেওয়ালে মাথা হেলিয়ে জীর্ণ-শীর্ণ মানুষটা শূন্য চোখে চেয়ে আছে একটা সিলিং ফ্যানের দিকে। ওঁর পায়ের কাছে একটা বড় থলে।

'মেসোমশাই!' ওঁর কাছে গিয়ে ডাকল সুজন।

অপরেশবাবু চমকে উঠে তাকালেন সুজনের দিকে। কামরার মলিন আলোয় ঝাপসা নজরে ওকে ঠাহর করতে চাইলেন।

'মেসোমশাই, আমি সুজন। মাসিমা কেমন আছেন? চন্দ্রা কেমন আছে?'

অপরেশবাবু সুজনকে চিনতে পেরে ব্রিবত হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, চোখ নামিয়ে বসে রইলেন অপরাধীর মতো।

সুজন বসে পড়ল ওঁর পাশেঃ 'এ কী চেহারা হয়েছে আপনার। চন্দ্রা, মাসিমা...ওঁরা কেমন আছেন?'

অপরেশবাবু আর সামলাতে পারলেন না। বুকের ভেতর থেকে পাক খেয়ে উঠে আসা একটা কষ্ট ওঁকে ভেঙেচুরে দিল। শীর্ণ হাতে সুজনের হাত চেপে ধরে তিনি থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। কিছু একটা বলতে চেয়েও যেন বলতে পারছিলেন না—শুধু ঠোঁট বেসামালভাবে কাঁপছিল, চোখ দুটো ভিজে উঠছিল পলকে।

অনেকগুলো নীরব মুহূর্ত এইভাবে কেটে গেল।

সুজন মানুষটাকে সময় দিল। অনেক প্রশ্ন ওর মনে ভিড় করে এলেও ও চুপ করে রইল।

নিজস্ব তালে শব্দ তুলে টেন ছুটে চলেছে। বাইরের অন্ধকার ভেদ করে তিরের মতো ছুটে আসছে বাতাস। বাতাসে সামান্য ঠান্ডা ভাব। শীত আর বেশি দূরে নেই।

অনেকক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বলতে পারলেন অপরেশবাবু।

মালবাজারে ওঁর ছোট ভাইয়ের হঠাৎই হার্ট অ্যাটাক হয়। তার সঙ্গে পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা এতটাই ছিল যে, টেলিগ্রাম পাওয়ামাত্রই ওঁরা তিনজনে ছুটে যান শিলিগুড়ি। শহর থেকে প্রাইভেট কারে করে মালবাজারে যাওয়ার পথে একটা ট্রাকের সঙ্গে ওঁদের গাড়ির মারাত্মক অ্যাক্সিডেন্ট হয়। চন্দ্রা, চন্দ্রার মা—দুজনেই সাঙ্ঘাতিকরকম চোট পায়। বাঁচার কোনও আশাই ছিল না। তারপর বহু কষ্ট করে ডাক্তার-হাসপাতাল, জড়িবুটি-কবিরাজ, ঝাড়ফুঁক-তন্ত্রমন্ত্র করে কোনওরকমে শেষ রক্ষা হয়। অপরেশবাবুর বাঁ-হাতটা ভেঙে গিয়েছিল, তা ছাড়া মাথাতেও চোট পেয়েছিলেন। সেসব সামলে ওঠার পর কারও সঙ্গে তিনি আর যোগাযোগ করেননি—যোগাযোগ করার মতো পরিস্থিতিও ছিল না। তাই ওঁরা একরকম অজ্ঞাতবাসে চলে

যান। আসানসোলের এক নির্জন প্রান্তে গিয়ে নতুন ঠিকানায় থাকতে শুরু করেন। অপরেশবাবু একসময় গিয়ে কলকাতার পাট চুকিয়ে চলে আসেন। তারপর থেকে সম্পর্কের সব ডালপালা ছিন্ন করে ওঁরা একান্তে চুপিচুপি দিন কাটান।'

'...এ আমাদের নিজেদের দুনিয়া, সুজন। এখানে কেউ ঢুকতে পারে না...এখান থেকে কেউ চলে যেতেও পারে না...।' বুক ভাঙা এক দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অপরেশবাবু।

ওঁর কাহিনির সবটুকু সুজনের কাছে স্পষ্ট হয়নি। কেন ওঁরা আত্মগোপন করে রয়েছেন? তা হলে কি দুর্ঘটনার পর চন্দ্রা আর মাসিমার মুখ বীভৎস কুৎসিত ভয়ংকর হয়ে গেছে! এমন কী হয়েছে, যে ওরা এরকম চোরের মতো মুখ লুকিয়ে বসে আছে!

সুজন ভেতরে-ভেতরে অস্থির হয়ে পড়ছিল। চন্দ্রাকে একটিবার দেখার জন্য ওর অন্তরাত্মা ছটফট করছিল।

আর থাকতে না পেরে ও বলল, 'আমি...আমি চন্দ্রার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।'

'না, তা আর হয় না।' শীর্ণ অবসন্ন অপরেশবাবু ক্লান্তভাবে মাথা নাড়লেন।

'মেসোমশাই, প্লিজ! আপনি জানেন না, এই একটা বছর আমি কীরকম পাগলের মতো আপনাদের খুঁজে বেড়িয়েছি! অফিসের টুরে সবসময় সেকেন্ড ক্লাসে ট্যাভেল করি শুধু এই আশায় যে, কোনদিন হুট করে আপনাদের কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সত্যিই...দেখা হল তো!' সুজন কেঁদে ফেলল। কনে-দেখা আলোয় প্রথম চন্দ্রাকে দেখার অপরূপ ছবিটা ওর বুকের ভেতর থেকে হঠাৎ করেই চলে এল চোখের সামনে।

ও কিছুতেই কান্না চাপতে পারছিল না। এতদিনের কষ্ট, জ্বালা, যন্ত্রণা, যেন এই প্রথম অন্ধকার কুঠরি থেকে বেরিয়ে এল বাইরে।

অকালবৃদ্ধ মানুষ্টার হাত আঁকড়ে ধরে ভাঙা গলায় সুজন বলল, 'একটিবার...মেসোমশাই, প্লিজ...একটিবার...।'

আকুল যুবকটির কান্না-ভেজা চোখে অপরেশবাবু কী দেখলেন কে জানে! নরম গলায় বললেন, 'চলো। কিন্তু চন্দ্রা কি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে?'

'কেন, দেখা করতে চাইবে না কেন!'

'ও...ও অনেক...বদলে গেছে...।'

কেমন বদলে গেছে চন্দ্রা? দুর্ঘটনায় ওর চেহারা বদলে গেছে? নাকি মনটা?

সুজন শত ভেবেও কোনও উত্তর খুঁজে পাচ্ছিল না। এলোমেলো বহুরকম ভাবনা ওর মনের ভেতরে উথালপাথাল করতে লাগল।

এরকম একটা মনের অবস্থা নিয়ে আসানসোল স্টেশনে নামল সুজন। স্টেশনের বাইরে এসে ওরা একটা সাইকেল রিকশায় উঠে বসল।

জ্যোৎস্নার রাত। কালো ভেলভেটের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। কারও কাছে কিছু ধার করে সেটা অকাতরে বিলিয়ে দেওয়া বড় সহজ নয়। অথচ চাঁদ হাসিমুখে ধার করা আলো বিলিয়ে চলেছে।

সাইকেল রিকশা ছুটছিল। বাতাসে সামান্য শীত-শীত ভাব। সুজন বেশ গুটিসুটি মেরে বসল। অপরেশবাবু আপনমনে সিগারেট খাচ্ছিলেন। কোনও কথা বলছিলেন না।

শুরুতে একবার শুধু বিড়বিড় করে বলেছিলেন, 'তুমি ওদের সঙ্গে দেখা না করলেই ভালো করতে! কিন্তু তুমি যেভাবে জেদ ধরেছ...। অবশ্য তোমার কষ্টটাও আমি বুঝি...।'

জনপদ ক্রমশ কমছিল। রাস্তায় লোকজন আঙুলে গোনা যায়। সাইকেল রিকশাও চোখে পড়ছে কম। শুধু সুজনদের নিয়ে এই রিকশাটা একঘেয়েভাবে ছুটে চলেছে। কখন থামার সময় আসবে কে জানে!

একসময় পিচের রাস্তা শেষ হয়ে কাঁচা রাস্তা শুরু হতেই রিকশা থামালেন অপরেশবাবু। রিকশা থেকে নেমে ওঁরা হাঁটা পথ ধরলেন।

হাঁটা পথ একসময় শেষ হল। টিনের চাল দেওয়া বড়সড় একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে অপরেশবাবু আলতো গলায় বললেন, 'এসো, সুজন—আমরা এখন এখানেই থাকি।'

বাড়ির ভেতরে ঢুকেই কেমন অদ্ভুত লাগল সুজনের। ঠান্ডার কামড়টা বাইরের চেয়ে যেন বেশি। আর হালকা ন্যাপথালিনের গন্ধে পরিবেশটা ভারী হয়ে রয়েছে।

বড় মাপের বসবার ঘর। তার চারটে জানলাই হাট করে খোলা। এদিক-ওদিক ছিটকে পড়া চাঁদের আলো চোখে পড়ছে। আর ঘরের আলো এতই কম যে, চাঁদের আলোর সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিচ্ছে।

'এত কম আলো...আপনাদের অসুবিধে হয় না?' সুজন অবাক হয়ে বলল।

'অসুবিধে?' শব্দ করে সামান্য হাসলেন অপরেশবাবু। ওঁর মুখে ছায়া পড়ায় হাসিটা দেখা গেল না : 'আলো না থাকলেই বরং আমাদের সুবিধে হয়। ওরা তো একদম আলো সহ্য করতে পারে না। আমিও আস্তে-আস্তে ওদের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি।'

সুজনের মনের ভেতরে হঠাৎই কেমন একটা অস্বস্তি শুরু হল। ওর চোখ এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে চন্দ্রাকে, মাসিমাকে খুঁজল।

সেটা লক্ষ করে অপরেশবাবু বললেন, 'তুমি বোসো—আমি ওদের ডাকছি।'

একটা কাঠের চেয়ারে বসল সুজন। কিন্তু কাঠের চেয়ারটা ভীষণ ঠান্ডা। ও বেশ অবাক হয়ে গেল। হাতের ব্রিফকেসটা নামিয়ে রাখল একপাশে।

অপরেশবাবু চলে যাওয়ার একটু পরেই মাসিমা ঘরে এসে ঢুকলেন।

কী জমকালো সাজে সেজেছেন তিনি! ম্লান আলোতেও সেই সাজ গ্লো-সাইনের মতো ঝকমক করছে।

গাঢ় হলুদ রঙের জরিপাড় শাড়ি। দু-হাত ভরা গয়না। গলায় জড়োয়া হার। কানে চকচকে দুল। নাকে নাকছাবি। কপালে বড় টিপ। সিঁথিতে উজ্জ্বল সিঁদুর। যেন একেবারে নতুন বউ।

মাথায় ঘোমটা টেনে শাড়িটা গুছিয়ে নিয়ে সুজনের কাছাকাছি বসলেন মাসিমা।

'কেমন আছ, সুজন?'

সুজন বিহ্বল চোখে চন্দ্রার মাকে দেখছিল, কোনওরকমে ঘাড় নাড়লঃ 'ভালো আছি।'

মেসোমশাইয়ের কাছে আমাদের বিপদ-আপদের কথা সব তো শুনেছ।'

সুজন আবার ঘাড় নাড়ল।

এতদিন পর দেখা হল, অথচ মাসিমার মধ্যে কোনও উচ্ছ্বাস নেই। যেন আগে থেকেই জানতেন, সুজন আজ দেখা করতে আসবে!

'কেমন আছেন, মাসিমা?'

'ওই একরকম...।'

'চন্দ্রা কেমন আছে?'

বিষণ্ণ হাসলেন মাসিমাঃ 'ওই আমারই মতন।'

ঘরের আলোটা কমজোরি হলেও সরাসরি মাসিমার মুখের ওপরে গিয়ে পড়েছিল। সুজন মুখটাকে আগের চেনা মুখের সঙ্গে মনে-মনে মিলিয়ে দেখছিল।

মুখের চামড়া তেলতেলে টানটান। দু-চোখ ছবির মতো সুন্দর। মাসিমার মুখটা হয়তো এরকমই ছিল, তবে এখন অনেক সজীব আর নবীন দেখাচ্ছে।

সুজনের ছৌ-নাচের মুখোশের কথা মনে পড়ল।

মাসিমার টুকটাক কথা বলার মধ্যেই অপরেশবাবু সুজনের জন্য এক কাপ চা নিয়ে এলেন। সঙ্গে প্লেট নেই, বিস্কুট নেই।

সব মিলিয়ে দৃশ্যটা সুজনের কেমন খাপছাড়া লাগল। মাসিমা, চন্দ্রা থাকতে অপরেশবাবু হঠাৎ চা করতে গেলেন কেন! তা ছাড়া ওঁদের অবস্থা কি এখন এতই খারাপ যে, অতিথির কপালে প্লেট বা বিস্কুটও জোটে

না!

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুজন ন্যাপথালিনের গন্ধ পেল। এই বিশ্রী গন্ধটা ওঁরা কীভাবে সহ্য করছেন কে জানে!'

'সব কাজ আমাকে একার হাতেই করতে হয়...' হাতে হাত ঘষে অনেকটা যেন কিন্তু-কিন্তু ভাবে অপরেশবাবু বললেন, 'ওরা ঠিক পারে না...।'

অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারটা নিয়ে খানিকক্ষণ কথা হল। চন্দ্রার কথাও হল। সুজনের মা-বাপির খোঁজ নিলেন মাসিমা। কিন্তু ওঁর কথায় উষ্ণতার কোনও ছিটেফোঁটাও খুঁজে পাচ্ছিল না সুজন। টিভিতে যাঁরা খবর পড়েন মাসিমা যেন ঠিক তাঁদের মতন করে কথা বলছিলেন।

কিছুক্ষণ পর যখন কেউ আর কথা খুঁজে পাচ্ছিল না তখন ভেতরে- ভেতরে অধৈর্য হয়ে ওঠা সুজন জিগ্যেস করল, 'চন্দ্রা কোথায়, মাসিমা? ওর সঙ্গে একটু দেখা করব...।'

'দেখা করবে করো। ও বাইরের বাগানে বসে আছে।' নির্লিপ্তভাবে এই কথা বলে বাড়ির পিছনদিকটা ইশারায় দেখালেন মাসিমা।

অপরেশবাবু সুজনকে ডাকলেন, 'এসো, আমার সঙ্গে এসো—।'

একটা ছোট ঘর এবং রান্নাঘর পেরিয়ে বাড়ির খিড়কি দরজার কাছে পৌঁছে গেল সুজন। অপরেশবাবু দরজা খুলে বাইরে বেরোলেন, ওকেও ডেকে নিলেন।

সামনে প্রায় বিঘেখানেক জমি। তার এখানে-সেখানে এলোমেলোভাবে নানান জাতের গাছ বড় হয়ে উঠেছে। তবে একপাশে অনেকটা জায়গা ফাঁকা পড়ে আছে। সেখানে কয়েকটা বেদি চোখে পড়ছে। হয়তো অপরেশবাবুই সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করিয়ে নিয়েছেন।

সবক'টা বেদি খালি—শুধু একটি ছাড়া। সেখানে ছায়া-ছায়া কেউ একজন বসে আছে।

'চন্দ্রা—।' অপরেশবাবু চাপা গলায় ডাকলেন।

নীচু গ্রামের সেই ডাক চন্দ্রা দিব্যি শুনতে পেল, সামান্য ঘাড় ফেরাল সুজনদের দিকে।

'তুমি যাও—কথা বলো।' সুজনকে আলতো করে ঠেলে দিলেন অপরেশবাবু। তারপর ফিরে চলে গেলেন বাড়ির ভেতরে। চন্দ্রার সঙ্গে একা কথা বলতে পারলে সুজন খানিকটা হালকা হবে।

কেমন যেন সম্মোহিতের মতো সুজন এক পা দু-পা করে এগিয়ে চলল চন্দ্রার দিকে। পায়ের নীচে ঠান্ডা ঘাসের ছোঁওয়া ওর শরীরে একরকম শিরশিরানি জাগিয়ে তুলছিল। এক ঝাঁক পাখির মতো উড়ে এসে রাতের বাতাস সুজনের চোখে-মুখে ঝাপটা মারল।

এক টুকরো মেঘ কোথা থেকে ভেসে এল। পুর্ণিমার চাঁদকে সেটা ঢেকে দিতেই কটকটে জ্যোৎস্নার আলো-ছায়া উধাও হয়ে গেল। এক পরিব্যাপ্ত ঘষা আলো মোলায়েমভাবে ছড়িয়ে পড়ল চরাচরে।

সুজনের কনে-দেখা আলোর কথা মনে পড়ে গেল।

ও পায়ে-পায়ে পৌঁছে গেল সেই বেদির কাছে। চন্দ্রার কাছ থেকে হাতদুয়েক দুরত্বে বসে পড়ল।

চন্দ্রার সাজপোশাক সুজনকে মোটেই অবাক করল না। কারণ, একটু আগেই ওর মায়ের জমকালো সাজ ও দেখেছে। তবে চন্দ্রার সাজ যেন হুবহু মায়ের মতন—এমনকী ঘোমটাটা পর্যন্ত!

চন্দ্রার পরনে টুকটুকে লাল শাড়ি, যদিও চাঁদের আলোয় রংটা ভালো করে ঠাহর হচ্ছে না। সারা গায়ে গয়না। খোঁপার পাশ থেকে ফুলের মালা ঝুলছে। তার ওপর দিয়ে ঘোমটা টানা। আর ঘোমটার ভেতরে চন্দ্রার টলটলে মুখ।

'চন্দ্রা!' আবেগমথিত গলায় ডেকে উঠল সুজন। ন্যাপথালিনের গন্ধটা তখনও ওর নাকে আসছে।

চন্দ্রা ওর ডাকে মুখ ফেরাল। কোনও কথা বলল না।

চন্দ্রার মাথায় ঘোমটা কেন! ওর কি তা হলে বিয়ে হয়ে গেছে! কিন্তু কপালে বা সিঁথিতে তো সিঁদুরের ছোঁওয়া চোখে পড়ছে না!

'চন্দ্রা, এই একটা বছর আমি তোমাকে পাগলের মতো খুঁজেছি। যন্ত্রণায় ছিন্নভিন্ন হয়ে আমি শেষ হয়ে গেছি। আমার কথা তোমার মনে পড়েনি?'

'পড়েছে।' আবেগহীন গলায় বলল চন্দ্রা, 'কিন্তু কোনও উপায় ছিল না। তুমি আমাকে খুঁজে পাও...আমাদের খুঁজে পাও...আমরা চাইনি। কিন্তু সবই নিয়তি! নইলে বাবার সঙ্গে আচমকা তোমার দেখা হবে কেন!'

এ কোন চন্দ্রা! এ রকম কোনও চন্দ্রাকে তো সুজনের মনে পড়ছে না।

'আমি এখনও তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি, চন্দ্রা...।'

'অপেক্ষা!' খিলখিল করে হাসল চন্দ্রাঃ 'আমার সব অপেক্ষা শেষ হয়ে গেছে। তুমি এবার চলে যাও।'

অবাক হয়ে চন্দ্রার মুখের দিকে তাকাল সুজন। চন্দ্রা ওকে ফিরিয়ে দিচ্ছে। ও তো ভেবেছিল রাতটা এখানে থাকবে। তারপর কাল সকালে বিয়ের কথাবার্তা পাকা করে তবে ফিরবে!

চন্দ্রাকে হারিয়ে পাওয়ার আনন্দ সুজনের অন্যান্য চেতনা আর বোধ আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। ও হতবাক হয়ে চন্দ্রার দিকে তাকিয়ে ছিল।

রাতের বাতাস হঠাৎই যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। গাছের পাতা শিরশির শব্দ তুলল। জোনাকিরা এদিক-ওদিক উড়ছে। আর টলটলে জ্যোৎস্নার অপরূপ কনে-দেখা আলো রাতকে আরও সুন্দর, আরও রহস্যময়ী করে তুলেছে।

ঘোমটার আড়ালে চন্দ্রাকে যেটুকু দেখা যাচ্ছিল তাতেই মাতাল হয়ে গিয়েছিল সুজন। ও সামনে ঝুঁকে পড়ে চন্দ্রার একটা হাত মুঠো করে ধরল।

সঙ্গে-সঙ্গে চিৎকার করে উঠল চন্দ্রা। এক ঝটকায় হাত টেনে নিতে চাইল। বাতাসের ঝাপটায় ওর ঘোমটা খসে গেল।

'এসব কী করছ! তুমি চলে যাও!'

অবাক হয়ে সুজন হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল। তবে চন্দ্রাকে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। দেবী প্রতিমার মতো মসৃণ তেলতেলে মুখ চাঁদের আলোয় অনন্য হয়ে উঠেছে।

'চন্দ্রা!' আবার ডেকে উঠল সুজন, 'আমি চলে যাওয়ার জন্যে আসিনি।' ওর বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে উঠছিল।

হঠাৎই পিছন থেকে অপরেশবাবুর গলা পাওয়া গেল : 'তুমি চলে যাও, সুজন। তাতে সবার ভালো হবে।'

চমকে মুখ ফেরাতেই অপরেশবাবুকে দেখতে পেল সুজন। পাশে দাঁড়িয়ে মাসিমা। ওঁরা কখন যেন নিঃশব্দে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'আজ রাত্তিরটুকু থেকেই কাল সকালে চলে যাব, মেসোমশাই।' অনুনয়ের সুরে বলল সুজন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন অপরেশবাবু। বিব্রতভাবে বললেন, 'তুমি আজ রাতেই চলে যাও—।'

'কেন?'

'আমাদের এখানে রাতে কেউ থাকে না।' একটু থেমে তারপরঃ 'শুধু আমরা তিনজনে থাকি।'

অপরেশবাবুর শেষ কথাটা জ্যোৎস্নারাতে নিশাচর পাখির মতো ডানা ঝাপটে উড়ে বেড়াতে লাগল। ওদের ঘিরে ঘুরপাক খেতে লাগলঃ শুধু আমরা তিনজনে থাকি শুধু আমরা তিনজনে থাকি শুধু আমরা তিনজনে...।'

সুজন উঠে দাঁড়াল। ও ঠিক বুঝতে পারছিল না এখন কী করবে। রাতের আঁধার, বাতাস, জোনাকির দল, গাছ-গাছালি, আর এই তিনজন রহস্যময় মানুষ ওকে কেমন যেন দিশেহারা করে দিচ্ছিল।

মাসিমা মেসোমশাইয়ের হাত ধরে টানলেন। ওঁরা গিয়ে বসলেন বেদিতে, চন্দ্রার পাশে। মেসোমশাই মাঝখানে—ওঁর দু-পাশে ওঁর স্ত্রী আর মেয়ে। ওঁদের বসার ঢংটা এমন যেন স্টুডিওতে বসে গ্রুপ ফটো তোলার পোজ দিচ্ছেন।

চাঁদের সামনে থেকে মেঘের আড়াল হঠাৎই সরে যেতে জ্যোৎস্নার তীব্র আলো-ছায়া আবার ফিরে এল।

তখন সুজন দেখল, চন্দ্রার মুখে জরুলটা আর নেই। ওটা কোথায় গেল! অ্যাক্সিডেন্টের পর কি প্লাস্টিক সার্জারিতে বাদ গেছে!

ও অবাক হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই অপরেশবাবু হাত তুলে ওকে থামতে ইশারা করলেন।

'চন্দ্রাকে তুমি দেখতে চেয়েছিলে—দেখেছ, কথাও বলেছ। এবার তুমি যাও সুজন। তোমার কষ্ট আমি বুঝতে পারছি। তবে জেনে রেখো, আমরা আরও কষ্টে আছি।'

বাতাস হঠাৎই আরও অস্থির হয়ে উঠতেই মাসিমার ঘোমটা খসে পড়ল। মাসিমা আর চন্দ্রার খোঁপা কোন এক অলৌকিক প্রক্রিয়ায় খুলে গেল। বাতাসে ওদের এলো চুল পাগলের মতো উড়তে লাগল—চাঁদের আলোয় চিকচিক করতে লাগল।

অপরেশবাবু স্ত্রী আর মেয়ের কাঁধে হাত রাখলেন, বললেন, 'অ্যাক্সিডেন্টের পর আমি যেভাবে ওদের ফিরিয়ে এনেছি তা কেউ বিশ্বাস করবে না। তবে এ তো ঠিক ফিরিয়ে আনা নয়—চৌকাঠে দাঁড় করিয়ে রাখা। দু-জগতের মাঝখানে। আর আমি?' বিষণ্ণ আক্ষেপের এক শব্দ করলেন অপরেশবাবু : 'আমি ওদের দুজনের পাহারাদার হয়ে দিন কাটাচ্ছি।'

'তোমাকে আমরা ভালোবাসি।' চন্দ্রা আর মাসিমা একইসঙ্গে বলে উঠলেন।

'আমিও চন্দ্রাকে পাগলের মতো ভালোবাসি...।'

'জানি। আর জানি বলেই তো এত কষ্ট করেও টিকে আছি।'

'আমিও আপনাদের সঙ্গে কষ্ট করে টিকে থাকব।' বায়না করার সুরে বলল সুজন।

অপরেশবাবু হতাশভাবে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন : 'তুমি তো কিছুতেই বুঝতে চাইছ না! তা হলে দ্যাখো—' স্ত্রী আর মেয়ের কানে-কানে কী যেন বললেন অপরেশবাবু।

মাসিমা আর চন্দ্রা খিলখিল করে হেসে উঠলেন—হাসতেই থাকলেন। আর একইসঙ্গে ওঁদের ডানহাতটা তুলে নিয়ে গেলেন ডান চোয়ালের নীচে।

এরপর সুজন যা দেখেছিল তা সত্যি হলেও পরে কখনও সেটাকে ও সত্যি বলে মানতে পারেনি। কিন্তু ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভুল দেখার কোনও অবকাশ ছিল না।

চন্দ্রা আর মাসিমা—দুজনেই ওঁদের মুখ দুটো খুলে নামিয়ে নিলেন। মুখ নয়, মুখোশ। সুজন দেখল, ওঁদের মুখের জায়গাটায় একরাশ অন্ধকার।

ন্যাপথালিনের উৎকট গন্ধে সুজনের দম বন্ধ হয়ে এল। রাতের বাতাস হঠাৎই যেন আরও ঠান্ডা হয়ে গেল। একটা ঘোরের মধ্যেই ও শুনতে পেল নিশাচর কোনও পাখির কান্না।

দুটো অন্ধকার মুখের পিছনে বিশাল কালো পতাকার মতো ওঁদের চুল উড়ছিল। সেই পটভূমিতে অপরেশবাবুর মুখটা ছবির মতো দেখচ্ছিল। স্ত্রী আর মেয়েকে আঁকড়ে কাছে টেনে নিলেন তিনি।

ওঁদের খিলখিল হাসির শব্দ তখনও থামেনি।

জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাওয়ার আগে অপরেশবাবুর শেষ কথাটা যেন বহুদূর থেকে ভেসে এল সুজনের কানে।

'...সেইদিন থেকে দুজন অন্ধকারকে নিয়ে আমি বাস করি। আমার মেয়ে-অন্ধকার, আর বউ-অন্ধকার। এখানে আমরা তিনজন ছাড়া আর কারও ঠাঁই নেই...।'





# ছায়াবন্দি খেলা

'মিস্টার জোয়ারদার, আপনার কাছে কোনও অলৌকিক সমস্যা নিয়ে আমি আসিনি। ভূত-প্রেতের ব্যাপারে কোনও সাহায্যও চাইতে আসিনি।' একটু থামলেন ভদ্রলোক। বোধহয় পরের কথাগুলো মনে-মনে গুছিয়ে নিতে চাইছিলেন। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটে ঘন-ঘন তিনটে টান দিয়ে শেষ টুকরোটা খুব সাবধানে অ্যাশট্রের গায়ে ঘষে নিভিয়ে দিলেন। তারপর সেটা অ্যাশট্রের গর্তে ফেলে দিয়ে কুলকুল করে ধোঁয়া ছাড়লেন। ঘরে ধোঁয়ার মেঘ তৈরি হয়ে গেল।

সেই মেঘের দিকে মুখ তুলে অবশ চোখে তাকিয়ে রইলেন তিনি। যেন অপূর্ব এক রামধনু তাঁকে মুগ্ধ করে দিয়েছে।

মেঘ ধীরে-ধীরে ফিকে হয়ে মিলিয়ে গেল। তখন ভদ্রলোক আনমনাভাবে বিড়বিড় করে বললেন, 'বলতে গেলে এরকমই এক ধোঁয়ার গল্প আপনাকে আমি শোনাতে এসেছি। তবে সেটা সাদা ধোঁয়া নয়—কালো ধোঁয়া। ঘন কালো ধোঁয়ার মেঘও বলতে পারেন।'

প্রিয়নাথের কৌতূহল ক্রমশ বাড়ছিল।

ভদ্রলোকের নাম অশেষ শিকদার। এয়ারপোর্টে চাকরি করতেন— বছরচারেক হল রিটায়ার করেছেন। তাঁর এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে রনিত বিদেশ সঞ্চার নিগম লিমিটেড-এ করণিক। প্রায় আট বছর হল বিয়ে করেছে। তিন-সাড়ে তিন বছরের একটি মেয়েও আছে।

অশেষবাবুর মেয়ে প্রমিতা পাস কোর্সে বি. এসসি. পাশ করে বসে আছে। ঘরকন্নার কাজে মাকে সাহায্য করে আর গোটাচারেক টিউশনি করে।

ওঁরা সবাই থাকেন কৈখালিতে। রিটায়র করার পর অশেষবাবু সেখানে বাড়ি করেছেন। মোট ছ'জন মানুষ নিয়ে ওঁদের পরিবার বেশ সুখেই দিন কাটাচ্ছিল। কিন্তু গত অগ্রহায়ণের এক অমাবস্যার রাত থেকে ওঁদের

জীবনের ছকটা পালটে গেছে। ওঁদের সুখ-শান্তির সাজানো ঘুঁটিগুলো কেউ যেন কাঠের একটা কৌটোয় ভরে পাগলের মতো ঝাঁকিয়ে তারপর এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে ছত্রখান করে দিয়েছে।

অশেষ শিকদার ক'দিন ধরেই প্রিয়নাথকে ফোন করে দেখা করতে চাইছিলেন। কিন্তু ওঁর কথাবার্তার ধরন খুব স্বাভাবিক মনে না হওয়ায় প্রিয়নাথ দেখা করতে চাননি—বরং এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন।

কিন্তু একদিন ভদ্রলোক টেলিফোনে এমন একটা কথা বললেন যে, প্রিয়নাথ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। সেই কথাগুলো এই মুহূর্তেও প্রিয়নাথের কানে অস্পষ্ট প্রতিধ্বনি তুলছিল।

অশেষবাবু আহত গলায় বলেছিলেন, 'প্রিয়নাথবাবু, বুঝতে পারছি আপনি আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। কারণ, আমার কথাবার্তা বোধহয় খুব একটা নরমাল নয়। আপনাকে একটা কথা বলতে পারি—আমি পাগল নই। কিন্তু আমার জীবনে যে-ঝড় বয়ে গেছে তাতে যে-কোনও মানুষই পাগল হয়ে যেত। আমি যে কেন হইনি সেটাই আশ্চর্যের।' বিষণ্ণ হাসি হেসেছিলেন ভদ্রলোক। তারপর : 'বোধহয় আপনাকে সেই ঘটনাগুলো বলার জন্যেই আমি এখনও সুস্থ অবস্থায় বেঁচে রয়েছি। নইলে বহুদিন আগেই তো আমার শেষ হয়ে যাওয়ার কথা! যাই হোক, এটুকু আপনাকে হলফ করে বলতে পারি, এরকম বিচিত্র ঘটনা আপনি জীবনে কখনও শোনেননি...।'

সেই বিচিত্র ঘটনা শোনার জন্যই প্রিয়নাথ শেষ পর্যন্ত ওঁর সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছিলেন এবং শুক্রবার সন্ধ্যায় ওঁকে বাড়িতে আসতে অনুরোধ করেছেন।

অশেষ শিকদার যখন এসে হাজির হলেন তখন সওয়া ছ'টা মতন হবে। ভূতনাথ ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আজ একটু আগেভাগেই সন্ধেবেলার পুজো আর্চার কাজ সেরে নিয়েছিলেন। তারপর অগোছালো বসবার ঘরটাকে একটু-আধটু ঠিকঠাক করে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। মেঝেতে ঢলে পড়া বইপত্র আর ম্যাগাজিনগুলো যতটা সম্ভব থাকে-থাকে সাজিয়ে নিয়েছেন।

ব্যাচিলারদের ঘরের একটা বিশেষ চরিত্র থাকে। সেটা অনেকটা যেন ছন্নছাড়া স্বাধীনতার ছাপ। আর যারা সংসারী, তাদের সংসার পরিপাটি সাজানো-গোছানো হলেও কোথায় যেন একটা পরাধীনতার রেশ থেকে যায়। অন্তত প্রিয়নাথ তাই মনে করেন। তাই নিজের ঘরটাকে তিনি কখনও খুব ছিমছাম করে সাজান না—পাছে তার মধ্যে পরাধীনতার ভেজাল ঢুকে পড়ে।

অশেষবাবু এসে প্রথমেই নিজের পরিচয় দিয়েছেন, তারপর বংশলতিকার অল্পবিস্তর বিবরণ দিয়েছেন। প্রিয়নাথ তাতে বিরক্ত হননি। কারণ, আসল রসের সন্ধান পেতে হলে অনেকটা নীরস পথ পেরোতে হয়—প্রিয়নাথের অভিজ্ঞতা অন্তত তাই বলে। সুতরাং তিনি শুধু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করছিলেন। অশেষবাবুকে একটানা কথা বলার সুযোগ দিচ্ছিলেন। আর মানুষটাকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন।

চেহারা রোগার দিকে হলেও স্বাস্থ্য খারাপ নয়। গায়ের রং ময়লা। গাল সামান্য বসা। কাঁচা-পাকা সরু গোঁফ। মাথার চুল ছোট-ছোট করে ছাঁটা আর তার বেশির ভাগটাই সাদা। কপালে একটা শিরা উঁচু হয়ে রয়েছে। ওপর-ওপর দেখে ব্লাড সুগারের রুগি বলে মনে হয়। তবে সবচেয়ে লক্ষ করার মতো জিনিস হল চশমার কাচের আড়ালে ওঁর চোখ দুটো। সরু লম্বাটে মুখে অস্বাভাবিক বড়-বড় দুটো চোখ যেন ভীষণরকম বেমানান। তার ওপর ভয়ে কিংবা কৌতূহলে চোখের মণি দুটো সবসময়েই অস্থিরভাবে এদিক-ওদিক নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। আবার হঠাৎ করেই কোনও কিছুর দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে কিছুক্ষণের জন্য নিশ্চল হয়ে যাচ্ছে।

ছোট করে বারতিনেক কাশলেন অশেষবাবু। তারপর বলতে শুরু করলেন ওঁর বিচিত্র কাহিনি।

আমার বাড়িটা কৈখালির দশদ্রোণ এলাকায়। দু-কাঠা জমির ওপরে ছোট্ট একতলা বাড়ি। জমির ফাঁকা জায়গাটায় কয়েকটা সুপুরি গাছ আর একটা পেয়ারা গাছ আছে। পেয়ারা গাছটায় ভোরের দিকে কিংবা বিকেলের দিকে দু-চারটে পাখি-টাখি আসে—বসন্তবৌরি, বুলবুলি, কাঠঠোকরা—এ ছাড়া শালিক-চড়ুই তো আছেই।

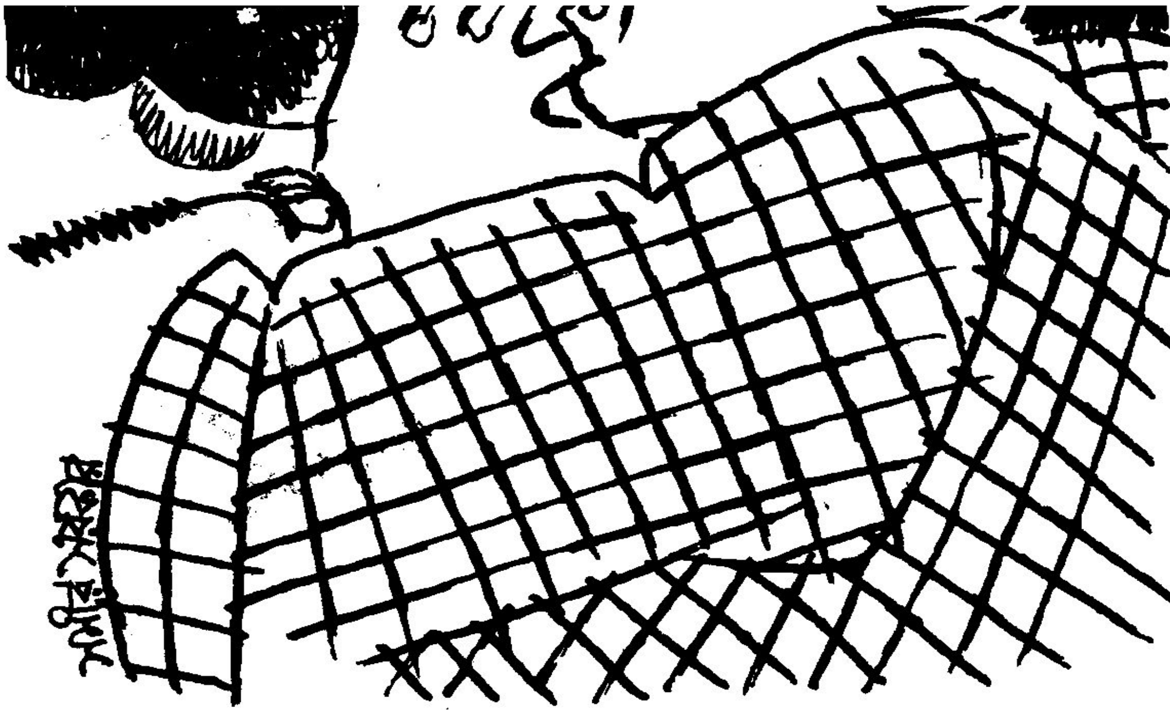
বাড়ি আমার হয়তো কোনওদিনই করা হয়ে উঠত না, যদি-না হঠাৎ করে লালটুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়ে যেত। লালটু ওই এলাকারই ছেলে—'ত্রিবেণী এন্টারপ্রাইজ' নামে ওর একটা কোম্পানি আছে—কন্সট্রাকশনের কাজ করে। ওর সঙ্গে রয়েছে এক ঝাঁক তরতাজা যুবক বিশ্বজিৎ, বাচ্চু, পলটু, দেবাশিস, আরও অনেকে। এলাকায় কোনও উৎসব হলে ওরা সবার আগে হইহই করে মেতে ওঠে। আবার কারও অসুখ-বিসুখ বা বিপদ-আপদ হলে সবার আগে ওরাই ঝাঁপিয়ে পড়ে—ঝড়-বৃষ্টি রাত-বিরেতের তোয়াক্কা করে না।

লালটু আমাকে ধারে জমির মালিক হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল, ধারে বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে। আমি কোনওরকমে টাকার জোগাড় করে ওকে কিস্তিতে-কিস্তিতে শোধ দিয়েছি। বাড়িতে আমি আছি আজ চারবছর, কিন্তু ওর ধার এখনও শোধ করতে পারিনি—সামান্য কিছু বাকি আছে। আমি মনে-মনে জানি, ওর টাকা হয়তো আমি শোধ করে দেব, কিন্তু ওর ঋণ সারা জীবনেও শোধ করতে পারব না।

লালটুর কথা এত করে বলছি তার কারণ, আমার এই বিপদেও ও ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ওর বন্ধুবান্ধবের দল নিয়ে প্রাণপথ লড়াইয়ে মেতে উঠেছিল—কিন্তু পারেনি। বোধহয় পারা সম্ভব ছিল না বলেই।

গত বছর অগ্রহায়ণ মাসের এক বিকেলে আমি বাড়ির বারান্দায় চুপচাপ বসে ছিলাম। শিবানী, মানে বউমা, ওর মেয়ে মুনমুনকে নিয়ে পেয়ারা গাছের নীচটায় বসে ছিল। আমার স্ত্রী বনানী বাড়ির ভেতরে টুকিটাকি কাজ সারছিল। ছেলে রুনু তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। সাধারণত ও সাতটা নাগাদ ফেরে। আর প্রমি বাড়ি ছিল না—টিউশানিতে গিয়েছিল।





পাখি দেখাটা আমার শখ। তাই পেয়ারা গাছটার ডালপালার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। দুটো বুলবুলি সেখানে খেলা করছিল।

সূর্য একটু আগে ডুবে গেছে। সময়টা গোধূলি মতন। শীতের বাতাস সবে হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করেছে। তা ছাড়া আমার বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ঘেঁষে একটা বড় পুকুর আছে। সন্ধের পর সেদিক থেকে ঠান্ডা বাতাস ভেসে আসে। সেদিন বাতাসটা একটু যেন বেশিই ঠান্ডা ছিল।

হঠাৎই আমার চোখে পড়ল একটা ছোট মেঘের টুকরো যেন আমার বাড়ির দিকে ভেসে আসছে।

সাধারণ মেঘের মতো হলে ব্যাপারটা আমার চোখ টানত না। কিন্তু ওটার ভেতরে একটা কিছু ঘুরপাক খাচ্ছিল। যেন কালো মেঘের ভেতরে একটা আরও কালো মেঘের ডেলা খাঁচায় বন্দি বাঘের মতো অস্থিরভাবে পাক খাচ্ছে আর ফুঁসছে।

পশ্চিমের আলো একপাশ থেকে এসে ওটার ওপরে পড়েছিল। তাতে মেঘটাকে আরও অদ্ভুত দেখাচ্ছিল।

অদ্ভুত বলতে কীরকম? কালীপুজোর সময় আকাশে হাউই ওড়ে দেখেছেন? একরকম হাউই আছে যেগুলো আকাশে গিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পর কয়েকটা উজ্জ্বল সাদা আলোর কণা ঝিকমিক করে জ্বলতে থাকে, আর হাওয়ার ভাসতে ভাসতে নামতে থাকে নীচের দিকে।

এই মেঘটার ভেতরেও সেরকম কিছু একটা হচ্ছিল। ওটার ভেতরে যেন অসংখ্য বিদ্যুতের কণা জ্বলছিল আর নিভছিল।

মেঘটা ভাসতে-ভাসতে আমার বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে এসে পড়ল। তারপর পেয়ারা গাছটার ডালপালা-পাতার ভেতরে ঢুকে পড়ল।

দিনের আলো মরে আসছিল। তাই মেঘটাকে আর স্পষ্ট করে দেখতে পাচ্ছিলাম না। তবে হঠাৎই নজরে পড়ল, একটা বুলবুলি পাখি নেই। চঞ্চল হয়ে এ-ডাল সে-ডাল করতে-করতে কখন যেন উড়ে পালিয়েছে। আপনি তো জানেন, বুলবুলি পাখি জোড়ায়-জোড়ায় থাকে। তাই ভাবলাম, অন্য বুলবুলিটা এখনই উড়ে চলে যাবে সঙ্গীর কাছে।

কিন্তু সেরকম কিছু হল না। বরং একটা চিৎকার কানে এল—কোনও পাখির কর্কশ চিৎকার। বেড়াল পাখির ছানা চুরি করতে এলে মা-পাখি যেমন কর্কশ চিৎকার করে অনেকটা সেইরকম। আর তারপরই

দেখলাম, অন্য বুলবুলিটা গাছ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। গাছটাকে ঘিরে পাগলের মতো এলোমেলোভাবে উড়তে লাগল, আর ডাকতে লাগল।

সে-ডাক আমি চিনি। কারণ, আমি খুব খুঁ�টিয়ে পাখি দেখি, পাখির আচার-আচরণ লক্ষ করি। হারানো সঙ্গীর খোঁজে বুলবুলি অনেক সময় এরকম করে।

শিবানী মুনমুনকে নিয়ে বাড়ির দিকে চলে আসছিল, আর মুখ তুলে বুলবুলিটার অদ্ভুত আচরণ দেখছিল।

বাড়িতে ঢোকার সময় শিবানী আমাকে বলল, 'দেখেছেন, বাবা, পাখিটা কেমন করছে!'

আমি ছোট্ট করে 'হুঁ' বললাম।

ওরা ভেতরে চলে যাওয়ার একটু পরেই পাখিটা উড়ে কোথায় চলে গেল। অন্ধকার ঘন হয়ে আসায় কালো ধোঁয়ার মেঘটাকেও আর ঠাহর করতে পারলাম না।

দার্জিলিঙে বেড়াতে গিয়ে এরকম ভেসে থাকা ছোট-ছোট মেঘের টুকরো দেখেছি। অবশ্য ওগুলো মেঘ নয়—কুয়াশা। গায়ের ওপর দিয়ে চলে গেলে কেমন স্যাঁতসেঁতে ভাব টের পাওয়া যায়। সেইসঙ্গে একটু বাড়তি শীত। এই কালো মেঘের টুকরোটা আমাকে দার্জিলিঙের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছিল।

এমন সময় আমি একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব টের পেলাম। আচমকা একটা শীত আমাকে কাঁপিয়ে দিল। আমি তাড়াতাড়ি বারান্দা থেকে উঠে ঘরে চলে এলাম। তখন বুঝিনি, আমার পিছু-পিছু আরও একজন কেউ ঢুকে পড়েছে ঘরের ভেতরে।

সেটা বুঝলাম পরদিন রাতে।

সেদিন রাতে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে বারান্দায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়েছি। রাত তখন ক'টা হবে? এগারোটা-সওয়া এগারোটা। রুনু, শিবানী, প্রমিতারা সব শুয়ে পড়েছে। বনানী তখন রান্নাঘর শেষবারের মতন গুছিয়ে নিচ্ছে। ও প্রমিতার কাছে শোয়। আমি ড্রইং কাম ডাইনিং স্পেসে হালকা বিছানা পেতে শুই। তো চেয়ারে হেলান দিয়ে সিগারেট টানতে-টানতে ডাইনিং স্পেসের সিলিং-এর দিকে আমার চোখ চলে গিয়েছিল। তখনই খেয়াল হল, সিলিং-এর এক কোণে যেন একটুকরো কালচে ধোঁয়া জমাট বেঁধে রয়েছে। ধোঁয়া বা মেঘ বা ছায়া যা-ই বলুন, ওটার কোনও নির্দিষ্ট শেপ ছিল না। দেওয়ালের কোণে ছড়িয়ে--ছিটিয়ে কেমন যেন লেপটে ছিল। অনেকটা ড্যাম্পের ছাপের মতন।

আমি সিগারেট ফেলে দিয়ে ঘরে চলে এলাম। ছায়াটার ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে মুখ তুলে ওটাকে পরীক্ষা করার চেষ্টা করলাম। না, তেমন কোনও ব্যাপার আমার নজরে পড়ল না। শুধু মনে হল, দেওয়ালের গায়ে লেপটে ওটা যেন সামান্য নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে—ঠিক আমিবার মতন।

বনানী আমার বিছানা পাততে এল। ওকে ব্যাপারটা বললাম, আঙুল তুলে দেখালামও।

ও খুব একটা আমল দিল না। আঁচলে হাত মুছতে-মুছতে ওটার কাছে এগিয়ে গিয়ে একপলক কী দেখল ও-ই জানে। তারপর বলল, 'ও কিছু নয়, ঝুলের দাগ পড়েছে। তোমাকে বললাম রান্নাঘরে একটা একজস্ট ফ্যান লাগাও, তা আমার কথা শুনলে না। ও পরে একদিন আমি সন্ধ্যার মাকে নিয়ে ঝুলঝাড়ু দিয়ে সাফ করে দেব। এখন শোবে এসো।'

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু খচখচানিটা মন থেকে গেল না। কেমন যেন মনে হল, কাল সকালে উঠে ওই কালচে ছোপটাকে ওখানে আর দেখতে পাব না।

পরদিন সকালে উঠে দেখলাম, আমার ভাবনা অক্ষরে-অক্ষরে সত্যি হয়ে গেছে।

এতে আমার স্বস্তি পাওয়ার কথা। কিন্তু তার বদলে অস্বস্তিটা বেড়ে গেল। ছায়াটা এবার কোথায় কীভাবে দেখা দেবে সে-নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেলাম।

ঠিক পাঁচ দিন পর ছায়াটা সাঙ্ঘাতিকভাবে জানিয়ে দিল, ও আছে। চলে যাওয়ার জন্যে ও আমার বাড়িতে এসে ঢোকেনি। কিন্তু আমার বাড়িটাই কেন যে ওর পছন্দ হল! পরে অবশ্য বুঝেছি, শুধু আমার বাড়িটা নয়—আমাকেও ওর ভীষণ পছন্দ হয়েছে। আমাকে ছেড়ে ও কিছুতেই যাবে না। কেন তা জানি না।

আমাদের বাড়ির রোজকার নোংরাগুলো পলিথিনের প্যাকেটে করে সামনের সরু একটা রাস্তায় ফেলা হয়। ওখানে আরও দু-চারটে বাড়ির আবর্জনা এসে পড়ে। সেগুলো ফেলামাত্রই পাড়ার দুটো বেড়াল আর একটা নেড়ি কুকুর সেখানে এসে হাজির হয়। তারপর প্যাকেটগুলো নিয়ে টানহ্যাঁচড়া করে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে কাঁটা-কুটো খায়।

হঠাৎ লক্ষ করলাম, আবর্জনা প্যাকেটগুলো জায়গা মতো আর পড়ছে না। কিংবা বলা যায়, পড়ার পরই ওগুলো নিয়ে কেউ চম্পট দিচ্ছে। এ-নিয়ে কাউকে কিছু বলার আগেই আর-একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলাম।

আমার বাড়ির পেছন দিকটায় একটা তেঁতুল গাছ আছে। তার পাশ ঘেঁষেই আমার সেপটিক ট্যাঙ্ক। তো মাঝে-মাঝেই আমি বাড়ির চৌহদ্দি ঘুরে তদারকি করি, সাফসুতরো করি। সেদিন করতে গিয়ে দেখি তেঁতুল গাছটার গোড়ায় একরাশ আবর্জনা ছড়ানো। প্যাকেট ছিঁড়ে কেউ ওগুলোর মধ্যে থেকে পাগলের মতো খাবার খুঁজে বেড়িয়েছে। সন্দেহ করলাম, এ হয়তো কাকের কাণ্ড। আবার বেড়াল-কুকুরও হতে পারে। কিন্তু লক্ষ করলাম, ছড়ানো আবর্জনায় মাছের কাঁটা বা মাংসের হাড় এক কণাও নেই। বরং ভাত-তরকারি আর রুটির টুকরো অল্পবিস্তর পড়ে আছে। কাক-বেড়াল-কুকুর হলে মনে হয় না, এগুলো পড়ে থাকত। তা ছাড়া এ-জায়গাটায় কখনও আবর্জনা ফেলা হয় না বলে ওরা বোধহয় এদিকটায় আসেনি।

ব্যাপারটা নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা যে হয়নি, তা নয়। তবে খুব বেশি আমল দিইনি। এর দিনতিনেক পরে ঘটে গেল সেই অদ্ভুত ঘটনা।

সেদিন রাত আটকা নাগাদ লালটু ওর বন্ধু দেবাশিসকে নিয়ে এল আমার বাড়িতে। আমিই আসতে বলেছিলাম—হাজার দশেক টাকা শোধ করব বলে।

আমরা তিনজনে ড্রইং কাম ডাইনিং-এ বসে চা-বিস্কুট খাচ্ছি, মুনমুন হঠাৎ আমার কাছে এল। ওর পেছন-পেছন ঢুকে পড়ল একটা বেড়ালছানা। ধবধবে সাদা এই ছোট্ট বেড়ালটা দিন কুড়ি-পঁচিশ ধরে আমাদের সঙ্গী হয়েছে। মুনমুন ওকে শুধু খাওয়াতে চায়। বেড়ালছানা ঘাঁটে বলে বউমা মাঝে-মাঝেই ওকে বকুনি লাগায়।

মুনমুন আমার কাছে এসেই 'দাদান, ম্যাঁওকে খেতে দাও' বলে সামনের প্লেট থেকে থাবা দিয়ে একটা বিস্কুট তুলে নিল। বেড়ালছানাটা তখন লালটু আর দেবাশিসের প্লাস্টিকের চেয়ার ঘিরে লাফাচ্ছে, ছুটোছুটি করছে।

লালটু মুনমুনকে কোলে নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকছিল। মুনমুন পাকা বুড়ির মতো হাত তুলে ওকে অপেক্ষা করতে ইশারা করে বলল, 'আগে ম্যাঁওকে খেতে দিই...।'

ঠিক তখনই শিবানী মেয়েকে ডাকতে-ডাকতে ঘরে এসে ঢুকল।

আমি চোখের কোণ দিয়ে একটা নড়াচড়া লক্ষ করলাম। সেদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখি, টিভির টেবিলের নীচের অন্ধকার থেকে একটা অন্ধকার ছায়া গড়িয়ে আসছে আমাদের দিকে। মেঝেতে যেভাবে জল গড়ায় ঠিক সেইভাবে তরল কালো মেঘটা মোজেইক করা মেঝের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে আসতে লাগল।

লালটুদের আমি ওই ছায়া বা মেঘের ব্যাপারটা বলিনি। কারণ, বললেও হয়তো ওরা বিশ্বাস করত না। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, ওটা এভাবে দেখা দেবে আমি ভাবিনি।

কথা বলতে-বলতে আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। লালটু সেটা লক্ষ করে জিগ্যেস করল, 'কী হল, অশেষদা?'

আমি কোনও শব্দ না-করে আঙুল তুলে ইশারা করলাম কালো ছায়াটার দিকে।

লালটু আর দেবাশিস সেদিকে তাকাল কিন্তু ঠিকমতো কিছু ঠাহর করতে পারল না।

লালটু শুধু বলল, 'আপনার মোজেইকটা ওই জায়গায় কেমন কালচে হয়ে গেছে...।'

আর ঠিক তখনই খেলতে-খেলতে বেড়ালছানাটা ওই কালো ছায়াটার ওপর লাফিয়ে পড়ল।

একটা কালো চাদর হঠাৎ করে গায়ে জড়িয়ে নেওয়ার মতো অন্ধকার ছায়াটা বেড়ালছানাটাকে চোখের পলকে সাপটে নিল।

শিবানী ভয়ে চিৎকার করে উঠল। দেবাশিসের হাত থেকে চায়ের কাপ ছিটকে পড়ল মেঝেতে। লালটু চেয়ারটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ওর চোখ এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে যে-কোনও ধরনের একটা হাতিয়ার খুঁজছিল।

আর আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম।

কারণ, বেড়ালছানাটাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। তবে ওর 'ওঁয়া-ওঁয়া' মরণ-চিৎকার আমাদের সকলের কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছিল।

আমার বুলবুলি পাখিটার কথা মনে পড়ে গেল। পাখিটার উধাও হওয়ার রহস্য সেদিন আমি বুঝতে পারিনি। আজ, এই মুহূর্তে, হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছিলাম।

শুধু এই ভয়ঙ্কর সত্যিটুকু ছাড়া আর কিছুই আমি বুঝতে পারছিলাম না। আমার মাথা কাজ করছিল না। রেল-লাইন দিয়ে মেল ট্রেন ছুটে গেলে লাইনের দু-ধারের বাড়ির জানলা-দরজা যেরকম খটাখট করে কেঁপে ওঠে, আমার হাত-পা ঠিক সেইরকম কাঁপছিল। তবে পা দুটো মেঝেতে অসাড় হয়ে গেঁথে গিয়েছিল। আর শিবানীকে কিছু একটা বলতে চেয়ে আমি উদভ্রান্ত হাত দুটো শূন্যে উঁচিয়ে নাড়তে চেষ্টা করছিলাম।

শিবানীর ভয়ানক চিৎকার শুনে রুনু, প্রমি আর বনানী ছুটে এসেছিল এ-ঘরে। কিন্তু তখন মেঝের ওপরে শুধু একটা কালো ধোঁয়ার তাল পাক খাচ্ছে।

লালটু কোনওরকম হাতিয়ার খুঁজে না পেয়ে ধোঁয়ার তালটার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দেবাশিস 'লালটু! লালটু সরে আয়—' বলে ওকে হাত বাড়িয়ে থামাতে চেষ্টা করেছিল। খামচে ধরেছিল লালটুর জামা। কিন্তু ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে। লালটুর জামার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে রয়ে গেল দেবাশিসের হাতে। আর লালটুর শক্তপোক্ত দেহটা মেঝেতে আছড়ে পড়ার শব্দ হল। ও যন্ত্রণায় 'উঃ' শব্দ করে উঠল।

দেবাশিস আর রনিত লালটুকে ধরে তুলল। ততক্ষণে ছায়াটা ফিকে হয়ে গিয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

আমরা অতগুলো মানুষ কিছুই করতে পারলাম না। বেড়ালছানাটার চিৎকার কমজোরি হতে-হতে হঠাৎই থেমে গেল। ওটার শরীরের এক কণাও আর চোখে দেখতে পেলাম না।

ঘরটা মুহূর্তের মধ্যে শ্মশানের মতো চুপচাপ হয়ে গেল। শুধু মায়ের শাড়িতে মুখ গুঁজে মুনমুন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।

অনেক—অনেকক্ষণ পর রনিত আমার কাছে এসে দাঁড়াল। প্রায় ফিসফিসে গলায় জিগ্যেস করল, 'কী ব্যাপার, বাবা? এসব কী হল?'

আমি বড়-বড় শ্বাস টেনে হাঁফাচ্ছিলাম। এপাশ-ওপাশ মাথা নেড়ে বললাম, 'জানি না।'

বনানী আমাকে এক গ্লাস জল এনে দিল। লালটু আর দেবাশিস আমাকে ঘিরে একরাশ উদ্বেগ নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। শিবানী মুনমুনকে কোলে তুলে নিল।

নিজেকে একটু সামলে নেওয়ার পর ওদের ছায়ার ব্যাপারটা বললাম।

প্রথমদিনের সেই বুলবুলি পাখির ঘটনা। তারপর আবর্জনা থেকে মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় উধাও হওয়ার ব্যাপার। আর বললাম বাড়ির আনাচেকানাচে ওটার ঘাপটি মেরে বসে থাকার কথা।

ওরা সবাই শুনল। কিন্তু তক্ষুনি কেউ কোনও কথা বলতে পারল না।

কিছুক্ষণ পর লালটু বলল, 'অশেষদা, আপনি বিপত্তারিণীর পুজো দিন।'

আমি আর বনানী ধর্মভীরু মানুষ—দেব-দ্বিজে যথেষ্টই ভক্তি আছে। তাই লালটুর প্রস্তাবে সায় দিলাম।

দেবাশিস বলল, 'অশেষদা, দিনের বেলায় ছায়াটাকে একবার খুঁজে দেখলে হয় না!'

'কেন, খুঁজে পেলে কী করবি?' লালটু জানতে চাইল।

দেবাশিস মাথা খাটাতে বেশি ভালোবাসে। ভেবেচিন্তে ধীরে-ধীরে কথা বলে। আর লালটু মাথাও খাটায়, সেই সঙ্গে শরীরও। ও সবসময়েই কিছু একটা করার জন্যে এক পায়ে খাড়া।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে দেবাশিস বলল, 'খুঁজে পেলে ওটার ওপরে পেট্রল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেব।'

আমি মনে-মনে ভাবছিলাম : যাকে ধরা-ছোঁয়া যায় না, তাকে কি আগুনে পোড়ানো যায়!

লালটু বলল, 'পেট্রল ঢেলে কিছু করা যাবে কি না জানি না—তবে খুঁজে দেখা যেতে পারে!'

দেবাশিস জিগ্যেস করল, 'অশেষদা, কালো মেঘটা ঠিক কোনদিক থেকে ভেসে এসেছিল বলতে পারেন?'

'পুকুরের দিক থেকে।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ থাকার পর লালটু বিড়বিড় করে বলল, 'ওদিকটায় প্রায় মাইলদেড়েক দূরে একটা কবরখানা আছে। এই ধোঁয়ার সঙ্গে লড়াই করে কিছু করা যাবে না। অশেষদা, আপনি বিপত্তারিণীর পুজো করুন—তারপর দেখুন কী হয়।'

আরও খানিকক্ষণ জল্পনা-কল্পনার পর লালটুরা চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল, কাল দুপুরে দল বেঁধে ওরা ছায়াটাকে খুঁজতে আসবে।

সে-রাতে আমি আর ঘুমোতে পারলাম না। কানের কাছে শুধু বেড়ালছানাটার 'ওঁয়া-ওঁয়া' চিৎকার শুনতে পাচ্ছিলাম। তবে বেড়ালছানাটার বদলে ওটা মুনমুনের কান্নাও হতে পারত। ঈশ্বর মুনমুনকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন।

এ-কথা ভাবতেই আতঙ্কের একটা হিম প্রবাহ আমার শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে গেল। মনে হল, কালো ছায়াটার সঙ্গে আমরা পেরে উঠব না।

পরদিন দুপুরে লালটুর দলবল এল আমার বাড়িতে। তন্নতন্ন করে কালো ছায়ার দলাটাকে খুঁজল ওরা। কিন্তু সমস্ত খোঁজাখুঁজিই সার হল। ওটার কোনও হদিস পাওয়া গেল না।

ওরা চলে যাওয়ার অনেক পরে, সন্ধে ছ'টা-সাড়ে ছ'টা নাগাদ, ছায়াটাকে আমি দেখতে পেলাম। ওটা কোথায় লুকিয়ে ছিল জানেন! শুনলে আপনার গা ঘিনঘিন করে উঠবে।

আমি তখন বাথরুমে গিয়েছিলাম। হঠাৎই দেখি পায়খানার প্যানের গর্ত থেকে এক দলা কালো ধোঁয়া পাক খেয়ে বেরিয়ে আসছে। গাঢ় কালো ধোঁয়াটার ভেতর থেকে যেন একটা চাপা রাগ ফুটে বেরোচ্ছিল। আর বাথরুমের আলোয় স্পষ্ট দেখলাম, ওটার ভেতরে বিন্দু-বিন্দু কয়েকটা আগুনের ফুলকি বালির কণার মতো চিকচিক করছে।

সাপের ছোবল মারার ভঙ্গিতে ধোঁয়ার একটা অংশ সরু হয়ে আমার দিকে ছিটকে এল। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়ে বাথরুম থেকে একরকম পালিয়েই এলাম।

রথের পরে শনিবার বা মঙ্গলবার দেখে সাধারণত বিপত্তারিণীর পুজো হয়। কিন্তু আমার মনে হল, সেইদিনের জন্যে অপেক্ষা করতে হলে পুজো আমাদের বোধহয় আর করাই হবে না। তাই পাড়ার এক ঠাকুরমশাইকে ধরে জোর করে একটা দিন ঠিক করে বিপত্তারিণীর পুজো করলাম। কিন্তু অবস্থা একটুও বদলাল না। ছায়াটাকে মাঝে-মাঝেই দেখা যেতে লাগল।

রণিত, প্রমিতা, বউমা—ওরা সবাই মিলে আমাকে চাপ দিতে লাগল। বলল, বাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার জন্যে। কিন্তু চাকরি-জীবনের পয়সা তিলতিল করে জমিয়ে ধার নিয়ে, বহু কষ্টে বহু পরিশ্রম করে এ-বাড়ি আমি তৈরি করেছি। সে-বাড়ি এক কথায় বেচে দেব! তা ছাড়া এখন এই অভিশপ্ত বাড়ি কিনবেই বা কে!

আমি ওদের কথায় রাজি হতে পারলাম না। ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমার চাপা মন কষাকষি চলতে লাগল। রাতের ঘুম দিনের শান্তি—সব উবে গেল। আমার উদভ্রান্ত অবস্থা দেখে, কষ্ট দেখে, বনানীও খুব মনমরা হয়ে পড়ল। ঠাকুরকে প্রাণপণে ডাকতে লাগল, আর মুখে আঁচল গুঁজে কাঁদতে লাগল। আমি ভেতরে-ভেতরে শেষ হয়ে যেতে লাগলাম।

এরপর একদিন আর-একটা সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার হল।

বিকেল গড়িয়ে সবে সন্ধে হচ্ছে। শিবানী রান্নাঘরে চা করছিল। বনানী মুনমুনের একটা ছেঁড়া জামায় ছুঁচের ফোঁড় দিচ্ছিল। মুনমুন আমার সঙ্গে ড্রইং কাম ডাইনিং-এ বসে টিভি দেখছিল। আর প্রমি আমাদের সামনেই মেঝেতে বসে একগাদা অডিয়ো ক্যাসেট নিয়ে তার কী একটা লিস্ট তৈরি করছিল।

হঠাৎই শিবানীর ভয়ঙ্কর চিৎকারে আমরা আপদমস্তক কেঁপে উঠলাম। ও যেন অন্ধ আতঙ্কে পাগল হয়ে একটানা মরণ-চিৎকার করে চলেছে। তারই মধ্যে বাসনপত্র ছিটকে পড়ার শব্দ হল। কিছু কাপ-প্লেট বোধহয় ভাঙচুর হল।

প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিতে আমাদের কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। তারপরই আমরা ছুট লাগলাম রান্নঘরের দিকে।

গিয়ে যা দেখলাম সেটা সংক্ষেপে গুছিয়ে বলার চেষ্টা করছি।

দোলের সময় কালো রং মেখে ভূত হলে যেমনটি দেখতে হয় শিবানীর অবস্থা অনেকটা সেইরকম। ওর ফরসা শরীরে, শাড়িতে, ব্লাউজে, সর্বত্র হতচ্ছাড়া কালো ছোপ। তবে ও নিজের পায়ে ভয় করে দাঁড়িয়ে ছিল না। শূন্যে ওর দেহটা পাক খাচ্ছিল, লাট খাচ্ছিল, আর ও হাত-পা ছুড়ছিল। সাঁতার না-জানা মানুষ সাগরে ভেসে গেলে বাঁচার চেষ্টায় যেভাবে হাত-পা ছোড়ে ঠিক সেইরকম। সোজা কথায়, ওই ভয়ঙ্কর কালো ধোঁয়ার তালটা শিবানীকে সাপটে ধরে যেন চেটেপুটে গিলে খাচ্ছিল।

আমাদের সবায়ের চিৎকারে এক কানফাটানো হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। আমি, বনানী, আর প্রমি শিবানীর শাড়ি-জামাকাপড় হাত-পা খামচে ধরে পাগলের মতো এলোপাতাড়ি টানতে শুরু করলাম। ওরই মধ্যে প্রমি আর বনানী হাউমাউ করে কাঁদছিল, আর মুনমুন ভয়ে নীল হয়ে গিয়ে 'মা! মা!' বলে চিৎকার করছিল।

কালো ছায়াটার শরীর থেকে একটা হিসহিস শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু আমি এতটুকুও ভয় পাইনি। বরং আমার ভেতরে একটা বেপরোয়া রাগ আর জেদ টগবগ করে ফুটছিল।

রান্নাঘরের বদ্ধ জায়গায় তুমুল লড়াইয়ের পর শিবানীকে আমরা বাঁচাতে পারলাম।

কালো ছায়াটা আচমকা শিবানীকে ছেড়ে দিয়ে রান্নাঘরের জানলা দিয়ে চম্পট দিল। শিবানীর শরীরটা হাতদুয়েক ওপর থেকে খসে পড়ল মেঝেতে। ওর নাকের ডানদিকের ফুটো দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। বেশবাস অগোছালো। দু-চোখ ভয়ে বোজা। ও বড়-বড় শ্বাস ফেলছিল আর থরথর করে কাঁপছিল।

প্রমি আর বনানী ওর ওপরে ঝুঁকে পড়ে চিৎকার করে কাঁদছিল আর ওকে বারবার ডাকছিল : 'বউদি! বউদি!', 'শিবানী, শিবানী!'

আমি বনানীকে চেঁচিয়ে বললাম, 'মুনমুনকে ধরো! শিবানীর চোখে-মুখে-মাথায় জল দাও। আমি এক্ষুনি বীরেন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে আসছি!'

ডাক্তার-ওষুধ করে প্রায় তিনদিনের চেষ্টায় শিবানীকে ভালো করে তুললাম। ও বলল, চা-পাতা রাখার কৌটোর ঢাকনা খুলতেই ভেতরে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা কালো-ছায়াটা ওর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কথাটা শুনে আমি হঠাৎই কেমন শিউরে উঠলাম।

শিবানীর দুর্ঘটনার পর থেকেই আমাদের সংসারে চিড় ধরে গেল। সেদিন রুনু অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পর শিবানীর অবস্থা দেখেশুনে একেবারে হুলুস্থুল কাণ্ড বাঁধিয়ে দিয়েছিল। আমাকে ও সাফ জানিয়ে দিল শিবানী একটু ভালো হয়ে উঠলেই ওরা আমার অভিশপ্ত বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকবে না।

চার-পাঁচদিন ধরে বাড়িতে প্রচণ্ড অশান্তি চলল। আমি একেবারে নির্বিকার নির্লিপ্ত হয়ে গেলাম। কেউ একশোটা কথা বললে হয়তো একটা কথা বলি। আমার আর কিছুই যেন ভালো লাগছিল না। বাঁচার ইচ্ছে একেবারে উবে গিয়েছিল।

একদিন সকালবেলা রনিত ওর বউ আর মেয়েকে নিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

আমি খবরের কাগজ পড়ছিলাম, মুখ তুলে তাকালাম। দেখি ওরা স্নান-টান সেরে সেজেগুজে বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে।

'বাবা, আমরা চলে যাচ্ছি।' মেঝের দিকে তাকিয়ে আলতো গলায় বলল রুনু। তারপর একটু থেমে সময় নিয়ে : 'তোমারও চলো। মা-কে বলেছি—মা, প্রমি—ওরা রাজি আছে...।'

'তা হলে তুমি ওদের নিয়ে চলে যাও—।'

এ-কথা বলে আমি আবার খবরের কাগজের পাতায় চোখ রাখলাম।

প্রমি আর বনানী বোধহয় পরদার আড়াল দাঁড়িয়ে ছিল। আমার জবাব শুনে সামনে বেরিয়ে এল।

বনানী আমার কাছে এসে খবরের কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। আমার হাত দুটো চেপে ধরে কান্না-ভাঙা গলায় মিনতি করে বলল, 'তুমি কেন ছেলেমানুষের মতো জেদ করছ! এ-বাড়িতে থাকলে আমরা সবাই শেষ হয়ে যাব। ওই শয়তান ছায়ার সঙ্গে লড়ে আমরা কেউ পারব না। তোমাকে কত করে বোঝাচ্ছি....তুমি কি কিছুতেই নিজের ভালো বুঝবে না!'

আমি পাথরের মতো বসে রইলাম। জানলা দিয়ে বাইরের গাছপালা আর আকাশ দেখছিলাম।

এবার প্রমিতা আমার কাছে এগিয়ে এল।

'বাবা!'

আমি ওর দিকে তাকালাম। ওর চোখে-মুখে একটা জেদি ছাপ। ও আমার ধাত পেয়েছে।

'বাবা, মরতে আমি ভয় পাই না। তবে এভাবে মরার কোনও মানে হয় না। এখানে থাকলে আমাদের সবার ক্ষতি হবে। তুমি কি তাই চাও?'

আমি এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়ালাম : 'না—চাই না। তাই তো বলছি, তোমরা সবাই চলে যাও—এ-বাড়িতে আমি একা থাকব। আমি এর শেষ দেখে তবে ছাড়ব।'

প্রমিতা বোধহয় বুঝতে পারল আমার সঙ্গে কথা বলে আর লাভ নেই। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। তাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বনানীকে বলল, 'মা, চলো—আর সময় নষ্ট করে লাভ নেই।'

বনানী জল-ভরা চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল, কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'না রে, আমার আর যাওয়া হবে না। তোরা যা—।'

অনেক টানাপোড়েন আর কান্নাকাটির পর ওরা চলে গেল। শুধু বনানী ওর একগুঁয়ে স্বামীটাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে রইল। আমরা দুটি প্রাণী ওই বাড়িতে রয়ে গেলাম। আর ছায়াটাও রয়ে গেল।

বনানী ঠাকুর-দেবতা নিয়ে সময় কাটায়। আর সুযোগ পেলেই আমার মেজাজ বুঝে পুরোনো অনুরোধটা করে : চলো, এ-বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে যাই।'

নতুন ধরনের দুর্ঘটনা আর না হলেও একটা ব্যাপার লক্ষ করছিলাম। ছায়াটা সবসময় আমার কাছাকাছি থাকে। যখন-তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে আমাকে দেখা দেয়। আমার চারপাশে ঘুরঘুর করে। যেন কিছু একটা করতে চায়। সেটা করবে না কি ভাবছে। তখনও বুঝিনি ওর মতলবটা কী। যখন বুঝলাম তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

বাইরের বাগানে দু-একটা পাখি মাঝে-মাঝে উধাও হচ্ছিল। মাছের কাঁটা, মাংসের হাড় আগের মতোই গা-ঢাকা দিচ্ছিল। তবে এইসব ছোটখাটো ব্যাপারগুলো আমার গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। ছায়াটাকে আমরা বন্দি করতে চাইতাম বটে, তবে তার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

আমি আর বনানী পাড়ার লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। ছোট্ট বাড়িটায় আমরা দুজনে মুখ বুজে দিন কাটাই। প্রমিতা বা রনিতদের কখনও আসতে বলি না। ওরা কেউ ফোনে খবর নিলে দায়সারা ঠান্ডা উত্তর দিই।

এরকম একটা অবস্থা যখন চলছে, তখন এক অমাবস্যার রাতে ছায়াটাকে আমি বন্দি করতে পারলাম। বনানী ব্যাপারটা দেখে ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। পরে, ধীরে-ধীরে, ব্যাপারটাকে সইয়ে নিয়েছে। আমিও

সইয়ে নিয়েছি। ধরে নিয়েছি, এটাই আমার নিয়তি।

একদিন রেডিয়োতে আপনার একটা ইন্টারভিউ শুনলাম। আমার খুব ভালো লাগল। তখনই মনে হল, আপানাকে আমার ব্যাপারটা আমি জানিয়ে যাব। অন্তত একজন ব্যাপারটা জানুক, যে এটা আগাপাস্তলা বিশ্বাস করবে।

তারপর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে আপনার ফোন নাম্বার জোগাড় করেছি।

এরপর তো আপনি সব জানেন!

অশেষ শিকদারের মুখটা ভীষণ বিষাদগ্রস্ত আর করুণ দেখাচ্ছিল। কাহিনি শেষ করে তিনি যেন কোনও কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

প্রিয়নাথ সিগারেট ধরিয়েছিলেন। অশেষবাবুও। ওঁদের দুজনের ধোঁয়া ঘরের মধ্যে কুয়াশা তৈরি করছিল। প্রিয়নাথ কালো ছায়াটাকে চোখের সামনে দেখতে চাইছিলেন। তাই মনে-মনে ধোঁয়াটার রং কালো করে দিলেন। তারপর জিগ্যেস করলেন, 'শেষের ব্যাপারটা তো আপনি ঠিক খুলে বললেন না! ছায়াটাকে কী করে আপনি বন্দি করলেন?'

অশেষ শিকদার মলিনভাবে হাসলেন। হাতের সিগারেটটা নিভিয়ে অ্যাশট্রেতে ফেলে দিলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, 'ছায়াটাকে আমি ঠিক বন্দি করিনি। বরং বলতে পারেন, ওটা নিজেই ধরা দিয়েছিল...' কথা বলতে-বলতে চোখের চশমাটা খুললেন অশেষবাবু, টেবিলে নামিয়ে রাখলেন : 'আপনাকে ব্যাপারটা দেখাই, তা হলে বুঝতে পারবেন...।'

পূর্ণ দৃষ্টি মেলে প্রিয়নাথের দিকে তাকালেন অশেষ শিকদার। ওঁর বড়-বড় চোখ দুটো ধীরে ধীরে ঘোলাটে হয়ে গেল। তারপর একটা গাঢ় কালো ছায়া কোথা থেকে এসে ওঁর চোখ দুটো ঢেকে দিল।

অবাক হয়ে প্রিয়নাথ দেখলেন, একটা মানুষ—অথবা, মানুষের ধ্বংসস্তূপ—কুচকুচে কালো রঙের দুটো আয়ত চোখ মেলে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। সে-চোখের সবটাই চোখের মণি—সাদার ছিটেফোঁটাও কোথাও নেই।

প্রিয়নাথ ভেতরে-ভেতরে কেঁপে উঠলেন।

অশেষবাবু এবার হাঁ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গে জমাট কালো ধোঁয়া ওঁর মুখের গহ্বর থেকে পাক খেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে লাগল। সেই ধোঁয়ার ভেতরে বালির কণার মতো চিকচিক করছে কয়েকটা সাদা আলোর ফুলকি।

'বুঝতেই তো পারছেন। শেষ পর্যন্ত আমার শরীরের ভেতরে আস্তানা গেড়েছে ওই কালো ছায়াটা। আমাকে ছেড়ে ও কিছুতেই কোথাও যাবে না। হয়তো এভাবেই তিলতিল করে আমাকে শেষ করবে।' অশেষবাবু কপাল চাপড়ে কাঁদতে শুরু করলেন। কান্না জড়ানো গলায় বললেন, 'আপনার কাছে কোনও সাহায্য আমি চাইতে আসিনি, মিস্টার জোয়ারদার। আমার অবস্থা এখন সব সাহায্যের বাইরে চলে গেছে। শুধু—শুধু আমার বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আপনাকে শোনাতে এসেছিলাম। আমি হলফ করে বলতে পারি, এরকম ঘটনার কথা আপনি কখনও শোনেননি—দেখেননি।'

অশেষবাবুর কথার তালে-তালে ওঁর মুখ থেকে কালো ধোঁয়ার ঝলক বেরিয়ে আসছিল। কালো ধোঁয়ার প্রকাণ্ড বেলুনটা তখন প্রিয়নাথের মাথার ওপরে ভাসছিল, দুলছিল। অশেষ শিকদার কালো চোখ মেলে সেই বেলুনটাকে দেখছিলেন।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার জীবনে এই প্রথম ভয় পেলেন।



# উপন্যাস



# দেখা যায় না, শোনা যায়

# এক

টিভি-র 'রেনবো' চ্যানেলের একটা প্রোগ্রাম প্রিয়নাথ জোয়ারদারকে খুব টানে। প্রতি সপ্তাহে প্রিয়নাথ নিয়ম করে এটা দেখেন।

প্রোগ্রামটার নাম 'তেনারা যেখানে আছেন'। সারা ভারতে কোথায়-কোথায় ভূত-প্রেতের আস্তানা এবং সেখানে ঠিক কী ধরনের ভূতুড়ে ব্যাপার-স্যাপার ঘটে বলে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস, সেসব নিয়েই জমকালো রুদ্ধশ্বাস প্রেজেন্টেশান।

এই উইকলি প্রোগ্রামটা দেখার সময় প্রিয়নাথ নোটবই আর পেন নিয়ে বসেন। যখনই মনে হয় তখনই নিজের মতো করে নোট নেন। আর তারই ফাঁকে-ফাঁকে সিগারেটে টান।

প্রোগ্রামটার ভৌতিক ব্যাপারগুলোও ভারী বিচিত্র।

তামিলনাড়ুর কোন গ্রামে নাকি একটা বটগাছ রাতে কথা বলে, ভবিষ্যদ্বাণী করে। লখনউয়ের কোন এক রাস্তায় একটা বিশেষ জায়গায় গিয়ে টাঙ্গা সবসময় উল্টে যায়।

উড়িষ্যার একটা পোড়োবাড়ির সামনে রাতে যদি কেউ যায় তা হলে শোঁ-শোঁ শব্দে বাতাসের ডাক শুনতে পায় আর তার সঙ্গে সমুদ্রের ঢেউ ভাঙার শব্দ। যদিও সমুদ্র সেখান থেকে সাড়ে চার কিলোমিটার দূরে।

বিহারের একটা রাজপ্রাসাদের মাপের প্রকাণ্ড বাড়ি নাকি ভারী অদ্ভুত। বহুযুগের পুরোনো ভাঙাচোরা ফাটল-ধরা ওই বাড়িটা থেকে প্রায়ই নানান অংশ খসে পড়ে। সেই খসে পড়া টুকরোগুলোর চেহারা মানুষের। মানে, এক-একটা টুকরো এক-একটা ভাস্কর্য—মানুষের নানান ভঙ্গিমার মূর্তি।

আজও রাত ন'টায় টিভি খুলে 'রেনবো' চ্যানেল চালিয়েছেন। মনোযোগী ছাত্রের মতো নোট নিচ্ছেন, সিগারেটে টান দিচ্ছেন, তখনই পাশের টেবিলে রাখা মোবাইল ফোন বেজে উঠল।

সিগারেট বাঁ-হাতে নিয়ে ডানহাতে ফোন তুললেন প্রিয়নাথ। 'অ্যাকসেপ্ট' বোতাম টিপলেন।

'হ্যালো, প্রিয়নাথ বলছি—।'

'ভূতনাথদা? আমি মিংকি—।'

অমনি গলার স্বর পালটে গেল প্রিয়নাথের : 'বলো, কী খবর? ঘরে বসে তোমাদের ''তেনারা'' প্রোগ্রামটা দেখছি...।'

মিংকি তেওয়ারি 'রেনবো' চ্যানেলের সাংবাদিক। 'তেনারা যেখানে আছেন' প্রোগ্রামটার কনসেপ্ট ওরই। তা ছাড়া এই প্রোগ্রামটা মিংকি আর ওর দুজন কলিগ মিলে প্রোডিউস করছে।

প্রিয়নাথ মিংকিকে প্রায় বছর চারেক ধরে চেনেন। চব্বিশ-পঁচিশের মিষ্টি মেয়ে। খুব চনমনে আর এনার্জিটিক। গত দু-বছরে দুবার ভূতনাথের টিভি ইন্টারভিউ নিয়েছে। প্রথম ইন্টারভিউর পর থেকেই আলাপটা গাঢ় হয়ে গেছে।

প্রিয়নাথ নিজে যখন পঁচিশ কি ছাব্বিশ, তখন থেকেই ভূতচর্চায় মেতেছেন। ভূত-প্রেতের খোঁজ করে-করে তিন দশকের বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছেন। তাই সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে কী করে যেন ওঁর শৌখিন নামটা পালটে গিয়ে 'ভূতনাথ' হয়ে গেছে। ওঁর কাছের মানুষরা ওঁকে সবসময় ভূতনাথ বলে ডাকে। মিংকিও তাই।

'মিংকি, তোমার প্রোগ্রাম কিন্তু দারুণ হচ্ছে। একইসঙ্গে ইন্টারেস্টিং আর ইনফরমেটিভ। দেখবে, তোমার ''তেনারা'' তাঁদের টি-আর-পি চড়াতে-চড়াতে কোথায় নিয়ে যান! কনগ্রাটস, মিংকি...!'

প্রিয়নাথ একতরফা কথা বলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই যেন খেয়াল করলেন মিংকি বেশ চুপচাপ, অথচ মেয়েটা অনেক কথা বলে, দারুণ কথা বলে।

'কী ব্যাপার, মিংকি?' প্রিয়নাথের গলায় উদবেগ।

'আর ব্যাপার—' ফোঁস করে একটা শ্বাস ছাড়ল মিংকি : 'ভূতনাথদা, আমার প্রোগ্রামের টি-আর-পি জিরো হতে চলেছে। কেন কি, বোধহয় নেক্সট উইক থেকে প্রোগ্রামটাই আমাদের প্রোডাকশন হাউস বন্ধ করে দেবে।'

'কেন? কেন?' হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিলেন। টিভির প্রোগ্রামের দিক থেকে চোখ সরে গেল।

'কেন আবার! কলকাতার একটা র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটি—নাম ''যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি''—তার সেক্রেটারি বেশ ভালোরকম থ্রেট দিয়ে আমাদের চ্যানেলে একটা চিঠি দিয়েছে। তাতে লিখেছে কি যদি আমরা এই প্রোগ্রামের সাপোর্টে কোনও প্রুফ না দিতে পারি, তা হলে পাবলিককে ব্লাফ দেওয়ার জন্যে, মিসলিড করার জন্যে, সাদা কথায় বোকা বানানোর জন্যে সে কোর্ট থেকে ইনজাংশান অর্ডার বের করবে, কোর্টে কেস ঠুকবে।

'আমাদের চ্যানেলের ডিরেক্টার আমাকে ডেকে বলেছেন, সাপোর্টিং প্রুফ খুঁজে বের করতে। এবং জলদি বের করতে। সো ভূতনাথদা, প্লিজ সেভ মি। য়ু ফাইন্ড আউট সাম ব্লাডি প্রুফ ফর মি। যেমন করে হোক এই প্রসার সমিতিকে ঠেকান।'

শেষদিকে মিংকির কথাগুলো আর্ত অনুনয়ের মতো শোনাল।

ভূতনাথের খুব খারাপ লাগছিল। ভূত আছে কি নেই, এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে সংশয় অসংশয়ের দোলা চিরকালের। এই প্রশ্নের উত্তরে ভূতনাথ যেটা বলেন সেটা হল : ভূত হল ছোটবেলায় পড়া জ্যামিতিক বিন্দুর সংজ্ঞার মতো। বিন্দুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বা বেধ নেই, কিন্তু অবস্থিতি আছে। অর্থাৎ, মাপা না গেলেও তার অস্তিত্ব আছে। তেমনি বিজ্ঞান বা যুক্তি দিয়ে মাপা না গেলেও ভূতের অস্তিত্ব আছে।

'যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি'-র ওই সম্পাদক বিজ্ঞান আর যুক্তি দিয়ে মেপেই প্রমাণ করতে চান যে, ভূত বলে কিছু নেই!

মনে-মনে হাসলেন প্রিয়নাথ। যুক্তিবাদের গুরুমশাই ওই সম্পাদকের সঙ্গে দেখা হলে প্রিয়নাথ সবিনয়ে জানতে চাইবেন, ভগবানের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত কোনও মহান কায়দা তাঁর জানা আছে কি না।

'ওকে, মিংকি—তুমি একটা কাজ করো। কাল সকাল এগারোটা নাগাদ তুমি আমার বাড়িতে আসতে পারবে?

'অফ কোর্স পারব!' তড়িঘড়ি বলে উঠল মিংকি, 'ডিরেক্টারকে খুশ না করতে পারলে আমাকে অন্য চ্যানেলে নোকরির জন্যে লাইন লাগাতে হবে। কাল এগারোটাতেই আসব। শার্প।'

'তা হলে শোনো, তুমি সঙ্গে কী-কী নিয়ে আসবে। তোমার প্রোগ্রামটার সবক'টা এপিসোডের ডিভিডি—যেগুলো টেলিকাস্ট হয়েছে সেগুলো, আর যেগুলো এখনও টেলিকাস্ট হয়নি, কিন্তু হবে—সেগুলোও। মানে, টোটাল সিরিজটার ডিভিডি নিয়ে আসবে।'

'ওকে। আর কী আনব বলুন—?'

'ওই র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির সেক্রেটারির চিঠির একটা জেরক্স কপি—ব্যস, আর কিছু লাগবে না।'

'ওঃ, খুব হালকা লাগছে। ভূতনাথদা, থ্যাংক য়ু সো মাচ। সি য়ু টুমরো—।'

ফোন ছেড়ে দিল মিংকি।

প্রিয়নাথ আবার 'তেনারা যেখানে আছেন' প্রোগ্রামটায় মনোযোগ দিলেন।

প্রোগ্রামটায় যথেষ্ট মেটিরিয়াল আছে। এটার জন্য মিংকিরা প্রচুর হোমওয়ার্ক করেছে, লেগওয়ার্ক করেছে, বাড়াবাড়িরকমের খেটেছে। প্রতিটি এপিসোডের ভূতুড়ে জায়গায় গিয়ে অন লোকেশান শুট করেছে, লোকাল লোকজনের বাইট নিয়েছে। তারা কথা বলেছে যার-যার নিজের ভাষায়। কিন্তু মিংকিদের প্রোগ্রামে সেইসব

কথার বাংলা অনুবাদ টিভির পরদায় পাশাপাশি ফুটে উঠেছে, তারপর ধীরে-ধীরে স্ক্রোল করে গেছে। আর তার সঙ্গে সিনক্রোনাইজ করে অফ-ভয়েস কমেন্ট্রি।

নাঃ, মানতেই হবে, মিংকিদের প্রোগ্রামটা বেশ কনভিন্সিং। আর সেইজন্যই তো প্রিয়নাথ জোয়ারদার সেই প্রোগ্রাম দেখে নিয়মিত নোট নেন!

প্রোগ্রামটা শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার জায়গায় অন্য একটা সিরিয়াল শুরু হয়ে গেছে। প্রিয়নাথ আনমনা হয়ে টিভির পরদার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অথচ কিছুই দেখছিলেন না। ওঁর মাথায় মিংকির সমস্যাটা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। মনে-মনে তার একটা সমাধান খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

## দুই

ঠিক এগারোটায় কলিংবেলের টুং-টাং শব্দ হল।

প্রিয়নাথ একটা বই পড়ছিলেন : ডাডলি রাইটের লেখা 'দ্য বুক অফ ভ্যাম্পায়ারস'। ১৯২৪ সালে ছাপা সেকেন্ড এডিশান। কলিংবেলের শব্দ পেয়ে হাতের বইটা বন্ধ করলেন।

দরজা খুলতেই সামনে মিংকি তেওয়ারি। হাতে একটা বড়সড়ো প্লাস্টিকের প্যাকেট।

ফরসা, বয়কাট চুল, ছোট অথচ টানা চোখ, নাক একটু ছড়ানো, চোখের কোণে হাসির ছোঁয়া। সবমিলিয়ে বেশ সুন্দর দেখতে।

মিংকির পায়ে ব্লু জিনস। গায়ে হালকা ব্লু টপ—রাউন্ড নেক, এবং বেশ আঁটোসাটো। টপের ওপরে কায়দা করে গাঢ় নীল রঙে লেখা : আই অ্যাম নট ফর সেল।

ওর বাঁ-হাতে একটা সিনথেটিক ব্যাঙ্গল আর কানে হোয়াইট মেটালের দুটো ফুল।

'এসো, ভেতরে এসো—।' ওকে স্বাগত জানালেন প্রিয়নাথ।

প্রিয়নাথের আস্তানা উত্তর কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিটের একটা পুরোনো বাড়িতে। মিংকি এ-বাড়িতে আগে অনেকবার এসেছে। তাই প্রিয়নাথের ড্রয়িংরুমের ছন্নছাড়া চেহারা ওর ভালো করেই চেনা।

'ব্যাচিলারস ডেন' বলতে যা বোঝায় ঘরটা চরিত্রে ঠিক তাই।

একদিকের দেওয়ালে গাদা-গাদা বই ঠাসা। সেই তাক 'হাউসফুল' হয়ে যাওয়ায় বই এসে জড়ো হয়েছে একটা টেবিলে, টেবিল থেকে চেয়ারে, আর সবশেষে মেঝেতে।

একটা পুরোনো সোফার এক কোণে প্রিয়নাথ বসেছিলেন। পরনে বাদামি-সাদা স্ট্রাইপড হাফশার্ট আর সাদা পাজামা। ডাডলি রাইটের বইটা মাঝ-পাতায় উপুড় করে সোফায় রেখেছেন। মিংকিকে সোফার অন্য কোণটা দেখিয়ে বললেন, 'বোসো, মিংকি। যতটা পারো কমফোর্টেবল হও।'

মিংকি চটপট গিয়ে সোফায় বসে পড়ল। হাতের প্যাকেটটা পাশে রাখল। ঘরের দেওয়ালে, টেবিলে, চেয়ারে আর মেঝেতে আশ্রয় নেওয়া বইয়ের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভূতনাথদা, ভূত ধরার কাজটা খুব পেইনফুল, না? এত্ত বই পড়তে হয়! নোবডি উইল বিলিভ ইট...।'

প্রিয়নাথ ছোট্ট করে হাসলেন। বললেন, 'সব কাজই পেইনফুল, মিংকি। নো পেইন, নো গেইন...।'

মিংকি খিলখিল করে হেসে ফেলল, বলল, 'ওয়েল সেইড।'

ওর দিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথের একটা গানের লাইন মনে পড়ল : 'আমি চঞ্চল ঝরনাধারা...।'

মিংকিকে সামনাসামনি কিংবা টিভিতে যখনই দেখেন তখনই মনে হয় ওর 'জাগিয়া উঠেছে প্রাণ'। কিন্তু আজ ঝরনাধারার গতি কিংবা প্রাণ জেগে ওঠার তেজ বেশ স্তিমিত বলে মনে হল।

ওকে একটু বসতে বলে প্রিয়নাথ ভেতরের ঘরে গেলেন। একটু পরেই একটা প্লেটে দুটো সন্দেশ আর একগ্লাস জল নিয়ে এলেন। একটা টি-টেবিলের ওপরে প্লেট আর গ্লাস রেখে টেবিলটা টেনে এগিয়ে দিলেন মিংকির কাছে। বললেন, 'খেয়ে নাও। ঠাকুরের প্রসাদ—।'

মিংকি একবার ভূতনাথের মুখের দিকে তাকাল শুধু। ও জানে এই অদ্ভুত মানুষটা আত্মা এবং প্রেতাত্মা—দুটোকেই বিশ্বাস করে। ঠাকুরের পুজোপাঠ ওর রোজকার নিয়ম। তার সঙ্গে ভূত-প্রেতচর্চাও।

সন্দেশ দুটো খেতে-খেতে বাঁ-হাতে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা প্রিয়নাথের দিকে এগিয়ে দিল মিংকি। জড়ানো গলায় বলল, 'চারটে ডিভিডি আছে। সিরিয়াল নাম্বার দেওয়া আছে। আর ওই র‍্যাশনালিস্ট লোকটার চিঠির কপি—।'

প্রিয়নাথ প্যাকেটের ভেতরে উঁকি মেরে দেখলেন। তারপর হাত ঢুকিয়ে চিঠিটা বের করে নিলেন। প্যাকেটটা পাশে রেখে চিঠিটা পড়তে শুরু করলেন।

মিংকি তখন জলের গ্লাস শেষ করে প্রিয়নাথের ঘরটাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছিল।

জোড়াতালি দেওয়া ড্যাম্প ধরা দেওয়াল। তার সাদা রঙের আস্তর অনেক জায়গা থেকেই খসে পড়েছে। ঘরের সিলিং-এ কড়ি-বরগা—লোহা আর কাঠের তৈরি। কোথাও-কোথাও রং চটে গিয়ে লোহায় জং ধরে গেছে। সেই ব্যাকগ্রাউন্ডে পুরোনো বুড়ো সিলিং ফ্যানটাও দিব্যি মানিয়ে গেছে।

যে-সোফাটায় মিংকি বসে আছে তার ঠিক মুখোমুখি একটা রঙিন এলসিডি টিভি। আর তার পাশে একটা পুরোনো জমকালো স্টাইলের খাটো আলমারি—পালিশ করা কাঠ দিয়ে তৈরি এবং তার পাল্লায় একটা আয়না বসানো।

ঘরটা থেকে কেমন যেন একটা পুরোনো-পুরোনো গন্ধ বেরোচ্ছিল— ন্যাপথালিন, ব্লিচিং পাউডার আর বাঁধাকপি সেদ্ধর গন্ধ মেশানো।

মিংকি বলল, 'ঘরটার একটু ফেস লিফট করাতে পারেন না! কেমন ব্যাকডেটেড...পুরোনো...। এখানে ভূত-টুত থাকলে আমাদের প্রোগ্রামটায় দিব্যি ফিট করে যেত।'

'উঁ?' বলে চিঠিটা থেকে মুখ তুললেন প্রিয়নাথ। একটু হেসে বললেন, 'দ্যাখো, মিংকি—এ-ঘরে একমাত্র ওই টিভি আর ডিভিডি প্লেয়ার ছাড়া সবই বেশ পুরোনো। তার মধ্যে এই লোকটাও কিন্তু আছে—' বলে নিজের বুকে বুড়ো আঙুল ঠুকলেন।

'পুরোনো' লোকটাকে খুঁটিয়ে দেখল মিংকি।

কপালটা ওপরদিকে বাড়তে-বাড়তে বেশ বড়সড়ো টাকের চেহারা নিয়েছে। তার দুপাশে, কানের ওপরটায়, কয়েক খাবলা চুল—কাঁচা-পাকা। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। তার ঠিক ওপরেই কপালে কয়েক লাইন স্থায়ী ভাঁজ। কান দুটো মাপে বেশ বড়। নাকটাও খড়গ টাইপের।

প্রিয়নাথ জোয়ারদারের চেহারা এমনিতে ফরসা, সৌম্যকান্তি। তবে তারই মধ্যে ব্যক্তিত্বের জোরটা কীভাবে যেন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। বয়েস ষাটের কাছাকাছি হলেও চেহারা আর স্বাস্থ্য দেখে অনেকটা কম বলে মনে হয়।

'টিভি আর ডিভিডি প্লেয়ারটা নতুন কেন? আগের টিভিটা কোথায় গেল?' ঘাড় বাঁকিয়ে জেদি মেয়ের গলায় জানতে চাইল।

'নতুন তার কারণ পুরোনো বেঢপ টিভিটা দেড়মাস আগে খারাপ হয়েছে বলে। আর আমার কাজের জন্যে ডিভিডি প্লেয়ার ছাড়া বড্ড অসুবিধে হচ্ছিল। যেমন, এই তোমার প্রবলেমটাই ধরো না—' বাঁ-হাতটা শূন্যে নাড়লেন প্রিয়নাথ : 'যাকগে, এসব গোয়েন্দা-মার্কা কোশ্চেন বাদ দাও। এখন বলো তো, এই র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির সেক্রেটারির হুমকির ব্যাপারটা কী করবে?'

'ও মাই গড! আমি কী করব? করবেন তো আপনি—' চোখ বড়-বড় করে বলল মিংকি।

'ও—' চিঠিটা হাতে নিয়ে চোখ বুজলেন প্রিয়নাথ। ভাবনার মধ্যে ডুবে গেলেন কিছুক্ষণ।

তারপর চোখ খুলে তাকালেন চিঠিটার দিকে। র‍্যাশনালিস্ট সোসাইটির লেটারহেডে ছাপা চিঠি। বেশ জঙ্গি ভাষায় লেখা। নীচে সই রয়েছে এবং লেখকের নামও ছাপানো আছে : রমাশঙ্কর দত্ত।

'এই রমাশঙ্কর দত্ত লোকটা কীরকম?'

'আমার একদম পছন্দ নয়—' ঠোঁট ওলটাল মিংকি : 'কথাবার্তা বলে খুব বাজে ভাবে। মনে লাগে কি আমার বসের চেয়েও বড় কর কুছ। খালি হুকুম আর হুমকি...।'

'মিংকি, চিঠিটা পড়ে আমার মনে হচ্ছে এর হুমকিগুলো ফাঁকা আওয়াজ নয়। সত্যি-সত্যি যদি তুমি সাপোর্টিং প্রুফ জোগাড় করতে না পারো তা হলে তোমার প্রোগ্রাম ও শিকেয় তুলবে।'

'শিকেয় তুলবে?' অবাক হয়ে ভূতনাথের দিকে তাকাল মিংকি : 'শিকেয় মানে কী?'

হেসে ফেললেন প্রিয়নাথ। 'শিকেয়' শব্দটার অর্থ মিংকি তেওয়ারি বুঝতে পারেনি। তাই খোলসা করে বললেন, 'প্রুফ জোগাড় করতে না পারলে তোমার প্রোগ্রামের চ্যাপ্টার ক্লোজড হয়ে যাবে।'

মিংকি একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর হঠাৎই আশা ভরা চোখে তাকাল ভূতনাথের দিকে। এক ঝলক হেসে বলল, 'আপনি তো প্রুফ জোগাড় করে দিচ্ছেন! এ ব্যাপারে আপনি ফেমাস। য়ু আর দ্য গ্রেটেস্ট।'

প্রিয়নাথ একটু হাসলেন। কিন্তু মনে-মনে তখনও নানান কথা ভাবছিলেন, সমস্যা সমাধানের একটা পথ খুঁজছিলেন।

'আচ্ছা, মিংকি, তোমাদের এই প্রোগ্রামটায় কলকাতা বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোনও ভূতুড়ে বাড়ি-টারি দেখানো হয়নি?'

'আছে, তবে এখনও টেলিকাস্ট হয়নি। পসিবলি তিন-চারটে এপিসোড পরে আছে।'

'গুড। সেটাই হবে আমাদের ফোকাস।' প্রিয়নাথ চিঠিটা শূন্যে দুবার নাড়লেন। তারপর : 'আমি কাল রাতের মধ্যে সবক'টা এপিসোড দেখে রাখছি। তারপর তোমাকে ফোন করে আমার ওপিনিয়ান দেব।'

'কিন্তু আপনি কি কোনও লাইন অফ অ্যাকশান ভেবেছেন?'

চিঠিটা সোফায় নামিয়ে রেখে ভূতনাথ বললেন, 'ভেবেছি। ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে-এপিসোডটা তোমার সিরিয়ালে আছে সেটা আমি ইনভেস্টিগেট করে দেখব। যদি প্রুভ করতে পারি যে, ব্যাপারটা জেনুইন তা হলে তুমি জিতবে, রমাশঙ্কর হারবে। আর যদি ভূত-প্রেতরা আমাকে দেখা না দেয় তা হলে ব্যাড লাক। রমাশঙ্কর উইনস—য়ু লুজ।'

'ইম্পসিবল। কারণ, আমাদের চ্যানেলের টিম খুব জেনুইন। ওরা খুব অনেস্টলি কাজ করেছে। তা ছাড়া ''রেনবো'' এই প্রোডাকশানটার জন্যে বহত পয়সা ইনভেস্ট করেছে—।' ব্যাপারটা জোর দিয়ে বোঝানোর জন্য বাতাসে হাত নাড়ল মিংকি : 'আমি বলছি আপনি প্রুভ করতে পারবেন।'

প্রিয়নাথ গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়লেন। ছোট্ট করে বললেন, 'হুঁ—।'

'আমি তা হলে আপনাকে কবে ফোন করব?' প্রশ্নটা করেই উঠে দাঁড়াল মিংকি।

প্রিয়নাথ তড়িঘড়ি হাত নেড়ে ওকে বললেন, 'আরে, উঠছ কী? বোসো, বোসো। তোমাকে আমি চা করে খাওয়াব...।'

'না, ভূতনাথদা—' পকেট থেকে মোবাইল বের করে সময় দেখল : 'অফিসে ঢুকতে দেরি হয়ে যাবে...।'

প্রিয়নাথ বললেন, 'ডোন্ট ফরগেট, তুমি এখানে অফিসের কাজেই এসেছ। তা ছাড়া তোমার জন্যে চা করলে আমিও বাদ যাব না। আর তা হলেই একটা সিগারেট ধরানোর চান্স পাব—।'

'ওঃ, আপনার এই হ্যাবিটটাই বহত বাজে। সিগারেট। আপনি জানেন না, সিগারেট স্মোক করাটা ইনজুরিয়াস টু হেলথ?'

'হ্যাঁ, জানি।' হেসে বললেন ভূতনাথ, 'আর সিগারেটের মতো ভূত ধরে বেড়ানোটাও তো স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর! কিন্তু মিংকি, বিলিভ মি, এ-দুটোর কোনওটাই আমি ছাড়তে পারব না। আই লাভ দেম...।'

## তিন

জায়গাটার নাম চপলকেতু। এরকম নামের যে-কোনও জায়গা হতে পারে সেটাই প্রিয়নাথ জানতেন না। এপিসোডের শুরুতেই বড় করে টাইটেল দেখা গেল পরদায় : 'চপলকেতুর চপল ছায়া'। তার নীচেই মাঝারি হরফে লেখা : 'পশ্চিমবঙ্গ'।

সন্ধেবেলা পুজোপাঠ সেরে টিভির সামনে বসেছেন ভূতনাথ। ওঁর পাশেই একটা ছোট টেবিলে টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। টেবিল-ল্যাম্পের হলুদ ঘেরাটোপে লাল বুটির নকশা।

টেবিল-ল্যাম্পের এই আলোটুকু ছাড়া ঘর অন্ধকার।

ডিভিডি প্লেয়ারে মিংকি তেওয়ারির দিয়ে যাওয়া ডিভিডি চলছে। পশ্চিমবঙ্গের এপিসোডটা আরও একবার দেখছেন। হাতে প্যাড আর ডট পেন।

মিংকির দেওয়া চারটে ডিভিডি-ই প্রিয়নাথের দেখা হয়ে গেছে। সেই সকাল ন'টা থেকে দেখা শুরু করেছেন। মাঝে-মাঝে ব্রেক দিয়ে স্নান, খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়েছেন। তারপর সবক'টা এপিসোড দেখে শেষ করতে-করতে দুপুর সওয়া দুটো।

এপিসোডগুলো খুবই প্রফেশনালি তোলা। যেমন স্মার্ট ডায়রেকশান, তেমনই স্মার্ট সিনেমাটোগ্রাফি। এই এপিসোডগুলোকে জুড়ে এডিট করে খুব সহজেই বড় পরদার জন্য একটা দারুণ ছবি তৈরি করে ফেলা যায়।

দুপুরে পশ্চিমবঙ্গের এপিসোডটা দেখেছেন সাধারণ দর্শকের চোখে। এখন সেটা আবার দেখতে বসেছেন ভূতশিকারির চোখে।

এপিসোড শুরু হওয়ার পর থেকেই ধারাভাষ্য শুরু হয়ে গেল। কখনও সেটা মহিলার গলায়, কখনও-বা পুরুষের।

জায়গাটা একটা গণ্ডগ্রাম। বর্ধমান কর্ড লাইনের শিবাইচণ্ডীতে নেমে ভেতরদিকে আরও ন'-দশ কিলোমিটার যেতে হয়।

শুরুতে জায়গাটার নানান অংশের ফটোগ্রাফ মিক্স করে-করে দেখানো হচ্ছিল—সঙ্গে ব্যাকগ্রাউন্ড এফেক্ট মিউজিক। সবমিলিয়ে গা-ছমছমে পরিবেশটা বেশ জমে উঠল।

তারপরই পরদা জুড়ে একটা রঙিন ম্যাপ দেখানো হল—পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ। সেই ম্যাপে দুটো বড়-বড় সিঁদুরের টিপ : একটা কলকাতা, আর একটা চপলকেতু। একটা চওড়া লাল রেখা কলকাতা থেকে চপলকেতু যাওয়ার রাস্তাটা আঁকতে শুরু করল, আর তার সঙ্গে চলতে লাগল সেই রাস্তা ধরে যাওয়ার খুঁটিনাটি বিবরণের ধারাভাষ্য। শুনলেই বোঝা যায়, ওই রাস্তা ধরে সত্যিকারে না গেলে এরকম বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়।

রাস্তার পরিচয় শেষ হল আর তার সঙ্গে-সঙ্গে ক্যামেরাও ঢুকে পড়ল গ্রামে। ট্রাভেল এজেন্সির প্রোগ্রামের মতো গ্রামের নানান জায়গা দেখানো হল, 'অফ ভয়েস'-এ দর্শককে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। তারপর সাংবাদিক মেয়েটিকে দেখা গেল—মাইক হাতে একটা পুরোনো মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জানা গেল, মেয়েটি 'রেনবো' চ্যানেলের তৃষ্ণা। এই ভাঙাচোরা মন্দির—অথবা, মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থেকেই ওর ভূতুড়ে আস্তানার অভিযান শুরু।

প্রিয়নাথ প্রোগ্রামটা দেখছিলেন আর চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। আবার কখনও-কখনও টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় প্যাডের কাগজে নোট নিচ্ছিলেন।

টেবিল-ল্যাম্পের পাশে ওঁর মোবাইল ফোন সাইলেন্ট মোডে রাখা ছিল। মাঝে-মাঝে ওটার আলো দপদপ করে উঠছিল, কিন্তু প্রিয়নাথ সেদিকে এখন তাকাচ্ছিলেন না। পরে সময়মতো দেখবেন, দেখে দরকারি যোগাযোগগুলো সেরে নেবেন।

তৃষ্ণা ছাড়াও আরও দুজন সাংবাদিককে ছবিতে দেখা গেল। প্রোগ্রামটার একঘেয়েমি কাটাতেই হয়তো তিনজন সাংবাদিককে ব্যবহার করা হয়েছে। ওরা ফটোগ্রাফারদের নাম বলছিল, কিন্তু তাদের দেখা যাচ্ছিল না। প্রিয়নাথ সবার নামই টুকে নিলেন। তার সঙ্গে এপিসোডে দেখানো জায়গাগুলোও নোট করে নিলেন।

এপিসোডটা সত্যিই বেশ অদ্ভুত। মিংকিরা যা-যা দেখিয়েছে সেগুলো যদি সত্যি হয় তা হলে মানতেই হবে, চপলকেতুর এই অঞ্চলটা বিচ্ছিরিরকম ভূতুড়ে।

এটা ঠিকই যে, ভৌতিক কাণ্ডকারখানাগুলো তৃষ্ণাদের চোখের সামনে ঘটেনি, আর ওদের ক্যামেরাও চলেছে শুধু দিনেরবেলায়। স্থানীয় লোকজন কোনও-কোনও ঘটনা আবছাভাবে বর্ণনা করেছে। তৃষ্ণারা সেসব

কথা রেকর্ড যেমন করেছে তেমনই স্পেশাল এফেক্ট আর অ্যানিমেশান ব্যবহার করে অলৌকিক ঘটনাগুলো দর্শকদের সামনে 'জ্যান্তভাবে' তুলে ধরার চেষ্টা করেছে।

মিংকিদের প্রোগ্রামে গ্রাফিক্সের কাজ অত্যন্ত চমৎকার। ওরা প্রোগ্রামে চপলকেতুর একটা রঙিন ম্যাপও দেখিয়েছে। তাতে ভূতুড়ে বা 'হন্টেড' অঞ্চলটা লাল রঙের গণ্ডি টেনে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে। এবং তৃষ্ণা আর ওর সঙ্গীরা বলেছে যে, খুব দায়ে না পড়লে গাঁয়ের লোকেরা ওই অঞ্চলটার ছায়া মাড়ায় না। দিনেরবেলা যদিও বা দু-চারজন ওই এলাকার ওপর দিয়ে যাতায়াত করে, রাতে কারও মাথায় ওরকম দুর্বুদ্ধি চাপে না।

এ পর্যন্ত ব্যাপারটা মোটামুটি ঠিকই ছিল, কিন্তু গোলমাল পাকিয়েছেন পত্রলোচন সিংহ রায় নামে একজন ভদ্রলোক। তিনি ওই স্পর্শকাতর অঞ্চলেই বসবাস করেন। একা নয়—সপরিবারে। ওই এলাকার শতকরা আশি ভাগ সম্পত্তিই তাঁর। বাকি কুড়িভাগের যারা মালিক তারা কখনও ভুল করেও নিজেদের মালিকানা ফলাতে যাননি। ওই পত্রলোচনই স্ত্রী আর ছেলে নিয়ে কেমন করে যেন টিকে আছেন।

মিংকিদের প্রোগ্রামের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই রয়েছে পত্রলোচন সিংহ রায়ের সাক্ষাৎকার—যদিও প্রথমটা তিনি টিভি ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে রাজি হননি। তারপর যখন বুঝেছেন ওঁর এলাকার ভূতুড়ে কাণ্ডকারখানা টিভির কল্যাণে পাঁচকান হবেই তখন নিমরাজি হয়ে ইন্টারভিউ দিয়েছেন।

ভদ্রলোক বলেছেন, তিনি নাকি বারো ভুঁইয়ার একজন—মুকুন্দ রায়— তাঁর বংশধর, এবং চপলকেতুর জমিদার। যদিও গ্রামের কেউই তাঁকে জমিদার বলে মান্য করে না।

পত্রলোচনের বিষয়-সম্পত্তির হাঁকডাক বলতে গেলে চমকে ওঠার মতো। আর ওই ভূতুড়ে এলাকায় তাঁর স্থাবর সম্পত্তিও মোটেই কম নয়।

পত্রলোচনের ওই উপদ্রুত অঞ্চলের মধ্যে কী নেই! বড়-বড় থামওয়ালা চারটে বাড়ি—সবক'টাই দোতলা এবং তিনমহলা। তবে সময়ের চাপে এবং অযত্নে এখন তাদের দশমীদশা। খুব পাতলা ইটের তৈরি লোহার কড়ি-বরগাওয়ালা বাড়ি। তার সর্বত্র বট আর অশ্বত্থগাছের রমরমা। তার ফলে ঘন পাতার ফাঁকে-ফাঁকে পাখি আর বাদুড়ের আস্তানা।

চারটে বাড়ি ছাড়াও ওই বদনামী এলাকায় রয়েছে দুটো মন্দির, চারটে পুকুর, আর চণ্ডীমণ্ডপ সমেত একটা প্রকাণ্ড মাপের নাটমঞ্চ। এককালে নাকি এই নাটমঞ্চে নাচ, গান, অভিনয়ের আসর বসত—আর সেখানে অন্তত দুশো দর্শক বসানোর ব্যবস্থা ছিল।

সবমিলিয়ে পত্রলোচনের ভূতগ্রস্ত এলাকাটাকে প্রিয়নাথ জোয়ারদারের বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হল। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার তিনি লক্ষ করলেন : মিংকিদের প্রোগ্রামটায় ভৌতিক কাণ্ডকারখানা কিছু দেখা না গেলেও কিছু-কিছু অদ্ভুত শব্দের অস্পষ্ট রেকর্ডিং শোনানো হয়েছে। এই শব্দগুলোর খুব একটা বিস্তারিত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়নি। অন্তত তৃষ্ণা এবং ওর দুই সহ-রিপোর্টার তাই জানিয়েছে। আরও জানিয়েছে যে, পত্রলোচন সিংহ রায়ের ধারণা পূর্বপুরুষের কোনও অভিশাপেই ওঁর এই জায়গাটা অভিশপ্ত। তবে তার জন্য এখনও পর্যন্ত কারও তেমন ক্ষয়-ক্ষতি হয়নি। শুধু দু-চারজন মানুষ নাকি ওই এলাকা থেকে রহস্যময়ভাবে লোপাট হয়ে গিয়েছে। পত্রলোচন এরকমটাই বলেছেন।

প্রিয়নাথ প্রোগ্রামটা অনেকক্ষণ ধরে 'জরিপ' করলেন। কোনও-কোনও জায়গা বারবার 'রিওয়াইন্ড' করে পরখ করলেন। ফলে সাতাশ মিনিটের ডিভিডি দেখে শেষ করতে প্রিয়নাথের প্রায় দেড়ঘণ্টা লেগে গেল। তারপর টিভি আর ডিভিডি প্লেয়ার অফ করে সোফায় গা এলিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন। টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় প্যাডের পাতায় লেখা নোটস-এর দিকে অলস চোখে তাকিয়ে রইলেন।

দু-চারজন মানুষের লোপাট হওয়াটা 'তেমন ক্ষয়-ক্ষতি' নয়? আশ্চর্য! পত্রলোচন এরকমটা বললেন কেন?

নাঃ, ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার জন্য চপলকেতু যাওয়াটা খুব জরুরি। আর সেইজন্যই মিংকির সঙ্গে একটু কথা বলা দরকার।

সোজা হয়ে বসলেন প্রিয়নাথ। প্যাড টেবিলে রেখে মোবাইল ফোনটা খুঁজতে শুরু করলেন। এই তো ছিল! কোথায় যে গেল!

ফোনটা খুঁজে পেলেন সোফার গদির খাঁজে। তারপর মিংকির নম্বর ডায়াল করলেন। মেয়েটা নিশ্চয়ই এখন অফিসে—একগাদা কাজ নিয়ে ছুটোছুটি করছে।

ফোন একবার রিং হতেই মিংকি ফোন কেটে দিল।

প্রিয়নাথ খানিকটা হতাশ হয়ে মিংকির ফোনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

মিনিট পনেরোর বেশি অপেক্ষা করতে হল না। মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল।

'হাই, ভূতনাথদা—।' মিংকি।

'হ্যাঁ—তোমাকেই ফোন করছিলাম। কয়েকটা ইম্পর্ট্যান্ট কথা বলার আছে।'

'বলুন...।'

'তুমি বিজি না তো?'

'না, না—বলুন। আপনার হেলপ এখন আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি।'

'তুমি তা হলে একটু কাগজ পেন নাও। কয়েকটা জিনিস একটু লিখে নিতে হবে...।'

দশ-বারো সেকেন্ড চুপচাপ। তারপরঃ 'বোলিয়ে, দাদা। আই অ্যাম রেডি...।'

'চপলকেতুর এপিসোডটা আমি ক্রিটিক্যালি স্টাডি করেছি। ব্যাপারটা থরোলি ইনভেস্টিগেট করতে হলে আমাকে চপলকেতু যেতে হবে। তার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে। আর ''যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি''-র সেক্রেটারি রমাশঙ্কর দত্তকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হবে...।'

'রমাশঙ্করজি তো সেখানে গিয়ে সবকিছু ছানবিন করার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়েই আছে। কোত্থেকে আমার মোবাইল নাম্বার জোগাড় করে আমাকে লাস্ট চার দিনে দুবার ফোনও করেছে। বলছে কী, যদি আপনারা জেনুইন হন তা হলে আমাকে অথরাইজ করে দিন—আমি অন ইয়োর বিহাফ চপলকেতুর ব্যাপারটা ইনভেস্টিগেট করছি। বের করে দিচ্ছি জায়গাটা সত্যি-সত্যি হন্টেড না নাটকবাজি। তো আমাদের চ্যানেলের ডিরেক্টর সে-পারমিশান দেননি। আমাকে বলেছেন, যে-কোনও লোককে আমি এভাবে অথরাইজেশান দিতে পারি না। তখন আমি ডিরেক্টর স্যারকে আপনার কথা বলেছি। আপনার নাম শোনার সঙ্গে-সঙ্গে স্যার ''ইয়েস'' বলে দিয়েছেন। তার পর আমি আপনাকে কনট্যাক্ট করেছি— তার আগে নয়।'

'মিংকি, আমি তোমাকে এই কথাটাই বলতে চাইছিলাম। লিখে নাও— তোমাদের ডিরেক্টরের কাছ থেকে আমার একটা অফিশিয়াল অথরাইজেশান দরকার।' একটু থামলেন ভূতনাথ। মিংকিকে লিখে নেওয়ার সময় দিলেন। তারপর : 'আমাদের চপলকেতু ভিজিটের ব্যাপারটা জানিয়ে চপলকেতুর নিয়ারেস্ট পুলিশ ফাঁড়িতে একটা চিঠি দিতে হবে। এ ছাড়া একই চিঠি দিতে হবে লোকাল এমএলএ আর ডিএম-কে। এসব কাগজ চালাচালির ব্যাপার ঠিকমতো না করে রাখলে পরে ঝামেলা হতে পারে।'

নোট নেওয়া শেষ করতে মিংকি একটু সময় নিল। তারপর বলল, 'ভূতনাথদা, আমাদের প্রোগ্রামটা শুট করতে যাওয়ার সময় পারমিশান বগেরা যা কিছু সব আমিই ছুটোছুটি করে জোগাড় করেছিলাম। আমি ডিরেক্টর স্যারকে বলে এসব অ্যারেঞ্জমেন্ট কমপ্লিট করে নিচ্ছি—আপনি এ নিয়ে কোনও টেনশান নেবেন না। তবে আমার একটা সাজেশান আছে। আই হোপ, আপকা পারমিশান মিল জায়েগা।'

'কী সাজেশান? বলো—।'

'আমাদের চ্যানেল থেকে তৃষ্ণা আর বিনোদকুমারও আমাদের সঙ্গে যাবে। তৃষ্ণা—আমাদের রিপোর্টার—ওকে আপনি প্রোগ্রামটায় দেখেছেন। আর বিনোদকুমার আমাদের এক্সপার্ট ক্যামেরাম্যান। চপলকেতুর এপিসোডটা শুট করার সময় বিনোদকুমার ছিল মেইন ক্যামেরাম্যান। হোয়াট ডু য়ু সে, ভূতনাথদা?'

প্রিয়নাথ বললেন, 'ওরা গেলে আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে আমার ইনভেস্টিগেশানের কাজে যেন কোনওরকম ডিসটার্ব্যান্স না হয়...।'

'আপ বেফিকর রহিয়ে, ভূতনাথদা—কোই ডিসটার্ব্যান্স নহি হোগা। আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। তা ছাড়া আরও একটা প্ল্যান আমার আছে।'

'কী প্ল্যান?'

'একসিলেন্ট প্ল্যান।' ঝরনার শব্দে হাসল মিংকি : 'আমাদের এই ইনভেস্টিগেশানের ব্যাপারটাও বিনোদকুমার শুট করবে। সেটা থেকে এডিট করে আমরা একটা ফরটি ফাইভ মিনিটস-এর প্রোগ্রাম বানাব। আমাদের ডিরেক্টর স্যার এই প্রোপোজালটা ওকে করেছেন...।' কথা শেষ করে আবার হাসল মিংকি।

জিগ্যেস করল, 'আইডিয়াটা দারুণ না?'

ভূতনাথ হেসে বললেন, 'হ্যাঁ—দারুণ।'

'আমি তা হলে চপলকেতু যাওয়ার প্রোগ্রামটা সবার সঙ্গে কথা বলে বানিয়ে নিচ্ছি। একটা এসি টাটা সুমো নিয়ে আমরা কলকাতা থেকে স্টার্ট দেব। স্টার্ট দেওয়ার কম সে কম দু-দিন আগে আপনাকে কনফার্ম করব, ঠিক আছে?...ও, হ্যাঁ—আর-একটা কথা।'

'কী কথা?'

'কাল কি পরশুর মধ্যে আমি মিস্টার রমাশঙ্কর দত্তকে নিয়ে আপনার বাড়িতে যাব—আপনার সঙ্গে ইনটোডিউস করিয়ে দেব। তা হলে আপনি ওঁর সঙ্গে সামনাসামনি সবকিছু স্ট্রেটকাট ডিসকাস করে নিতে পারবেন। তা ছাড়া স্পটে গিয়ে তো রেগুলার ডিসকাশন হবেই...।'

প্রিয়নাথ ছোট্ট করে 'হুঁ—' বললেন বটে কিন্তু ওঁর মনের মধ্যে আশঙ্কার দুলুনি শুরু হয়ে গিয়েছিল। অ্যানিমেশান আর স্পেশাল এফেক্ট এক জিনিস, আর আসল জিনিস তো আসল...।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'ওকে, মিংকি। তবে কীভাবে তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট এগোচ্ছে মাঝে-মাঝে ফোন-টোন করে জানিয়ো...।'

'অফ কোর্স জানাব...। তবে শুধু ফোন করে নয়—দেখা করেও জানাব...।'

মিংকির সঙ্গে কথা বলা শেষ করে প্রিয়নাথ ভাবতে বসলেন। হঠাৎ করে কেমন একটা ভ্যাপসা গরম টের পেলেন। হাত দিয়ে কপাল মুছলেন। একটা লম্বা শ্বাস ছেড়ে ভাবলেন, ভূত-শিকারের সরঞ্জামগুলো সব ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিতে হবে। তারপর দেখতে হবে চপলকেতুর চপল ছায়ার পিছনে সত্যি-সত্যি কোনও অলৌকিক ব্যাপার আছে কি নেই...।

## চার

যে-ছেলেটি গাড়ি চালাচ্ছিল তার নাম বিজয় রাধে। বেঁটে, কালো, চোখ-মুখ যেন বাটালি দিয়ে খোদাই করা, কোঁকড়া চুল, কপালে চন্দনের টিপ, আর হাতে একটা স্টিলের বালা। এমন দক্ষ হাতে ও টাটা সুমোটা চালাচ্ছিল যেন ও রাজা, আর গাড়িটা প্রজা। রাস্তার অন্যান্য গাড়িকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওর গাড়িটা মসৃণ আঁকাবাঁকা পথ ধরে ব্যালে নর্তকীর মতো সাবলীল ছন্দে বলতে গেলে একেবারে উড়ে যাচ্ছিল। শুধু চপলকেতুর কাছাকাছি আসার পর গাড়িটা এবড়োখেবড়ো ছন্দহীন রাস্তার মুখোমুখি হল, তাই গতি কমাল।

মিংকি বসেছে সামনের সিটে, বিজয় রাধের পাশে।

দ্বিতীয় সারিতে তৃষ্ণা, রমাশঙ্কর দত্ত, আর প্রিয়নাথ।

পিছনের কেবিনে ক্যামেরাম্যান বিনোদকুমার, আর ওর চারপাশে নানান ধরনের লাগেজের বোঁচকাবুঁচকি। তার মাঝে বসে ও কানে মোবাইলের ইয়ার প্লাগ গুঁজে গান শুনছে।

বেশি ঠান্ডা লাগছিল বলে মিংকি এ. সি.-টা একটু বন্ধ করতে বলেছিল। সেই সুযোগে জানলার কাচ নামিয়ে তৃষ্ণা আর মিংকির অনুমতি নিয়ে প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'মিংকি, একটা কথা তোমাদের কিন্তু আগেই বলে রাখি। ইন জেনারেল, ভূতরা কিন্তু একটু লাজুক নেচারের হয়। সহজে দেখা দিতে চায় না।'

পাশ থেকে রমাশঙ্কর মন্তব্য করলেন, 'আমাকে দেখলে তেনারা আবার একটু বেশি লাজুক হয়ে পড়তে পারেন...।'

প্রিয়নাথ পালটা খোঁচা দিয়ে বললেন, 'হুঁ। দেবতাদের দেখলে অপদেবতারা একটু বেশি ভয়-টয় পাবে এটাই তো ন্যাচারাল...।' কথা শেষ করে আড়চোখে রমাশঙ্করকে দেখলেন।

মানুষটা চোয়াল শক্ত করে সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখের চেহারা দেখে মনে হয় যেন ভূতের খোঁজে নয়, কোনও জঙ্গি লড়াইয়ে চলেছে।

রমাশঙ্করের লেখা চিঠিতে এই ভাবটা প্রিয়নাথ প্রথম খেয়াল করেছিলেন।

চপলকেতু রওনা হওয়ার আগে রমাশঙ্করকে নিয়ে প্রিয়নাথের বাড়িতে এসেছিল মিংকি। প্রথম পরিচয়ের পালাটা ও নিয়মমাফিক সেরে দিয়েছিল।

সেদিন আলাপ করে প্রিয়নাথের মানুষটাকে বেশ অভব্য এবং রুক্ষ মনে হয়েছিল।

প্রিয়নাথ ওঁকে জিগ্যেস করেছিলেন, 'আপনি ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করেন না?'

কপাল কুঁচকে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়েছিলেন রমাশঙ্কর : 'করলে কি আর ''রেনবো'' চ্যানেলকে ওই চিঠি লিখতাম?'

'ভগবানে বিশ্বাস করেন?'

রমাশঙ্কর বিরক্ত হওয়ার একটা শব্দ করে বললেন, 'ওঃ! আবার সেই বাপচা প্রশ্ন! শুনুন, মিস্টার জোয়ারদার...ভগবান হচ্ছে একটা কনসেপ্ট। সেটা বিশ্বাস কি অবিশ্বাসের প্রশ্নের আওতার বাইরে। কিন্তু ভূতটা কোনও কনসেপ্ট নয়—স্রেফ একটা কুসংস্কার। এটা ভাঙিয়ে আজকাল অনেকেই করে খাচ্ছে...।'

স্পষ্ট খোঁচা। প্রিয়নাথ এবং মিংকির প্রতি। কারণ, সরাসরি হোক বা ঘুরপথে হোক, প্রিয়নাথ আর মিংকি ভূত ভাঙিয়েই আয় করছে।

রমাশঙ্কর দত্ত শুধু যে রুক্ষ এবং অভব্য স্বভাবের তা-ই নয়, ওঁর কথাবার্তার ঢঙে বেশ সবজান্তা গোছের হামবড়া ভাবটাও মিশে আছে।

সেইজন্যই প্রিয়নাথ আর কথা বাড়াতে চাননি।

কিন্তু রমাশঙ্কর ওঁর ব্যাগ থেকে নানান কাগজপত্র বের করে ওঁর কুসংস্কারবিরোধী অভিযানের বহুমুখী সাফল্যের সাতকাহন শোনাতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

একটু পরেই প্রিয়নাথের মাথা ভোঁ-ভোঁ করতে শুরু করল। সম্ভবত মিংকিরও। রমাশঙ্করের কথা ঠিকঠাকভাবে ওদের দুজনের কানে ঢুকছিল না।

শেষদিকে প্রিয়নাথ শুনতে পেলেন : 'এই টিভি চ্যানেলগুলো সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়াশীল। এরা ব্যাবসার জন্যে যা খুশি তাই করতে পারে। তাই আমরা ''যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি''-র পক্ষ থেকে সবসময় ভাঁওতা আর বুজরুকির তীব্র প্রতিবাদ করি...।' একটু থেমে তারপর বললেন, '''রেনবো''-র প্রোগ্রামে শোনানো ওইসব শব্দ-টব্দ ভূতুড়ে বলে চালানো হলেও ওগুলো কোনও মতেই অথেনটিক নয়। আজকাল ওসব লোকঠকানো শব্দ ল্যাবরেটরিতে জুড়ে দেওয়া কোনও ব্যাপার নয়। তা হলে প্রোগ্রামটায় আর রইল কী!'

পরিস্থিতি হালকা করার জন্য প্রিয়নাথ তখন বলেছিলেন, 'তবে যাই বলুন, আপনার চিঠিটা কিন্তু আননেসেসারিলি অ্যাটাকিং মুডে লেখা। একটা অফিশিয়াল চিঠি...।'

প্রিয়নাথকে থামিয়ে রমাশঙ্কর উত্তর দিয়েছেন, 'মিস্টার জোয়ারদার, একটা কথা বলে রাখি। প্রোটেস্ট করতে হলে প্রোটেস্ট করার ভাষাটা জোরালো হওয়া দরকার—গলার আওয়াজ নয়। তা ছাড়া, আমার চিঠিতে গলার আওয়াজের কোনও ব্যাপার নেই। সেজন্যেই ভাষাটা একটু স্ট্রং দিয়েছি—।'

এ-কথায় মিংকি সামান্য হেসে ফেলেছিল। এতসব রুক্ষতা, অভব্যতা, সবজান্তাভাবের আড়ালে রমাশঙ্করের কথাবার্তায় কোথায় যেন একটা কমিক-কমিক ব্যাপার লুকিয়ে আছে।

পাশে বসা প্রতিবাদী মানুষটাকে লক্ষ করছিলেন প্রিয়নাথ।

বয়েস বেশি নয়—চুয়াল্লিশ কি পঁয়তাল্লিশ। বেশ ফরসা মোটাসোটা চেহারা। গালফোলা। চওড়া নাকের নীচে পুরু গোঁফ। কপালে সবসময় বিরক্তির ভাঁজ পড়ে আছে। চোখে চশমা। চশমার কাচের ভেতর দিয়েও বোঝা যায়, চোখের নজর বেশ চোখা।

'চপলকেতুর চপল ছায়া'-র একটা সিডি রমাশঙ্কর দত্তকেও দিয়েছিল মিংকি। সেটা দেখার পর ভদ্রলোক ঘুরিয়েফিরিয়ে মিংকিকে অনেক প্রশ্ন করেছেন। কিন্তু মিংকি ছোট-ছোট 'হুঁ-হাঁ' উত্তর দিয়ে বেশিরভাগটাই এড়িয়ে গেছে। শুধু একটা কথাই বারবার বলেছে, 'আমাদের প্রোগ্রামটা শুট করার মধ্যে কিন্তু কোনও হ্যাংকিপ্যাংকি নেই, মিস্টার দত্ত। আমাদের টিম কিন্তু খুব অনেস্ট অ্যান্ড জেনুইন...। আপনি ওখানে গেলেই সব বুঝতে পারবেন...।'

তারপরেও, গাড়িতে রওনা হওয়ার পর থেকে, মাঝে-মাঝেই, রমাশঙ্কর প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছিলেন। কখনও মিংকিকে, কখনও তৃষ্ণাকে, আবার কখনও-বা বিনোদকুমারকে। তখনও ওরা মোটামুটি এটাই জানিয়েছে যে, স্পটে গিয়ে এসব প্রশ্ন-উত্তর পর্ব আলোচনা করা যাবে।

পত্রলোচন সিংহ রায়ের বাড়ির কাছে যখন টাটা সুমো গিয়ে পৌঁছোল, তখন বিকেল প্রায় তিনটে। কারণ, পুলিশ, এমএলএ আর ডিএম-এর অফিসে গিয়ে ফরমালিটি সারতে বেশ কিছুটা সময় গেছে। এ ছাড়া বর্ধমানে গিয়ে একটা ভদ্রগোছের হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করতেও এক-দেড় ঘণ্টা সময় লেগে গেছে।

এটা ঠিক হয়েছে যে, মিংকি, তৃষ্ণা আর বিনোদকুমার হোটেলে থাকবে। প্রিয়নাথ সেই শুরু থেকেই জেদ ধরেছেন, তিনি পত্রলোচনদের আস্তানাতেই মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করবেন। সুতরাং, রমাশঙ্কর প্রিয়নাথকে একা তদন্ত করার সুযোগ দেওয়ার মতো মূর্খামি করেন কী করে! তিনিও চপলকেতুতেই থাকবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

মিংকির কাছ থেকে চপলকেতুর ম্যাপের একটা প্রিন্ট জোগাড় করেছিলেন প্রিয়নাথ। সেটা বের করে হাতে নিয়ে চলন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখছিলেন। তৃষ্ণা ছুটে যাওয়া জায়গাগুলোর পরিচয় দিচ্ছিল। ও যেহেতু এখানে আগে এসে ঘুরে গেছে, তাই গাইডের রোল প্লে করছিল। আর বিনোদকুমার চুপচাপ বসে ছিল, গুনগুন করে গান করছিল।

চপলকেতু জায়গাটা একেবারে গ্রামস্য গ্রাম। গাছপালা, পুকুর, খড়ের চালে ছাওয়া মাটির বাড়ি—কদাচিৎ খড়ের বদলে টিনের চাল, গোরুর গাড়ি, চাষের খেত—চারপাশে শুধু এসবই চোখে পড়ছিল।

কিন্তু সেই বিশেষ সীমানা পেরিয়ে যেই মাত্র 'ভৌতিক' এলাকায় গাড়িটা ঢুকে পড়ল অমনি চারপাশের ছবিটা কেমন যেন পালটে গেল।

এতক্ষণ যে গ্রামের ছবি দেখা যাচ্ছিল, সেটা পাল্টে গিয়ে ছন্নছাড়া পতিত জমি, খোলা মাঠ আর জঙ্গলের চেহারা নিল। তারই মধ্যে কোথাও-কোথাও ভাঙাচোরা বাতিল কুঁড়েঘর চোখে পড়ছিল, তাদের ঘিরে অসংখ্য গাছপালা আর আগাছার সংসার।

ডিভিডি-তে এসব দেখেছেন প্রিয়নাথ। কিন্তু বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে যেন একটা নতুন ধাক্কা টের পেলেন।

তৃষ্ণা প্রিয়নাথকে টুকটাক ইনপুট দিচ্ছিল। বলছিল, বছর সাত-আট আগেও এই হন্টেড এলাকায় কিছু লোকজন থাকত, চাষবাস করত। কিন্তু দু-চারজন মানুষ নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার পর তারাও ধীরে-ধীরে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে গেছে।

জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতে-দেখতে প্রিয়নাথের মনে হচ্ছিল, গোটা জায়গাটায় কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। গাছপালাগুলো যেন কোনও কিছু হওয়ার আশঙ্কায় চুপটি করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

দুটো বিশাল পুকুরের পাশ কাটিয়ে, একটা জীর্ণ মন্দির পেরিয়ে, তারপর ওঁরা যে-চীর্ণ-দীর্ণ বাড়িটায় গিয়ে পৌঁছোলেন, সেটাই পত্রলোচনের বাসা।

ইট-কাঠের দাঁত-মাড়ি বের করা ছিরিছাঁদহীন একটা দোতলা বাড়ি প্রকাণ্ড কচ্ছপের মতো থেবড়ে বসে আছে। বাড়িটার সর্বত্র ছালচামড়া উঠে গেছে। আর যে-কোনও ফাটল কিংবা ফাঁকফোকর থেকে যেমন খুশি বট-অশথের গাছ বেরিয়ে এসেছে।

বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড বড় রোয়াক। সেটা ফাটল ধরে একদিকে বেশ খানিকটা বসে গেছে। তারই মাঝামাঝি জায়গায় তিন ধাপ সিঁড়ি। তার দশাও একইরকম। সিঁড়ি বেয়ে উঠলে বাড়িতে ঢোকার দরজা। রোদে-জলে তার পাল্লার রং বলে আর কিছু নেই। চিড় ধরা পাল্লায় আপাদমস্তক শিরার দাগ প্রকট।

রকের লাগোয়া জমিটা এবড়োখেবড়ো। সেই জমিতে কয়েকটা বাঁশ পুঁতে নাইলনের দড়ি টাঙানো। দড়িতে কয়েকটা জামাকাপড়-শাড়ি শুকোতে দেওয়া রয়েছে। তার পাশে একটা পুরোনো দু-চাকার সাইকেল স্ট্যান্ডে তুলে দাঁড় করানো।

প্রিয়নাথের দৃশ্যগুলো চেনা লাগছিল। কারণ, ডিভিডি-তে চপলকেতুর এপিসোডটা তিনি বেশ কয়েকবার দেখেছেন। দেখেছেন পত্রলোচনকেও।

গাড়ির শব্দ পেয়ে পত্রলোচন বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তালঢ্যাঙা রোগা চেহারা। তৃষ্ণা আর বিনোদকুমারকে দেখে কাঠ-কাঠ হাসলেন। হাসিটা দেখে হালকাভাবে বোঝা গেল যে, টিভির পরদার পাবলিসিটি পত্রলোচনের তেমন পছন্দ নয়।

বিজয় সুমোর ভেতরেই বসে ছিল—নামেনি।

প্রিয়নাথদের পাঁচজনকে পত্রলোচন ভদ্রতা দেখিয়ে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বাড়ির ভেতরে আসতে বললেন।

বিনোদকুমার অনেকক্ষণ ধরেই ওর ভিডিয়ো ক্যামেরা চালু করে দিয়েছিল। এখন প্রিয়নাথদের দিকে ক্যামেরা তাক করে পত্রলোচনের বাড়িতে ঢোকার দৃশ্যটা ক্যামেরাবন্দি করতে লাগল।

বাইরের ঘরে সবাইকে বসিয়ে পত্রলোচন চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করতে অন্দরমহলের দিকে রওনা হচ্ছিলেন, কিন্তু রমাশঙ্কর দত্ত ওঁকে বাধা দিলেন। বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, মিস্টার সিংহ রায়...এখন চায়ের ব্যাপারটা থাক। আমরা তো এখানে কয়েকদিন থাকব—ফলে চা খাওয়ার অনেক সুযোগ পাওয়া যাবে। এখন বরং একটু জল খাওয়ান—তারপর কাজের কথা হোক...।'

কথাটা শেষ করেই প্রিয়নাথের দিকে তাকালেন রমাশঙ্কর। ভাবটা এমন যেন ওঁর লড়াইটা শুধু প্রিয়নাথের সঙ্গেই।

মিংকি বা তৃষ্ণা কিছু বলল না। আর বিনোদ দুবার কেশে নিয়ে ওর ক্যামেরা চালু করল।

পত্রলোচন জল আনতে চলে গেলেন। একটু পরেই জল ভরতি চারটে প্লাস্টিকের বোতল নিয়ে ফিরে এলেন।

রমাশঙ্কর বোতল নিয়ে জল খেলেন। 'আঃ—' বলে তৃপ্তির শব্দ করলেন।

পত্রলোচন বললেন, 'আমার টিউবওয়েলের জল...।'

বিনোদকুমারও জল খেল। তারপর ক্যামেরা নিয়ে কীসব খুটখাট করতে লাগল।

তৃষ্ণা পত্রলোচনের সঙ্গে প্রিয়নাথ, রমাশঙ্কর, আর মিংকির পরিচয় করিয়ে দিল।

প্রিয়নাথ ঘরটা দেখছিলেন। মাপে বেশ বড়। সিলিংটাও যথেষ্ট উঁচু। তবে দেওয়ালে পলেস্তারা কোথাও আছে, কোথাও নেই। কড়ি-বরগা লোহার হলেও জং ধরে বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

ঘরের একদিকের দেওয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো গোটা আষ্টেক ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ফটো। ছবিগুলো বিবর্ণ আর ফ্রেম রং চটা, ঘুণ ধরা। অস্পষ্ট হলেও এটুকু বোঝা যাচ্ছে ওগুলো মানুষের ছবি। হয়তো পত্রলোচনের পূর্বপুরুষদের।

ঘরে কেমন যেন একটা গন্ধ ঘুরপাক খাচ্ছিল। প্রিয়নাথের মনে হল, গন্ধটা ভেজা মাটি আর শ্যাওলার গন্ধ হলেও হতে পারে। ভেজা মাটি হয়তো কাছাকাছি কোথাও থাকতে পারে—কিন্তু শ্যাওলা এখানে কোথা থেকে আসবে? পুকুর তো অনেক দূরে!

মিংকি পত্রলোচনের সঙ্গে কথা বলছিল। কথায়-কথায় রমাশঙ্কর দত্ত আর প্রিয়নাথ জোয়ারদার কেন ওদের সঙ্গে এসেছেন সেটাও জানাল।

তখন পত্রলোচন প্রিয়নাথ আর রমাশঙ্করের দিকে একে-একে তাকিয়ে গদগদ গলায় বললেন, 'বলুন, স্যার—কী জানতে চান বলুন...।' তিনটে হাতপাখা মেঝেতে পড়ে ছিল। সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে প্রিয়নাথদের দিকে এগিয়ে দিলেন। সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, 'জানেনই তো, এখানে ইলেকট্রিক এখনও আসেনি। তাই পাখা বলতে এগুলো। আপনাদের...বেশ...কষ্ট হবে...।' তারপর পকেট থেকে একটা বিড়ির প্যাকেট বের করে তা থেকে একটা বিড়ি নিয়ে ধরালেন।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার ঘামছিলেন। হাত বাড়িয়ে একটা তালপাতার পাখা নিলেন। রমাশঙ্করও একটা নিলেন।

পত্রলোচনের হাতে বিড়ি দেখে প্রিয়নাথের গলা শুকিয়ে উঠল। আর থাকতে পারলেন না। মিংকি আর তৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে আবদারের গলায় বললেন, 'উইথ ইয়োর কাইন্ড পারমিশান...।' এবং একটা সিগারেট ধরালেন। ধরানোর পর মনে হল, গরমটা একটু কম লাগছে।

ওঁদের সামনে রাখা একটা জোড়াতালি দেওয়া সেন্টার টেবিলে একটা হাতল ভাঙা কাপ রাখা ছিল। সেটাকেই অ্যাশট্রে হিসেবে পত্রলোচন ব্যবহার করতে লাগলেন। প্রিয়নাথও গৃহকর্তাকে অনুসরণ করলেন।

'এখানে এইসব ভূত-টুতের ব্যাপারগুলো কবে থেকে শুরু হয়?' রমাশঙ্কর বেশ কায়দা করে চিবিয়ে-চিবিয়ে প্রশ্নটা পেশ করলেন। একইসঙ্গে হাতপাখা নেড়ে নিজেকে বাতাস করতে লাগলেন। ওঁর কপালে ঘামের বিন্দু জমছিল।

'সে আর কি অত সাল-তারিখ ধরে মনে আছে! আমি তো সেই জন্ম থেকেই দেখছি...।'

প্রিয়নাথের মনে পড়ল, মিংকিদের প্রোগ্রামেও ভদ্রলোক এই একই প্রশ্নের একই উত্তর দিয়েছেন।

মিংকি আর তৃষ্ণা একটা হাতপাখা শেয়ার করে গরম ম্যানেজ করছিল, আর একমনে পত্রলোচনের কথা শুনছিল।

'সবচেয়ে মেজর ভূতুড়ে ব্যাপারটা ঠিক কীরকম বলতে পারেন?'

পত্রলোচন সিংহ রায় একটা পুরোনো টুলের ওপরে বসেছিলেন। রমাশঙ্করের প্রশ্নে একটু নড়েচড়ে বসলেন। মুখটা দুবার খুললেন, বন্ধ করলেন। তারপর : 'সন্ধের মুখে বা রাতে কখনও-কখনও খুব পায়ের শব্দ শোনা যায়। হাঁটছে...দৌড়োচ্ছে...অনেক পায়ের শব্দ। কিন্তু কাউকে দেখা যায় না।'

রমাশঙ্কর তৃষ্ণার দিকে তাকালেন, বললেন, 'ম্যাডাম, প্রোগ্রামে তো ওরকম ছুটন্ত পায়ের শব্দ আপনারাও শুনিয়েছেন। সে-শব্দ কি সত্যিই হয়েছিল, নাকি সাউন্ড এফেক্ট জুড়ে দিয়েছিলেন?'

এই বাঁকা প্রশ্নে তৃষ্ণা, মিংকি, বিনোদকুমার—তিনজনেই একেবারে 'হাঁ-হাঁ' করে উঠল।

তাচ্ছিল্য করে এরকম খোঁচা দেওয়া মন্তব্য ভদ্রলোক আগেও করেছেন।

প্রিয়নাথ কোনও জবাব দিলেন না। একমাত্র সময়ই এর সঠিক জবাব দিতে পারবে। তাই তিনি শান্তভাবে বসে সিগারেটে টান দিতে লাগলেন। যদিও রমাশঙ্করের ব্যঙ্গ মেশানো ওস্তাদি ঢংটা ওঁর খুব একটা ভালো লাগছিল না। মনে হচ্ছিল, একটু রেস্ট নিতে পারলে ভালো হত।

পত্রলোচন রমাশঙ্করের দিকে তাকিয়ে একটু হেসে জিগ্যেস করলেন, 'দত্তসাহেব, আপনারা রাতে এখানে থাকবেন তো?'

'হাঁ—অবশ্যই। ব্যাপারটা তলিয়ে দেখতে হবে না? ভূতুড়ে ব্যাপারগুলো কীভাবে কোন কারসাজিতে হচ্ছে সেটার পরদাফাঁস করতে হবে না?' কথাগুলো বলার সময় রমাশঙ্কর বড় বেশি হাত-পা নাড়ছিলেন।

'খুব ভালো, খুব ভালো—' হাতে হাত কচলে বললেন পত্রলোচন, 'নিজের কানেই তা হলে সব শুনতে পাবেন। আর কম-বেশি দেখতেও পাবেন।' তৃষ্ণা আর বিনোদকুমারের দিকে আঙুল দেখালেন : 'ওঁরা তো হঠাৎ করে একবার মাত্র ওই আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন...।'

বিনোদকুমার বলল, 'হ্যাঁ—ব্যস একবার। তাও সাউন্ডটা হালকা ছিল।'

তৃষ্ণা তাতে সায় দিল।

প্রিয়নাথের মনে পড়ল, ডিভিডি-তে সেই রেকর্ডিংটা সত্যিই বড় আস্তে শোনা গেছে।

বাইরে বেলা পড়ে আসছিল। জোরে বাতাস দিচ্ছিল। সেই বাতাস খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়ছিল। তার সঙ্গে কেমন একটা মাটির গন্ধও যেন মিশে ছিল।

সিগারেট শেষ করে হাই তুললেন প্রিয়নাথ জোয়ারদার। তারপর পত্রলোচনকে জিগ্যেস করলেন, 'রাতে আমরা কোথায় থাকব, লোচনবাবু?'

হাসলেন পত্রলোচন : 'ভালো বলেছেন। লোচনবাবু। আমার নামটা একেই পিকিউলিয়ার, তার ওপরে বড্ড লম্বা—' একটা পা ভাঁজ করে গুটিয়ে বসলেন। হাতের বিড়িটা কাপে গুঁজে দিয়ে মাথা পিছনে হেলিয়ে দুবার চাড় দিলেন। তারপর : 'আমার মোট চারটে বাড়ি আছে। এটাতে আমি ফ্যামিলি নিয়ে থাকি। আর বাকি তিনটে বাড়ি একটু তফাতে। তার মধ্যে দুটো বাড়ি চানপুকুরের পাড় ঘেঁষে...।'

মিংকির ডিভিডি-তে চানপুকুরের কথা ছিল। বহুকাল আগে থেকেই ওই পুকুরটা স্নান করার কাজে ব্যবহার করা হত। সেই থেকেই 'চানপুকুর' নামটা ওই পুকুরের গায়ে লেগে গেছে।

'...তা আপনারা দূরে থাকবেন কেন? ইচ্ছে করলে এ-বাড়িতেই থাকতে পারেন। দেখছেনই তো, বাড়িটা হাতির মতো বড়। তিন মহলা বাড়ি। অসংখ্য ঘর। আমি ফ্যামিলি নিয়ে দোতলায় থাকি। একতলায় পেছনদিকে সার দিয়ে চার-চারটে ঘর আছে। এক কালে ছিল গেস্ট হাউস। পেছনদিকেই ঢোকা-বেরোনোর দরজা। আপনারা তার যে-কোনওটায় থাকতে পারেন—আমার কোনও প্রবলেম নেই।'

রমাশঙ্কর বললেন, 'আমার মনে হয় সেটাই ভালো।' প্রিয়নাথের দিকে ঘুরে : 'কী বলেন, মিস্টার জোয়ারদার?'

প্রিয়নাথ মনে-মনে ঠিক এই ব্যবস্থাটাই চাইছিলেন। পত্রলোচন অন্যরকম কিছু বললে তিনি হয়তো এই প্রস্তাবটাই দিতেন।

আবার হাই তুললেন প্রিয়নাথ। কেন যে এত ঘুম-ঘুম পাচ্ছে কে জানে! হাইয়ের রেশ টেনে বললেন, 'এখানে থাকাটাই ভালো...কাজের সুবিধে হবে।'

'তা হলে চলুন, স্যার। আপনাদের ঘরগুলো দেখিয়ে দিই। বাক্স-প্যাঁটরা নিয়ে আপনারা গুছিয়ে বসুন—।' কথা বলতে-বলতে পত্রলোচন উঠে দাঁড়ালেন।

প্রিয়নাথ মানুষটাকে দেখছিলেন।

প্রথমেই যেটা চোখে পড়ে সেটা লোকটার হাইট। এই ধরনের মানুষকে বোধহয় তালঢ্যাঙা বলা যায়। মনে পড়ছে, মিংকি পত্রলোচনের প্রসঙ্গে একটা অদ্ভুত মন্তব্য করেছিল। বলেছিল, 'লোকটা আননেসেসারি লম্বা।'

শুধু যে লম্বা তা নয়—বেশ রোগাও। গায়ের রং কালো, তেল চকচকে। চোখ দুটো বড়-বড়—তার কোণে স্থায়ীভাবে হাসির সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ে গেছে। চেহারা গ্রাম্য হলেও কোথায় যেন চড়া আত্মবিশ্বাসের তেজ লুকিয়ে রয়েছে। ফলে অতি-বিনয়ী ভাবটা পত্রলোচনের মুখোশ হলেও হতে পারে।

প্রিয়নাথ জলের বোতল তুলে নিয়ে আর-একবার জল খেলেন। মিংকিও ঢকঢক করে খানিকটা জল খেল। তারপর পত্রলোচনকে অনুসরণ করে সবাই বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল।

পত্রলোচন বললেন, 'গাড়িটা বাড়ির পেছনদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে গেলে আপনাদের মালপত্র নামাতে সুবিধে হবে...।'

সুতরাং প্রিয়নাথ আর রমাশঙ্কর টাটা সুমোয় উঠে পড়লেন। ওদের সঙ্গে মিংকিও উঠে পড়ল। আর পত্রলোচন সামনের সিটে বসে পড়লেন।

বিজয় গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বাড়ির পিছনদিকে রওনা হল।

বিনোদকুমার গুনগুন করে গান করছিল। গাড়িটা চলে যেতেই ও তৃষ্ণার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তৃষ্ণা, আমি সন্ধের পর এখানে থাকব না, আর শুট করতেও পারব না। শুধু দিনের আলোয় যা-যা অ্যাক্টিভিটি হবে সেগুলো টোটালি ক্যামেরায় নিয়ে নেব।'

বিনোদের স্বাস্থ্য ভালো। লম্বা-লম্বা চুল। পুরু গোঁফ। এক কানে দুল। সবমিলিয়ে বেশ রাফ অ্যান্ড টাফ চেহারা। কিন্তু বড্ড ভীতু। সেটা আগেরবারই তৃষ্ণা টের পেয়েছিল। সেবারও ওরা সূর্য ডোবার পর চপলকেতুতে থাকেনি। বর্ধমানে হোটেলে চলে গিয়েছিল। নেহাত সন্ধের মুখে ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ শোনা গিয়েছিল, তাই ওটা রেকর্ড করতে পেরেছিল। রাত নেমে গেলে আর সে-সুযোগ হত না।

'বিনোদ, তোমার কাজটাই এবার বেশি। নতুন কোনও ডেটা না পেলে আমার মাইক হাতে আর নতুন কী বলার আছে—।'

'আচ্ছা, এই প্রিয়নাথ—মানে, গাঞ্জা লোকটা গোস্ট বাস্টিং-এ এফিশিয়েন্ট তো?'

'কে জানে!' ঠোঁট ওলটাল তৃষ্ণা : 'মিংকি তো ওঁর ব্যাপারে খুব কনফিডেন্ট। বলছে যে, প্রিয়নাথ জোয়ারদার ভদ্রলোক নাকি ভূতের গন্ধ পায়।' মাথা ঝাঁকিয়ে তৃষ্ণা বলল, 'ওঃ, মিস্টার জোয়ারদার ভূতের স্মেল পেলে আমাদের চ্যানেলটা উটকো ঝামেলা থেকে বেঁচে যায়...।'

'আমরা তো আগেরবার শুধু দিনেরবেলাতেই শুট করেছিলাম। তাতে শুধু ওই রানিং ফিটের সাউন্ড রেকর্ড করতে পেরেছিলাম। মে বি, রাতে শুট করতে পারলে আরও থ্রিলিং কিছু মেটিরিয়াল পেতাম। শুধু সাউন্ড নয়—ভিশুয়ালসও পেতাম।'

তৃষ্ণা হাসল। ঠাট্টা করে বলল, 'তোমার নার্ভের যা অবস্থা তাতে রাতের থ্রিলিং ভিশুয়ালস পাওয়ার আশা ছাড়ো। কিন্তু ওই দুজনের সাহস আছে বলতে হবে। রাতে এখানেই থাকবে বলছে! দিনেরবেলার চেহারা দেখেই আমার কেমন-কেমন লাগছে তো রাতেরবেলা!'

'তোমার নার্ভও দেখছি আমার চেয়ে কিছু বেটার নয়...।' বিনোদকুমার হাসল। তারপর মোবাইলের ইয়ার প্লাগ কানে গুঁজে দিয়ে গান শুনতে লাগল।

সূর্য হেলে পড়েছে। পশ্চিম দিকটা কমলা রঙে ছেয়ে গেছে। চারপাশে কোনও শব্দ নেই। একজন মানুষও চোখে পড়ছে না। শুধু ছোট-বড় গাছ চুপচাপ দাঁড়িয়ে। তৃষ্ণার মনে হল গাছগুলো ওদের ওপরে নজর রাখছে।

টাটা সুমোটা ফিরে এল।

প্রিয়নাথ, রমাশঙ্কর আর পত্রলোচন গাড়ি থেকে নেমে এলেন। মিংকিও নামল।

তৃষ্ণা আর বিনোদ গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিল। আর দেরি করা ঠিক হবে না। একটু পরেই সূর্য ডুবে যাবে। তারপর কী-কী হবে কে জানে!

হঠাৎই তৃষ্ণা খেয়াল করল প্রিয়নাথ মিংকিকে বলছেন, 'না, মিংকি, এটা হয় না। খুব রিস্কি হয়ে যাবে। একটা রাত আমরা দেখে নিই—তারপর যদি সেফ মনে করি তখন দেখা যাবে...।'

'না, ভূতনাথদা—' মাথা ঝাঁকাল মিংকি : 'আপনারা সেফ থাকলে আমিও সেফ থাকব। আমি অ্যাডভেঞ্চারের এতবড় স্কোপটা মিস করতে চাই না। প্লিজ, আপনারা আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আচ্ছা, আমি প্রমিস করছি, যদি আজ রাতে সেরকম কিছু হয় তা হলে কাল থেকে আমি তৃষ্ণাদের সঙ্গে হোটেলেই থাকব। ওকে?'

তৃষ্ণা প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'মিংকি, আর যু ক্রেজি?'

হাসল মিংকি। বলল, 'ডোন্ট উয়ারি, তৃষ্ণা। আমি শুধু ফার্স্টহ্যান্ড দেখতে চাই যে, আমাদের চ্যানেল জেনুইন আর অনেস্ট। সো, আমি এখানে থাকছি—ব্যস।'

রমাশঙ্কর হেসে বললেন, 'আপনার কোনও ভয় নেই, মিস তেওয়ারি— এখানে সুপারন্যাচারাল বলে কিছু নেই। কারণ, সুপারন্যাচারাল বলে কিছু হয় না। ওগুলো মানুষের কল্পনা...।'

রমাশঙ্করের কথা শেষ হওয়ার আগেই শব্দটা শোনা গেল।

অনেকগুলো পা একসঙ্গে দৌড়োচ্ছে। পত্রলোচনের বাড়িটাকে ঘিরে দৌড়োচ্ছে। কখনও বাড়ির ভেতরদিকে চলে যাচ্ছে, কখনও বাড়ির দিক থেকে বেরিয়ে ছুটে যাচ্ছে দূরের গাছপালা আর আগাছা ভরা পতিত জমির দিকে।

বিনোদকুমার আর তৃষ্ণা চট করে গাড়িতে উঠে পড়ল। দড়াম করে দরজা বন্ধ করল।

বিনোদের কানে ইয়ারপ্লাগ গোঁজা ছিল। তাই শব্দ-টব্দ যে ও খুব একটা শুনতে পেয়েছিল তা নয়। কিন্তু এই অলৌকিক ছোটাছুটির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাটিতে কাঁপন জাগছিল। সেটা বিনোদ স্পষ্ট টের পেয়েছিল।

বিজয় রাধে মিংকির দিকে উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে গাড়ি ছেড়ে দেওয়ার অনুমতির জন্য অপেক্ষা করছিল।

মিংকি ওকে ইশারায় চলে যেতে বলল। বিজয় এমনভাবে গাড়িটা ছোটাল যেন ও ফরমুলা ওয়ান-এ নাম দিয়েছে।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে মিংকি বিজয়কে ওর মোবাইলে ফোন করল।

বিজয় ফোন ধরতেই বলল, কাল সকাল সাড়ে ন'টায় ও যেন বিনোদকুমার আর তৃষ্ণাকে নিয়ে পত্রলোচনবাবুর এখানে চলে আসে।

বাতাসের ঝাপটা শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। বিনা মেঘে যেন ঝড় উঠল। গাছপালার পাতায়-পাতায় খসখস শব্দ শুরু হল। আশ্চর্যভাবে গাছের সবুজ পাতাও খসে পড়তে লাগল মাটিতে। তারপর মাটিতে পড়ে থাকা শুকনো পাতা আর খড়কুটোর সঙ্গে সবুজ পাতাগুলোও ঘূর্ণি বাতাসে ঘুরপাক খেতে লাগল। প্রিয়নাথদের চোখে-মুখে এসে আছড়ে পড়তে লাগল।

মিংকি মোবাইল ফোন বের করে দৃশ্যটার ছবি তুলতে লাগল।

প্রিয়নাথ ঘটনাটা শুধু দেখছিলেন এবং শুনছিলেন না—অনুভব করতেও চাইছিলেন। মিংকির ডিভিডি-তে ঝড় ওঠেনি, মাটি কাঁপার কথাও বলা হয়নি।

সন্ধে হয়ে আসছে। আকাশে মলিন কমলা আর লাল রং। তারই মাঝে-মাঝে গাঢ় ছাই রঙের মেঘের তুলির রেখা। বাসায় ফেরা কোনও পাখির দেখা নেই আকাশে।

প্রিয়নাথের পায়ের নীচে জমি কাঁপছিল। আর অসংখ্য অদৃশ্য পায়ের ছোটাছুটি তখনও চলছিল।

মিংকি চোখ বড়-বড় করে জিগ্যেস করল, 'প্রিয়নাথদা, কী ব্যাপার?'

প্রিয়নাথ ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারায় ওকে চুপ করে থাকতে বললেন।

কিন্তু রমাশঙ্কর দত্ত হেসে উঠলেন। হাসিটা কাঠ-কাঠ এবং বোকার মতো শোনাল। তারপর যে-কথাটা বললেন সেটা বোকা-বোকা শোনাবে জেনেও বলে ফেললেন, 'ভূমিকম্প হচ্ছে—ভূমিকম্প। হালকা। সাইজ-মোগ্রাফ থাকলে বোঝা যেত...।'

মিংকি অবাক হয়ে বলল, 'ভূমিকম্প! শুধু এই জায়গাটায়?'

'হয়তো অন্য জায়গাতেও হচ্ছে—আমরা সেটা জানব কী করে! জানেন, বছরে মোট দশ লাখেরও বেশি আর্থকোয়েক হয়!'

পত্রলোচন চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার প্রায় ফিশফিশ করে বললেন, 'এখানে তো আকছারই এরকম ভূমিকম্প হচ্ছে।' কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর : 'চলুন, স্যার, ভেতরে চলুন। আঁধার হয়ে আসছে—বাইরে থাকার আর দরকার নেই।'

পত্রলোচনের সঙ্গে ওরা তিনজন বাড়ির ভেতরে ঢুকে এলেন। তখনও ছোটাছুটির শব্দটা আবছাভাবে শোনা যাচ্ছিল।

মিংকি পত্রলোচনকে জিগ্যেস করল, 'এসব যে উলটোপালটা ব্যাপার হয় তাতে এখানে থাকতে আপনার ভয় করে না?'

মলিন হাসলেন পত্রলোচন : 'ওসব গা সওয়া হয়ে গেছে, দিদিভাই—।'

ঘরে টেবিলের ওপরে দুটো হ্যারিকেন জ্বলছিল। নিশ্চয়ই ওঁর স্ত্রী কিংবা ছেলে এক ফাঁকে এসে জ্বেলে দিয়ে গেছে।

এখনও পর্যন্ত ওদের দেখা পাননি এ-কথা ভেবে প্রিয়নাথের একটু অবাক লাগছিল।

## পাঁচ

বাড়ির পিছনদিকে তিনটে ঘরে প্রিয়নাথরা আস্তানা গেড়েছেন। পাশাপাশি দুটো ঘরে মিংকি আর প্রিয়নাথ। তারপর একটা ঘর বাদ দিয়ে রমাশঙ্কর।

আজ রাতের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা পত্রলোচন নিজের ভাঁড়ার থেকেই করেছেন। মিংকি চ্যানেলের তরফ থেকে খরচ বাবদ ওঁকে দু-হাজার টাকা দিয়েছে। পত্রলোচন কিছুতেই টাকা নিতে চাননি। বলেছেন, ওঁর শরীরে বারো ভুঁইয়ার রক্ত। কী করে তিনি টাকা নেবেন!

অনেক জেদাজেদি করে তারপর মিংকি ওঁকে টাকা দিতে পেরেছে।

তিনজনের ঘরেই দুটো করে হ্যারিকেন আর মোমবাতি দিয়ে গেছেন পত্রলোচন। তার সঙ্গে একটা করে হাতপাখা। ইলেকট্রিসিটি নেই বলে বারবার দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাতে প্রিয়নাথরা বলেছেন যে, চপলকেতুর এপিসোডটা দেখে ওঁরা আগে থেকেই এ-খবরটা জানতেন। সুতরাং ওঁর অস্বস্তির কোনও কারণ নেই।

প্রিয়নাথ ওঁর ঘরে মেঝেতে বসে ছিলেন। গায়ে গাঢ় বাদামি রঙের হাতকাটা পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। সামনে একটা সুটকেস। তার ডালা খোলা। হ্যারিকেনের আলোয় সুটকেসের ভেতরের জিনিসগুলো দেখা যাচ্ছিল। ভূতশিকারির 'অস্ত্রশস্ত্র'।

ঘরের দেওয়ালে একটা ছায়া দেখতে পেয়ে চমকে মুখ ফেরালেন ভূতনাথ।

মিংকি এসে ঘরে ঢুকেছে। ওর পরনে জিনস আর টি-শার্ট। হাতে একটা টর্চ। হ্যারিকেনের আলোয় দেওয়ালে ওর বেঢপ ছায়া পড়ছে।

'কী? একা-একা ভয় করছে নাকি?' প্রিয়নাথ মজার সুরে জিগ্যেস করলেন।

'জানেন, আমার মোবাইলে কোনও টাওয়ার পাচ্ছি না! অথচ বিকেলবেলায় ছিল! বাড়িতে একটা ফোন লাগাতে গিয়ে দেখি টাওয়ার গন...!'

'আমারও একই অবস্থা।...আরও দু-একদিন না দেখে ঠিক বোঝা যাবে না এর রিজনটা সাইবারস্পেসের সমস্যা, না চপলকেতুর সমস্যা...।'

মিংকি কিছুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে রইল ভূতনাথের দিকে। ওর মুখে দিশেহারা ভাব।

তারপর সটান এসে বসে পড়ল প্রিয়নাথের পাশে। বলল, 'সত্যি, আপনি আছেন বলে ভয় করছে না—নইলে করত। এসব কী?' খোলা সুটকেসের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিগ্যেস করল।

'এগুলো ভূত খোঁজার কাজে লাগে...।'

মিংকি সুটকেসের সরঞ্জামগুলো দেখছিল। প্যাড, পেনসিল, একটা ছোট টেপরেকর্ডার, চার ব্যাটারির তেজি টর্চ, আর একটা ছোট টর্চ, ভিডিয়ো ক্যামেরা, ডিজিটাল ক্যামেরা, নানান মাপের অনেকগুলো ব্যাটারি, পোস্ট-ইট নোটের ছোট প্যাড, দরজিরা যে ব্যবহার করে সেরকম রঙিন মার্কার, নরম মোম, টেপ-মেজার, সুতোর গুলি, কাঁচি, হাফডজন মোমবাতি, থার্মোমিটার আর ম্যাগনেটিক কম্পাস।

এগুলোর ব্যবহার সম্পর্কে মিংকি কিছু-কিছু খবর জানে। কারণ, ওদের চ্যানেলে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় ভূতনাথ ভূতশিকারির কাজকর্ম সম্পর্কে বেশ কিছু কথা ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন।

যেমন, ভূতদের চরিত্র সম্পর্কে বলেছিলেন, '...ভূত-প্রেতরা হচ্ছে অনেকটা আমাদের পুলিশের মতো। দরকারের সময় দেখা দেয় না। মানে, যখন তুমি সাংঘাতিকভাবে কোমর বেঁধে ভূতের খোঁজ করছ, তখন তার দেখা পাবে না। আর যখন তুমি ভূতের দেখা পাওয়া যাবে বলে ভাবছই না, তখন তারা হঠাৎ করে হাজির হয়ে তোমাকে একেবারে চমকে দেবে। তাই সবসময় তৈরি থাকতে হয়...।'

'ভূতনাথদা, ছোটাছুটির আওয়াজগুলো কীসের? কিছু আইডিয়া করতে পারলেন?' মিংকি চাপা গলায় জানতে চাইল।

'না, এখনও বুঝতে পারিনি। ব্যাপারটা কি জেনুইন, নাকি পত্রলোচনের লোকঠকানো ম্যাজিক—সেটা নিয়েও ভাবছি। তা ছাড়া আমাদের ডেকে নিয়ে এসে এরকম ভূতুড়ে ম্যাজিক দেখিয়ে ওঁর কী লাভ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবলেন ভূতনাথ। তারপর মিংকিকে জিগ্যেস করলেন, 'আচ্ছা, তোমরা কী করে এই ভূতুড়ে স্পটটার খোঁজ পেলে বলো তো? পত্রলোচন সিংহ রায় কি নিজে তোমাদের চ্যানেলের সঙ্গে কনট্যাক্ট করেছিলেন?'

'না, না—' মাথা নাড়ল মিংকি : 'উনি কোনও কনট্যাক্ট করেননি। আমরাই এই হন্টেড স্পটটার খোঁজ পেয়েছিলাম। আমাদের চ্যানেলের স্ক্রিপ্ট সুপারভাইজার অলোকদা—অলোক সান্যাল—উনিই আমাকে জায়গাটার খোঁজ দিয়েছিলেন। ওঁর কোন এক রিলেটিভ নাকি শিবাইচণ্ডীর কাছাকাছি কোথায় থাকেন। তাঁর কাছ থেকে অলকদা এখানকার হন্টিং-এর খবরটা পান...।'

ঠোঁট কামড়ালেন প্রিয়নাথ : 'তা হলে তো পত্রলোচনকে সন্দেহ করা যাবে না। তা ছাড়া এসব ম্যাজিক-ফ্যাজিক দেখিয়ে ওঁরই বা কী বেনিফিট? তোমরা কি ওঁকে কোনও টাকাপয়সা দিয়েছ নাকি?'

'এক পয়সাও দিইনি।' জোর গলায় বলল মিংকি, 'শুরু-শুরু সে ভদ্রলোক শুট করার ব্যাপারে বেশ ভালোরকম আপত্তি করেছিলেন। অনেক তোয়াজ করে ওঁকে রাজি করানো হয়েছে। আফটার দ্যাট তৃষ্ণা আর বিনোদের সঙ্গে ওঁর খুব হার্টি রিলেশান হয়ে যায়। ওভারঅল মানুষটা খারাপ না। শুট করার পর বিনোদরা টাকা অফার করেছিল কিন্তু উনি নেননি। দেখলেন না, আমি যে দু-হাজার টাকা এক্সপেন্সের জন্যে দিচ্ছিলাম সেটাও প্রথমে নিচ্ছিলেন না—।'

'হুঁ—।' আনমনাভাবে বললেন প্রিয়নাথ।

টর্চ আর ডিজিটাল ক্যামেরা হাতে নিলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন।

'চলো, একটু বাইরে যাই—।'

প্রিয়নাথ আর মিংকি বাইরের দিকে পা বাড়াল।

মিংকি বলল, 'মিস্টার দত্ত একবার আমার রুমে এসেছিলেন। ওই দৌড়োদৌড়ির সাউন্ডটাকে আর্থকোয়েকের টেমরের সাউন্ড বলে আর-একবার বুঝিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক বলে কী, সবকিছুরই একটা সায়েন্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশান আছে। যখন আমরা সেই এক্সপ্ল্যানেশানটা খুঁজে পাই না, তখন সেই ঘটনার গায়ে ''ভৌতিক'' লেবেল সাঁটিয়ে দিই...।'

প্রিয়নাথ ছোট্ট করে হাসলেন। পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে ধরালেন।

কথা বলতে-বলতে ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল।

ওদের চোখের সামনে ঘোলাটে অন্ধকার। পিছনে বাড়িটা একটুকরো পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে।

সিগারেটের আগুনের আভায় প্রিয়নাথের আবছা প্রোফাইল দেখা যাচ্ছিল।

মিংকি জিগ্যেস করল, 'মিস্টার সিনহা রয়ের ওয়াইফ আর সানের ব্যাপারটা কিন্তু বেশ মিস্টিরিয়াস। আমরা সেই বিকেল তিনটেয় এসেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত ওদের একবারও দেখলাম না...।'

'হয়তো ওরা অসুস্থ...বেডরিডন...কে জানে!' সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন প্রিয়নাথ।

'না, ভূতনাথদা—শুধু এবারে নয়, লাস্ট টাইম বিনোদ, তৃষ্ণা, আরও সবাই...ওরা যখন তিনদিন ধরে কাজ করেছিল তখনও পত্রলোচনের ওয়াইফ আর সানকে দেখতে পায়নি!'

'ঠিক আছে—কাল সকালে ওঁকে জিগ্যেস করে দেখব...।'

সময়টা বর্ষা থেকে শরতের দিকে ঢুকে পড়ছে। তাই গরম সেরকম নেই। আর হাওয়া বইছে এলোমেলোভাবে। ভেজা মাটির গন্ধ আর কিছুটা গাছ-পাতা কিংবা শ্যাওলার গন্ধ প্রিয়নাথের নাকে আসছিল।

সিগারেটে আমেজের টান দিতে-দিতে কী মনে হওয়ায় পকেট থেকে টর্চটা বের করে নিলেন। সামনের গাছপালা আর মাঠের দিকে তাক করে টর্চ জ্বাললেন। যতটুকু দেখা গেল সবটাই নিরীহ দৃশ্য : গাছের গুঁড়ি, ফাঁকা মাঠ, আর অন্ধকার।

মাটির দিকে টর্চের আলো ফেললেন প্রিয়নাথ। সাধারণ ঘাস-মাটির জমি। সেখানে কোনও ফাটল চোখে পড়ল না।

কয়েকটা পাখি-টাখি উড়ে যাওয়ার ডানা ঝাপটানোর শব্দ পেলেন। কিন্তু ওপরে চোখ তুলে কোনও উড়ন্ত ছায়া দেখতে পেলেন না। শুধু আকাশের মলিন চাঁদের সঙ্গে চোখাচোখি হল।

এইরকম অজ গাঁয়ে রাতে ঝিঁঝির ডাক শুনতে পাওয়াটা বলতে গেলে স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু প্রিয়নাথ খেয়াল করলেন, ঝিঁঝির ডাক এক কণাও শোনা যাচ্ছে না।

চারপাশটা এত নিস্তব্ধ, এত ফাঁকা যে, প্রিয়নাথের কেমন একা-একা লাগছিল।

হঠাৎই পিছনে পায়ের শব্দ পেয়ে তাকালেন।

রমাশঙ্কর দত্ত। টর্চ জ্বেলে প্রিয়নাথদের দিকেই আসছেন।

'কী, মিস্টার জোয়ারদার, আর কিছু পেলেন?'

প্রিয়নাথ মাথা নাড়লেন, তারপর বললেন, 'না—।'

'ওই যে সন্ধের মুখে শব্দটা আমরা শুনলাম, সেটা আর্থকোয়েকের টেমর। ন্যাচারাল ফেনোমেনন—সুপারন্যাচারাল কিছু নয়। একটু আগে মিস তেওয়ারিকে আমি বলছিলাম...।'

কথা বলতে-বলতে প্রিয়নাথদের কাছে এসে দাঁড়ালেন।

ঠিক তখনই দূরে কী একটা যেন প্রিয়নাথের নজরে পড়ল। তিনি গভীর মনোযোগে সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। রমাশঙ্করের কথার কোনও জবাব দিলেন না।

প্রিয়নাথকে চুপ করে থাকতে দেখে মিংকি ওঁর দিকে তাকাল। তারপর ওঁর নজর অনুসরণ করে দূরে।

বহুদূরে একটা সাদা মেঘের পিণ্ড চোখে পড়ছে। মাটির খুব কাছাকাছি। মাটি থেকে বড়জোর পাঁচ-ছ'হাত ওপরে। খুব ধীরে-ধীরে ভেসে আসছে প্রিয়নাথদের দিকে। আর যত কাছে আসছে তত মাপে বাড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে।

'ভূতনাথদা, ওটা কী?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না। মেঘ বা কুয়াশার মতো মনে হচ্ছে...।'

'এরকম সময়ে ফগ তো ইম্পসিবল! আর মেঘ এত নীচে নেমে আসবে কেমন করে?' মিংকি অবাক হয়ে বলল।

রমাশঙ্কর গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন, 'ওটা মেঘ নয়, কুয়াশাও নয়। ওটা হল ধোঁয়া। লোকাল লোকজন উনুন ধরিয়েছে...।'

প্রিয়নাথ রমাশঙ্করের দিকে ঘুরে তাকালেন। সত্যি, চটজলদি ব্যাখ্যার জোগান দিতে রমাশঙ্করের জবাব নেই। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে টুকরোটা ছুড়ে ফেলে দিলেন। তারপর : 'এখানে লোকাল লোক কোথায়?'

'হয়তো আছে—আমাদের চোখে পড়েনি...।'

কুয়াশার পিণ্ডটা ক্রমশ এগিয়ে আসছিল, আর মাপে বাড়তে-বাড়তে অনেকটা এলাকা ছেয়ে গেল।

হঠাৎই বাতাসের উষ্ণতা কমতে লাগল। ওরা তিনজনই সেটা টের পেল।

প্রিয়নাথ বললেন, 'আমি একটু আসছি—।' বলে তাড়াতাড়ি ঘরের দিকে হাঁটা দিলেন।

মিংকি একটু ভয়ের গলায় রমাশঙ্করকে জিগ্যেস করল, 'এখনও কি বলবেন, লোকাল পাবলিক চুলা ধরিয়েছে?'

রমাশঙ্কর বুঝতে পারছিলেন যে, ওঁর যুক্তি তেমন একটা টেকসই জমি পাচ্ছে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজের জেদ আঁকড়ে রইলেন।

'হ্যাঁ, তাই বলব—অন্তত যতক্ষণ না আপনাদের কথার কংক্রিট প্রুফ পাচ্ছি। কাল দিনেরবেলা ওখানে গিয়ে জায়গাটা ইনস্পেক্ট করলেই সব বোঝা যাবে...।'

প্রিয়নাথ ফিরে এসেছিলেন। বাঁ-হাতে টর্চ জ্বেলে ডানহাতের একটা জিনিসের ওপরে ধরলেন।

মিংকিরা জিনিসটা দেখতে পেল : একটা লম্বা থার্মোমিটার—খুব চেনা ডাক্তারি থার্মোমিটারের মতো নয়।

মনোযোগ দিয়ে থার্মোমিটারের রিডিং দেখছিলেন প্রিয়নাথ। লক্ষ করলেন, ধীরে-ধীরে উষ্ণতা কমছে।

চোখ তুলে কুয়াশার পিণ্ডটার দিকে তাকালেন। ওটা আরও কাছে এগিয়ে এসেছে, মাপে আরও বড় হয়েছে।

রমাশঙ্কর ঝুঁকে পড়ে থার্মোমিটারের ওপরে নজর রেখেছিলেন। বিরক্তির একটা ছোট্ট শব্দ করে বললেন, 'আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনার কোনও জবাব নেই। যখন-তখন ইর‍্যাটিক্যালি বিহেভ করে। যেখানে আবহাওয়া দপ্তরই এসব ব্যাপার ঠিকঠাক এক্সপ্লেইন করতে পারে না, সেখানে আমরা কীভাবে এক্সপ্লেইন করব!'

এ-কথার কেউ কোনও জবাব দিল না।

প্রিয়নাথ থার্মোমিটার এক পকেটে রেখে অন্য পকেট থেকে একটা চৌম্বক কম্পাস বের করলেন। কম্পাসের ডায়ালে টর্চের আলো ফেললেন।

কম্পাসের কাঁটা এখন উত্তরদিকে মুখ করে নেই। খানিকটা পুবদিকে সরে গিয়ে এলোমেলোভাবে কাঁপছে, পাগলা ঘোড়ার মতো ছটফট করছে।

মিংকির হঠাৎই ভয়-ভয় করতে লাগল। আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এরকম অস্থির দশা কেন? আর টেম্পারেচার কমে যাওয়ারই বা মানে কী?

রমাশঙ্কর দত্ত প্রিয়নাথের কম্পাস ধরা হাতের ওপরে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ভদ্রলোক অদ্ভুত ধরনের ছিনে জোঁকের মতো প্রিয়নাথের সঙ্গে সেঁটে রয়েছেন। যখনই প্রিয়নাথ আপাতভাবে অলৌকিক কোনও ব্যাপারস্যাপারের মুখোমুখি হচ্ছেন তক্ষুনি রমাশঙ্কর তার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার জোগান দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন।

কম্পাসের কাঁটার গতিপ্রকৃতি কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ করার পর রমাশঙ্কর বললেন, 'পৃথিবীর চৌম্বক ধর্মের ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। পৃথিবী যে কেন একটা চুম্বক তার সঠিক কারণ বিজ্ঞানীরা এখনও জানে না—শুধু হাতড়ে বেড়াচ্ছে। একটা ডাইপোল থিয়োরি আছে বটে, তবে সেটা অনেকটা কানা মামার মতো। আসলে আর্থের ম্যাগনেটিক ফিল্ড হল একটা দুরন্ত বাচ্চা—কখন কীভাবে বিহেভ করবে তার কোনও ঠিকঠিকানা নেই। সেইজন্যেই কম্পাসের কাঁটাটা এরকম পাগলামো করছে, বুঝলেন?'

প্রিয়নাথ বেশ অবাক হয়ে রমাশঙ্করের মুখের দিকে তাকালেন। কিছু বললেন না। বোধহয় বলার মতো কিছু খুঁজে পেলেন না।

কুয়াশার পিণ্ডটা আরও এগিয়ে আসছিল। তার সঙ্গে টেম্পারেচার কমে যাওয়ার ব্যাপারটা এবার বেশ স্পষ্টভাবে অনুভব করা যাচ্ছিল।

প্রিয়নাথ লক্ষ করলেন, মিংকি কেমন ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে। তাই কম্পাস পকেটে রেখে রমাশঙ্করকে বললেন, 'চলুন, আমরা লোচনবাবুর ঘরে যাই। সেখানে গিয়ে একসঙ্গে বসে একটু গল্পগুজব করি...। তা হলে মনটা হালকা হবে। এখানে চারপাশে এত অন্ধকার...!'

প্রস্তাবটা রমাশঙ্কর এবং মিংকি দুজনেই একেবারে লুফে নিল।

সুতরাং, ওঁরা তিনজনে বেশ চটপটে পায়ে বাড়ির সামনের দিকে এগোতে শুরু করলেন। সবার আগে রমাশঙ্কর—ওঁর হাতে টর্চ জ্বলছে। তার ঠিক পিছনেই প্রিয়নাথ আর মিংকি। মিংকির হাতে একটা ছোট টর্চ ছিল, কিন্তু প্রিয়নাথ টর্চ জ্বেলেছেন বলে ও সেটা আর জ্বালেনি।

রমাশঙ্কর যে হাঁটতে-হাঁটতে দুবার ভেসে আসা কুয়াশার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছেন সেটা প্রিয়নাথের নজর এড়ায়নি। মিংকিদের প্রোগ্রামে এই কুয়াশার ছবি না দেখানো হলেও পত্রলোচন ওঁর ইন্টারভিউতে এটার কথা সংক্ষেপে বলেছেন।

প্রিয়নাথ ভাবছিলেন, পত্রলোচন ওঁর ইন্টারভিউতে এমনভাবে কথাবার্তা বলেছেন যে, সেসব কথা শোনার পর কোনও দর্শক চপলকেতুতে আসতে ভয় পাবে।

ব্যাপারটা প্রিয়নাথের একটু অদ্ভুত লেগেছিল। পত্রলোচনের জায়গায় যদি তিনি থাকতেন, তা হলে তিনি চাইতেন টিভিতে সবকিছু দেখার পর চপলকেতু গ্রামে মানুষজন আসুক, জায়গাটা জমজমাট হোক, তার ভূতুড়ে অভিশাপটা কেটে যাক। কারণ, তা হলে এই অভিশপ্ত এলাকায় চাষবাস হত, দোকানপাট তৈরি হত, জমির দাম বাড়ত—তাতে পত্রলোচন সিংহ রায়ের খারাপ না হয়ে বরং ভালোই হত।

ওঁরা সদর দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। আবহাওয়াতে আশ্চর্যভাবে হেমন্তের আমেজ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শীত-শীত বাতাসে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

রমাশঙ্কর চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন, 'লোচনবাবু! লোচনবাবু!'

ওঁর ডাক শুনে স্পষ্ট মনে হচ্ছিল, কারও তাড়া খেয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে উতলা হয়ে গেছেন।

মিংকি তাড়াহুড়ো করে একছুটে তিন ধাপ সিঁড়ি উঠে ভেজানো দরজায় ধাক্কা দিল।

দরজা সটান খুলে যেতেই ঘরের ভেতরের দৃশ্যটা প্রিয়নাথ দেখতে পেলেন।

মিংকিও যে দৃশ্যটা দেখেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই—কারণ, ও ছিল সবার আগে। বরং রমাশঙ্কর হয়তো দেখতে পাননি—কারণ, তিনি তখন সিঁড়ির ধাপ বেয়ে ওঠার কাজে মাথা ঝুঁকিয়ে ব্যস্ত ছিলেন।

দৃশ্যটা প্রিয়নাথের ভারী অদ্ভুত লাগল।

ঘরের প্রায় মাঝখানে দাঁড়িয়ে পত্রলোচন একজন ভদ্রমহিলা আর একজন যুবকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। দরজা খোলার শব্দ পেয়েই ভদ্রমহিলা এবং ছেলেটি শশব্যস্তভাবে চট করে অন্য একটা দরজা দিয়ে বাড়ির অন্দরে চলে গেল।

ঘরের ভেতরে বিকেলে দেখা টেবিলটার ওপরে একটা মোটাসোটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমের আলোয় 'আননেসেসারি লম্বা' পত্রলোচন সিংহ রায়ের আরও লম্বা ছায়া দেওয়ালে পড়েছে।

পত্রলোচন যাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন তাদের দুজনের চোখেই কালো রঙের সানগ্লাস—সাধারণত ছানি অপারেশানের পর যেরকম চশমা লোকে পরে থাকে।

এক ঝলক দেখে মহিলার যা বয়েস আন্দাজ করা গেল তাতে ছানি অপারেশান করানোটা তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়।

কিন্তু ছেলেটির বয়েস বড়জোর সাতাশ কি আটাশ। তার পক্ষে ছানি অপারেশানের ব্যাপারটা রীতিমতো অস্বাভাবিক।

এরা দুজনই যদি পত্রলোচন সিংহ রায়ের স্ত্রী এবং ছেলে হয় তা হলে একইসঙ্গে মা ও ছেলের ছানি অপারেশানের ব্যাপারটা শুধু যে অস্বাভাবিক তা নয়, বরং বেশ অদ্ভুত।

রমাশঙ্কর আর প্রিয়নাথ ঘরের ভেতরে ঢুকে পড়েছিলেন। প্রিয়নাথ দরজাটা তাড়াতাড়ি ভেজিয়ে দিলেন।

মিংকি রমাশঙ্করকে ডিঙিয়ে প্রিয়নাথের দিকে তাকাল। ওর চোখে অবাক ভাবটা লুকোনো নেই।

পত্রলোচন ওঁদের ভাবভঙ্গি দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে বললেন, 'হিমকুয়াশা। প্রকৃতির পাগলামো। একটু পরে নিজে থেকেই কেটে যাবে।'

মিংকি অন্দরে যাওয়ার খোলা দরজাটার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেটা লক্ষ করে পত্রলোচন বললেন, 'আমার ওয়াইফ আর ছেলের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ওরা ভীষণ মুখচোরা—অচেনা লোকজনের সামনে বেরোতে চায় না, কারও সঙ্গে কথা বলতে চায় না...।' তারপর ওঁর খেয়াল হল, প্রিয়নাথরা তখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাই সাততাড়াতাড়ি বললেন, 'আরে, আপনারা দাঁড়িয়ে কেন, স্যার, বসুন...।'

প্রিয়নাথ আর রমাশঙ্কর দুটো প্লাস্টিকের চেয়ারে বসলেন।

মিংকি বসল না। বরং হঠাৎই পত্রলোচনকে জিগ্যেস করল, 'আচ্ছা, মিস্টার সিনহা রয়, কিছু মনে করবেন না...মানে...।'

'কী, বলুন—।'

'আপনার ওয়াইফ আর ছেলের চোখে ডার্ক গ্লাসেস দেখলাম মনে হল...।'

'আপনি ঠিকই দেখেছেন, মিস তেওয়ারি...।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পত্রলোচন।

'ওঁদের কি ছানি অপারেশান হয়েছে?' আর দেরি না করে ভূতনাথ সরাসরি প্রশ্নটা করলেন।

'না—ক্যাটার‍্যাক্ট অপারেশান হয়নি। ওদের দুজনেরই চোখে একটা পিকিউলিয়ার অসুখ হয়েছে। একটুও আলো সহ্য করতে পারে না। তাই সবসময় সানগ্লাস পরে থাকে...।'

'কী অসুখ? গ্লকোমা?' এবার রমাশঙ্কর জিগ্যেস করলেন।

'ওই টাইপেরই কী একটা রেয়ার অসুখ। নামটা খুব খটোমটো। টিটমেন্ট চলছে...অল্প-অল্প ইমপ্রূভমেন্ট হচ্ছে। দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত পুরোটা সারে কি না...।'

কথা বলতে-বলতে পত্রলোচন প্রিয়নাথদের মুখোমুখি এসে বসলেন। মোমবাতির আলোয় একটা দেওয়ালে প্রিয়নাথের ছায়া পড়েছে। পত্রলোচন আর রমাশঙ্করের ছায়া পড়েছে অন্য দুটো দেওয়ালে।

ঘরের ঠান্ডা ভাবটা ক্রমশ কমে আসছিল। হয়তো বাইরের সেই অদ্ভুত কুয়াশা এখন ফিকে হয়ে গেছে।

মিংকিকে দেখে প্রিয়নাথের মনে হল, ওর একটু আগের ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেছে। ও দেওয়ালের পুরোনো ফটোগুলোর ওপরে টর্চের আলো ফেলে ওগুলো খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল।

প্রিয়নাথ হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। রাত সওয়া ন'টা।

তাই দেখে পত্রলোচন জিগ্যেস করলেন, 'রাতের খাওয়া কি এখন সেরে নেবেন? বলেন তো আপনাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দিয়ে আসি...।'

প্রিয়নাথ হেসে বললেন, 'আপনার এখানে এসে থেকে এমন সব ঘটনার সাক্ষী থাকছি যে, খাওয়াদাওয়ার চিন্তা মাথা থেকে উবে গেছে। এখন তো সবে সওয়া ন'টা বাজে—বরং দশটা নাগাদ খাওয়ার কথা ভাবা যাবে। তাতে আপনার কোনও প্রবলেম হবে না তো?'

'না, না, আমার আর প্রবলেম কীসের!'

প্রিয়নাথ একটা সিগারেট ধরালেন। মিংকির দিকে একবার তাকালেন। এখনও ও ফটোগুলোর সামনে ঘোরাঘুরি করছে।

প্রিয়নাথের মুখ থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। সেই ধোঁয়া দেওয়ালে অদ্ভুত ছায়া তৈরি করছিল।

রমাশঙ্কর পত্রলোচনকে জিগ্যেস করলেন, 'একটু আগে যে কুয়াশার ব্যাপারটা অবজার্ভ করলাম সেটা কি প্রায়ই হয়?'

কাশলেন পত্রলোচন। পকেট থেকে বিড়ি বের করে একটা ধরিয়ে ফেললেন। পরপর দুটো টান দেওয়ার পর বললেন, 'বহুদিন ধরে এমনটা হয়। প্রায়ই হয়। তবে কোনও নিয়ম-টিয়ম মেনে হয় না—।'

'বাঃ, তবে তো একরকম ন্যাচারাল ফেনোমেনন বলা যায়...।'

প্রিয়নাথ তেরছা চোখে রমাশঙ্করের মুখের দিকে একবার তাকালেন শুধু, কিছু বললেন না।

পত্রলোচন স্মৃতিচারণ করার সুরে বললেন, 'রাতেরবেলাতেই তো উলটোপালটা কাণ্ডকারখানাগুলোর বাড়বাড়ন্ত হয়। দিনে আর কতটুকু! ওই কুয়াশার ব্যাপারটা লোক-জানাজানি হওয়ার পর থেকেই সবাই বলতে থাকে, এ-অঞ্চলটায় কুনজর পড়েছে। তারপর একে-একে সব লোকজন ভিটে-মাটি খেত-জমি ছেড়ে চলে যেতে থাকে। তো আপনারা বলবেন আমি একা পরিবার নিয়ে এখানে মাটি আঁকড়ে পড়ে আছি কেন?' বিড়িতে দু-তিনবার ঘন-ঘন টান দিলেন। তারপর : 'আমি তো এখানকার জমিদার! এখানকার রাজা!

আমার শরীরে মুকুন্দ রায়ের রক্ত। আমি হার মেনে পালাই কেমন করে? রাজা কি কখনও প্রজার মতো আচরণ করতে পারে? কখখনও না!'

পত্রলোচনের গলার স্বর চড়ছিল। বড়-বড় চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছিল।

মিংকি ফটোর দিক থেকে নজর সরিয়ে পত্রলোচনের দিকে ফিরে তাকিয়েছিল।

নিজেকে সামলে নিয়ে তালঢ্যাঙা কালো মানুষটা বলল, 'ক'টা রাত এখানে থেকে দেখে যান। দিনেরবেলা কি অতকিছু দেখা যায়! তখন শোনা যায়, দেখা যায় না...।'

'এখানে আপনার থাকতে কোনও অসুবিধে হয় না?' প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন।

হাসলেন পত্রলোচন : 'ওই যে বললাম...গা সওয়া হয়ে গেছে...।'

ওঁর কথা শেষ হতে না হতেই পায়ের শব্দ শোনা গেল আবার। বেশ কয়েকজোড়া পা পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। ধপ-ধপ-ধপ-ধপ। সেই ছুটন্ত পায়ের আঘাতের দাপটে ঘরের মেঝে কাঁপছে।

মিংকি ভয়ের গলায় বলে উঠল, 'ওই...আবার!'

রমাশঙ্কর বললেন, 'আর্থকোয়েক! ভূমিকম্প!'

প্রিয়নাথ হাতের সিগারেটটা তাড়াতাড়ি টেবিলে রাখা হাতল ভাঙা কাপে গুঁজে দিয়ে পাঞ্জাবির পকেট থেকে কম্পাসটা বের করলেন। টর্চের আলো জ্বেলে কম্পাসের কাঁটার গতিপ্রকৃতি তীক্ষ্ন নজরে দেখতে লাগলেন।

একটু আগে যেমনটা হয়েছিল কাঁটা ঠিক তেমনই এলোমেলোভাবে থরথর করে কাঁপছে।

এটা কি অশরীরী প্রভাবের ইশারা?

কিন্তু রমাশঙ্কর কম্পাসের পাগলামো দেখেও তালির শব্দ করে হাত ঝাড়লেন। হেসে বললেন, 'আর্থকোয়েকের জন্যে আর্থের ভেতরের ডাইপোল নড়ছে...।'

পত্রলোচন ইতস্তত করে বললেন, 'আমি এসবের কোনও কারণ-টারন জানি না। শুধু এরকমটা মাঝে-মাঝে হয়, তাই জানি...।'

এমন সময় প্রিয়নাথ অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখতে পেলেন।

মোমের আলোয় যে-দেওয়ালটায় প্রিয়নাথের ছায়া পড়েছিল সেই দেওয়ালে কতকগুলো কালো ছায়া দিশেহারাভাবে চট করে ছুটে গেল।

সাদা পরদায় কালো সিলুয়েটের মতো ছায়াগুলো যেন কালো কার্ডবোর্ডের কাট আউট। ওরা বিদ্যুৎঝলকের মতো দেওয়ালের একদিক থেকে আর-একদিকে ছুটে চলে গেল। তার মধ্যে একটা ছায়ার যে মাথা নীচের দিকে, পা ওপরদিকে, সেটাও প্রিয়নাথ খেয়াল করলেন।

প্রিয়নাথ ভেবেছিলেন ব্যাপারটা আর কেউই লক্ষ করেনি।

কিন্তু ওঁর ধারণা যে ভুল সেটা বোঝা গেল মিংকি তেওয়ারির ভয়ংকর তীব্র চিৎকারে।

ওঁর চিৎকারটা কসাইয়ের চপারের কোপে মরণাপন্ন কোনও জন্তুর চিৎকারের মতো শোনাল। এ-চিৎকারে বুকের রক্ত পলকে হিম হয়ে যায়।

দেওয়ালের ছায়াগুলো একনিমেষেই উধাও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ওদের আবির্ভাবের অভিঘাত প্রিয়নাথের মনে বলতে গেলে সিলমোহরের স্থায়ী ছাপ বসিয়ে দিয়ে গেল।

প্রিয়নাথের মনে হল, চপলকেতুর অন্তরালে যা কিছু রহস্য লুকিয়ে আছে তার ওপর থেকে পরদার আড়াল একে-একে সরে যাওয়ার ব্যাপারটা শুরু হয়েছে।

মিংকি তেওয়ারি তখনও ভাঙা কর্কশ গলায় চিৎকার করে যাচ্ছিল।

## ছয়

মিংকির শরীরটা কুঁকড়ে গিয়েছিল। হাতের টর্চ শব্দ করে খসে পড়েছে মেঝেতে। হাত দুটো এখন মুঠো করে বুকের কাছে জড়ো করা। চোখগুলো বড়-বড় করে অভিশপ্ত দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে আছে। মুখটা

সামান্য হাঁ করা।

প্রিয়নাথ ঝট করে চেয়ার ঠেলে উঠে পড়লেন। ছুটে গেলেন মেয়েটার কাছে।

মিংকি প্রিয়নাথের হাত আঁকড়ে ধরল প্রাণপণে। তারপর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

প্রিয়নাথ ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন : 'কাম ডাউন। কাম ডাউন। এত আপসেট হওয়ার কিছু হয়নি। আমি তো আছি। কোনও ভয় নেই...।'

প্রিয়নাথের কথাগুলোয় সেরকম কাজ হচ্ছিল না। কারণ, মিংকির ফোঁপানি কমে এলেও থামেনি। ওর শরীরটা মাঝে-মাঝেই কেঁপে-কেঁপে উঠছিল।

মিংকিকে যত্ন করে ধরে নিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলেন ভূতনাথ। পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেও বসলেন। তারপর ওর মাথায় আশ্বাসের হাত বোলাতে-বোলাতে রমাশঙ্কর আর পত্রলোচনের মুখের ওপরে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

রমাশঙ্কর দত্ত এখনও মুখ খোলেননি। বোধহয় চটজলদি কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাননি।

আর মুকুন্দ রায়ের বংশধর, এ-অঞ্চলের রাজামশাই পত্রলোচন, পুরোপুরি নির্বিকার। শুধু মেঝেতে দাঁড় করানো একটা জলের বোতল তুলে নিয়ে এগিয়ে দিলেন প্রিয়নাথের দিকে : 'ম্যাডামকে একটু জল-টল খাওয়ান, স্যার...।'

প্রিয়নাথ ভুরু কুঁচকে তাকালেন পত্রলোচনের দিকে। বোধহয় বুঝতে চাইলেন, ওঁর 'ম্যাডাম' এবং 'স্যার' বলার মধ্যে ব্যঙ্গের কোনও ছোঁওয়া আছে কি না।

কিছুক্ষণ জরিপ করে মনে হল, না, নেই। তার কারণ, এইমাত্র যে-ঘটনাটা ঘটে গেছে সেটা ওঁর কাছে গা সওয়া এবং নিতান্তই মামুলি। রোজ ডাল-ভাত খাওয়ার মতন।

প্রিয়নাথের হাত থেকে বোতল নিয়ে মিংকি কয়েক ঢোঁক জল খেল। ও তখনও বড়-বড় শ্বাস টানছিল। প্রিয়নাথ বোতল থেকে সামান্য জল হাতের তালুতে ঢেলে নিলেন। তারপর ভয়-পাওয়া মেয়েটার মুখে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, 'মুখটা মুছে নাও, মিংকি...।'

মিংকি ভূতনাথের কথা শুনল, মুখ-টুখ মুছে একটু স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করল। পত্রলোচন আর রমাশঙ্করের দিকে সঙ্কোচের দৃষ্টিতে তাকাল।

রমাশঙ্কর এতক্ষণে আমতা-আমতা করে মুখ খুললেন, 'মিস্টার জোয়ারদার, ওই...ওই দেওয়ালটায় কয়েকটা ছায়া...মানে, শ্যাডো দেখা গেল না?'

প্রিয়নাথ কোনও জবাব দিলেন না—অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি বেশ বুঝতে পারছিলেন, যুক্তিবাদী মানুষটা আচমকা বেশ নাড়া খেয়ে গেছে। ওঁর প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ওঁকে সাহায্য করার কোনও দরকার নেই। রমাশঙ্কর ওই দেওয়ালে একটু আগে কী দেখেছেন তা ভালো করেই জানেন।

'ভূতনাথবাবু, ওই দেওয়ালটায় কতকগুলো শ্যাডো যেন...যেন ছুটে চলে গেল বলে মনে হল—।'

প্রিয়নাথ ব্যাপারটা দেখে তেমন ভয় পাননি, তবে বেশ অবাক হয়ে গেছেন। এইরকম 'দেখা' যাওয়ার কথা মিংকিরা ওদের টিভি প্রোগ্রামে মোটেই বলেনি।

তিনি রমাশঙ্করের দিকে স্থির চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ন্যাচারাল ফেনোমেনন। ওই দেওয়ালটা হচ্ছে সিনেমার পরদা—তার ওপরে ছায়াছবি দেখা গেল...।'

'ছায়া' শব্দটার ওপরে একটু জোর দিলেন প্রিয়নাথ। ওঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, রমাশঙ্করকে যথেষ্ট খোঁচা দিতে পেরেছেন বলে বেশ তৃপ্তি পেয়েছেন।

হঠাৎই ভূতনাথ সিরিয়াস হয়ে উঠলেন। চোখ সরু করে পত্রলোচনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'লোচনবাবু, আপনি কিছু বলুন—।'

'আমি আর কী বলব!' পত্রলোচন মলিন হাসলেন : 'বলবেন তো আপনারা! আপনারা অপ্রাকৃত অতিপ্রাকৃত ঘটনার খোঁজখবর করতে এসেছেন...। আমার তো এসব গা সওয়া...।'

ভূতনাথ উঠে দাঁড়ালেন। দেওয়ালে টাঙানো ফটোগুলোর কাছে গিয়ে টর্চের আলো ফেলে সেগুলো দেখতে লাগলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি দেওয়ালের ছায়ার ব্যাপারটা সম্পর্কে জোর করে উদাসীন থাকতে চাইছেন। অন্তত এখন।

মিংকির হাত থেকে খসে পড়া টর্চটা তুলে নিলেন। টর্চটা তখনও জ্বলছিল। দু-হাতে দুটো টর্চ নিয়ে ফটোগুলো বেশ খুঁটিয়ে পরখ করতে লাগলেন।

'এই ফটোগুলো কাদের?' পত্রলোচনের দিকে জিজ্ঞাসা ছুড়ে দিলেন ভূতনাথ।

পত্রলোচন একটা বিড়ি ধরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন : 'ওগুলো আমার বাপ-দাদাদের ফটো। কবেকার বাঁধানো—সেই খোকা বয়েস থেকে দেখে আসছি...।'

প্রিয়নাথ পাশের দেওয়ালটার দিকে তাকালেন। সেখানে এখন পত্রলোচনের লম্বা ছায়া পড়েছে।

টেবিলের দিকে হেঁটে আসতে-আসতে একটা টর্চ পকেটে ঢোকালেন। মিংকির টর্চটা টেবিলের ওপরে রেখে দিলেন। পকেট থেকে ডিজিটাল ক্যামেরা বের করলেন।

'অভিশপ্ত' দেওয়ালটার কাছে গিয়ে ওটার নানান জায়গা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন ভূতনাথ।

দেওয়ালটা পুরোনো। ড্যাম্প ধরা। চুন-বালির পলেস্তারা সময়ের চাপে জায়গায়-জায়গায় ঝরে পড়েছে। ফলে দেওয়ালটা কোথাও ফুলে-ফেঁপে উঠেছে, কোথাও বা বসে গেছে।

দেওয়ালটা ছুঁয়ে, হাত বুলিয়ে, পরীক্ষা করছিলেন। অসম্ভব ঠান্ডা। তবে সেটা ড্যাম্পের জন্যও হতে পারে। নাঃ, ওটা ঠান্ডা, পুরোনো এবং কুৎসিত হলেও সত্যিকারের দেওয়াল। কোনও কারচুপি নেই। সিনেমার পরদার মতো এ-দেওয়ালে উল্টোদিক থেকে কোনও ছায়া তৈরি করা অসম্ভব।

কয়েক পা পিছিয়ে এসে ভূতনাথ দেওয়ালটার ফটো তুলতে লাগলেন।

মিংকির দিকে আড়চোখে একবার তাকালেন। কেমন এক ভয়ের চোখে প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে আছে। ভূতশিকারি মানুষটার কর্মকাণ্ড দেখছে।

চোখের কোণ দিয়ে তিনি পত্রলোচনকেও লক্ষ করছিলেন। নির্বিকার মুখ। চুপচাপ বসে বিড়িতে টান দিচ্ছেন। তাকিয়ে আছেন মোমবাতির শিখার দিকে।

একটু আগে বলা ওঁর কথাগুলো মনে পড়ছিল : 'দিনেরবেলা কি অত কিছু দেখা যায়! তখন শোনা যায়, দেখা যায় না...।'

আর এখন? এই রাতে?

শোনাও যাচ্ছে, দেখাও যাচ্ছে।

মিংকিদের চ্যানেল রাতের কোনও ছবি দেখাতে পারেনি।

প্রিয়নাথের ফটো সেশন যখন চলছে তখন রমাশঙ্কর একটু ধাতস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। পকেট থেকে একটা ছোট্ট লাঠি আর একটা মাঝারি স্ক্রু ড্রাইভার বের করলেন। লাঠিটা অনেকটা কাঁসরঘণ্টা বাজানোর লাঠির মতো। ওঁর মুখের চেহারা দেখে মনে হল, ওঁর ভেতরকার যুক্তিবাদী সত্তা এতক্ষণে মাথাচাড়া দিয়েছে।

বেশ সতর্কভাবে পা ফেলে দেওয়ালটার দিকে এগোতে লাগলেন রমাশঙ্কর। ওঁকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। লাঠি ধরা হাতে চশমাটাকে বারবার ঠিক করছিলেন। চোখে-মুখে ঘামের ফোঁটা।

দেওয়ালটার কাছে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রিয়নাথের দিকে একবার তাকালেন। তারপর খাটো লাঠিটা ছুরির হাতল ধরার মতো মুঠো করে ধরে লাঠির ডগা দিয়ে দেওয়ালের নানান জায়গায় ঠুকে-ঠুকে দেখতে লাগলেন। মার্বেল পাথর বসানোর সময় মিস্ত্রিভাইরা যেভাবে লাঠি দিয়ে ঠুকে পাথর সেট করে।

প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন, 'কী দেখছেন, মিস্টার দত্ত?'

'দেখছি ওয়ালটা কোথাও ফাঁপা আছে কি না। ফাঁপা থাকলে সেখানে কোনও যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে কারচুপি করার স্কোপ পাওয়া যাবে...।'

পত্রলোচন ভাবলেশহীন মুখে প্রিয়নাথদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ওদের 'গোয়েন্দাগিরি' দেখছিলেন। হাতের বিড়িটা শেষ হয়ে যাওয়ায় টেবিলে রাখা হাতলভাঙা কাপে শেষ টুকরোটা গুঁজে দিলেন।

রমাশঙ্করের ঠোকাঠুকিতে দেওয়ালের চুন-বালির গুঁড়ো খসে পড়ছিল। আর তার সঙ্গে যে-শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল তাতে স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছিল যে, দেওয়ালটা সলিড।

প্রিয়নাথের ছবি তোলা শেষ হয়ে গিয়েছিল। পকেট থেকে ছোট কম্পাস বের করে তিনি রমাশঙ্করকে বললেন, 'এবার কাঁটা-কম্পাস দিয়ে একটু চেক করে দেখি। যদি দেওয়ালের ভেতরে লুকোনো যন্ত্রপাতি থাকে, যদি তার পার্টস লোহা অথবা ইস্পাতের হয়, তা হলে আমার এই কম্পাসের কাঁটা উত্তর-দক্ষিণে তাক করে থাকার বদলে কমবেশি ডিফ্লেক্টেড হবে। মিংকি—' মিংকির দিকে তাকালেন ভূতনাথ : 'এদিকে এসো না!...আমাকে একটু হেলপ করবে...।'

মিংকিকে সহজ এবং স্বাভাবিক করার জন্য ভূতনাথ ওকে এই অনুরোধ করলেন।

মিংকি 'শিয়োর' বলে ভূতনাথের দিকে এগিয়ে গেল। ওর মুখ থমথমে এবং গম্ভীর। হাসিখুশির 'চিহ্নগুলো' কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে।

রমাশঙ্কর ইতিমধ্যে লাঠি ঠোকাঠুকির পর্ব চুকিয়ে প্রিয়নাথের পাশে চলে এসেছেন এবং প্রিয়নাথের হাতের কম্পাসের ওপরে ঝুঁকে পড়েছেন।

দেওয়ালের প্রায় গা ঘেঁষে, খুব ধীরে-ধীরে, কম্পাসটাকে দেওয়ালের একদিক থেকে আর-এক দিকে নিয়ে গেলেন ভূতনাথ। ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে পা মেলালেন রমাশঙ্কর। আর মিংকি কম্পাসটা তাক করে টর্চ ধরে রাখল—যাতে এক সেকেন্ডের জন্যও কম্পাসটা দেখতে ভূতনাথের কোনও অসুবিধে না হয়।

এরকমভাবে বেশ কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করলেন। যেন দুটো ল্যাম্পপোস্টের মাঝে এদিক-ওদিক করে মাঞ্জা দিচ্ছেন।

কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। কম্পাসের কাঁটা একটিবারের জন্যও বেহিসেবি হেঁচকি তুলল না।

প্রিয়নাথের বিস্তৃত কপালে ভাঁজ পড়ল। তিনি আলতো গলায় রমাশঙ্কর দত্তকে বললেন, 'না, দেওয়ালের ভেতরে কিছু নেই। অন্তত কোনও মেশিনপত্তর নেই...।'

'তা হলে কী আছে?' রমাশঙ্কর বিভ্রান্তভাবে প্রশ্নটা করলেন।

'সুপারন্যাচারাল ফেনোমেনন...।'

বিশাল মাপের জীর্ণ ঘরটার ভেতরে মোমবাতির আলো আর অন্ধকার একটা অদ্ভুত চাপ তৈরি করছিল। অন্ধকার আনাচ-কানাচগুলোর দিকে তাকিয়ে মিংকির কেমন ভয়-ভয় করছিল। এই বুঝি গাঢ় অন্ধকারের ভেতর থেকে কিছু একটা বেরিয়ে আসবে। তারপর...।

'দেওয়ালটা যদি ঘষা কাচের তৈরি হত তা হলেও কিছু একটা ভাবার সুযোগ পাওয়া যেত। ঘষা কাচের ওপাশ থেকে প্রোজেক্টর ব্যবহার করে সিলুয়েট ইমেজ মানে, শ্যাডো—তৈরি করা সম্ভব।' চিবুকে আঙুল ঘষতে-ঘষতে মিংকি তেওয়ারিকে বলছিলেন ভূতনাথ, 'কিন্তু মিংকি, নাম্বার ওয়ান পয়েন্ট হচ্ছে, ওয়ালটা ঘষা কাচের তৈরি নয়। আর...নাম্বার টু হচ্ছে...প্রোজেকশানের মেশিনারি অপারেট করতে হলে ইলেকট্রিসিটি দরকার—যা এখানে নেই...।'

রমাশঙ্কর বেশ অপ্রস্তুতে পড়ে গেছেন। ওঁর জঙ্গি ভাবটা হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া বেলুনের মতো চুপসে গেছে। চপলকেতুতে এসে প্রথম রাতেই এরকম ধাক্কা খাবেন ভাবেননি। কিন্তু এত সহজে রমাশঙ্কর দত্ত হার মানতে রাজি নন। দেওয়ালের ছুটন্ত ছায়াগুলো যদি অলৌকিক ব্যাপারও হয়ে থাকে, তা হলেও তো তার একটা সম্ভব-অসম্ভব ব্যাখ্যা থাকবে!

লাঠি আর স্ক্রু ড্রাইভার পকেটে ঢোকালেন রমাশঙ্কর। তারপর পত্রলোচনের দিকে এগোলেন।

'পত্রলোচনবাবু—।'

পত্রলোচন একটা টুলে বসে দাঁত খুঁটছিলেন। রমাশঙ্করের ডাকে উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর দেওয়ালের ছায়াটা লম্বা হয়ে গেল।

'বলুন—।' ওঁর মুখে কোনও ভাবান্তর নেই। যেন ভূত-প্রেত এবং অলৌকিক ব্যাপারস্যাপারে চূড়ান্ত বৈরাগ্য এসে গেছে।

'ওই দেওয়ালটায়...' দেওয়ালটার দিকে আঙুল দেখালেন রমাশঙ্কর, 'একটু আগে যা দেখলাম তার কারণ-টারন কিছু বলতে পারেন?'

'কারণ?' পত্রলোচন যেন একটু অবাক হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রিয়নাথ, মিংকি এবং রমাশঙ্করের দিকে এক ঝলক করে তাকালেন : 'কারণ আমি কী করে বলব! যাঁরা ওসব ঘটান তাঁরাই জানেন। আমি এসব নিয়ে মাথাটাথা ঘামাই না। যখন যা কিছু হয়, হয়। প্রাকৃতিক ব্যাপারের মতো...।'

'প্রাকৃতিক ব্যাপারের মতো মানে?' প্রিয়নাথ অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন।

পত্রলোচন সামান্য শব্দ করে হাসলেন। শব্দটাই শোনা গেল শুধু। মুখটা ছায়ায় ঢাকা থাকায় হাসিটা দেখা গেল না।

আলতো গলায় বললেন, 'এই যে রোজ সূর্য ওঠে, তা নিয়ে কি আমরা মাথা ঘামাই? না। রোজ দেখতে-দেখতে ব্যাপারটা আমাদের সবার গা সওয়া হয়ে গেছে। ওটাকে আমরা প্রাকৃতিক ঘটনা বলে মেনে নিয়েছি। এই ধরুন চাঁদ যে ছোট-বড় হয়, সেটাও তো ন্যাচারাল ব্যাপার! ওটা দেখে আমরা অবাক হই না। তো এইসব কাণ্ডকারখানাও সেইরকম...। ন্যাচারাল ব্যাপার...।'

কথাগুলো বলে পত্রলোচন মোমবাতির দিকে ঘুরলেন : 'আপনারা একটু বসুন। জিরিয়ে নিন। রাত হয়েছে। আমি আপনাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করি—।'

প্রিয়নাথরা আবার ফিরে এলেন মোমবাতির কাছে। প্লাস্টিকের চেয়ারগুলোয় বসে পড়লেন।

মিংকি প্রিয়নাথের পাশে-পাশেই ছিল। বসলও প্রিয়নাথের পাশেই। তার পরই চাপা গলায় বলল, 'ঘরে বসে একা-একা খাওয়ার চেয়ে এখানেই আমরা একসঙ্গে বসে ডিনার সেরে নিতে পারি, কী বলেন?'

মিংকির দিকে তাকালেন। মেয়েটার আতঙ্ক এখনও কাটেনি। এই ভয়টাকে যেভাবে হোক লাগাম দিতে হবে। মুখে বললেন, 'সেটাই ভালো হবে। ঘরে-ঘরে খাওয়ার ব্যবস্থা মানে বাড়তি ঝঞ্ঝাট—।'

প্রিয়নাথ পত্রলোচনকে সে-কথাই বললেন।

পত্রলোচন মাথা নেড়ে বললেন, 'সেটাই ভালো হবে, স্যার। আমারও সুবিধে হবে।' তারপর সামান্য হেসে ইতস্ততভাবে যোগ করলেন, 'অতি সামান্য আয়োজন করতে পেরেছি। আলুভাজা, ডিমের ডালনা, আর গরম-গরম ভাত...।'

প্রিয়নাথ সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, 'যথেষ্ট, যথেষ্ট! এটাই আমাদের কাছে রাজভোগ।'

পত্রলোচন 'এখুনি আসছি, স্যার—' বলে অন্দরের দিকের দরজা খুলে চলে গেলেন।

পত্রলোচন চলে যেতেই রমাশঙ্কর প্রিয়নাথকে বললেন, 'আমার মাথাটা কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। এই সব পিকিউলিয়ার ঘটনা ওঁর কাছে ন্যাচারাল ব্যাপার! কী অদ্ভুত!'

প্রিয়নাথ হেসে বললেন, 'আপনার কাছেও তো তাই। ন্যাচারাল ফেনোমেনন।' তিনি বুঝতে পারছিলেন, রমাশঙ্করের যুক্তিবাদের জঙ্গিভাবটা ফিরে আসতে সময় লাগবে।

মিংকির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, ও 'সিনেমা' দেখানো দেওয়ালটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

রমাশঙ্কর বললেন, 'যা-ই বলুন, মিস্টার জোয়ারদার, লোচনবাবুর নির্বিকার ভাবটা কিন্তু বেশ বাড়াবাড়িরকম নির্বিকার। কোনও হেলদোল নেই। সেইজন্যেই মানুষটাকে আমার সন্দেহ হচ্ছে। হয়তো ও এমন কায়দা করে অবাক কাণ্ডগুলো ঘটিয়েছে যে...।'

রমাশঙ্কর চুপ করে গেলেন। বোধহয় ওঁর নিজের কানেই ওঁর কথাবার্তাগুলো ফিকে ঠেকছিল।

মিংকি নীচু গলায় প্রিয়নাথকে বলল, 'ভূতনাথদা, পত্রলোচনবাবুর এই বাড়িটা যে হন্টেড তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যদি মিস্টার দত্ত এই হন্টিং-এর ব্যাপারটা মেনে নেন তা হলে তো মিটেই গেল। আমাদের চ্যানেল উইন করছে, আর মিস্টার দত্ত অ্যাপলজি চেয়ে আমাদের ডিরেক্টরকে একটা চিঠি দিয়ে দেবেন—ব্যস।'

'তুমি কী বলতে চাইছ স্পষ্ট করে বলো তো...।' প্রিয়নাথ ভুরু কুঁচকে মিংকির দিকে তাকালেন।

'আমি বলতে চাইছি কি, হন্টিং-এর ব্যাপারটা যদি আমরা—বোথ দ্য পার্টিস—অ্যাকসেপ্ট করে নিই তা হলে তো আর কোনও ডিসপিউট নেই। আমরা কালই কলকাতায় ব্যাক করতে পারি...।'

মিংকি নীচু গলায় কথা বললেও রমাশঙ্কর দত্ত বোধহয় ওর কথার সারমর্ম আঁচ করতে পেরেছিলেন। তাই বললেন, 'না, মিস তেওয়ারি, আমি এখনই হন্টিং-এর ব্যাপারটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না। মানছি, আমি খানিকটা ধাক্কা খেয়ে গেছি, কিন্তু এখনও হান্ড্রেড পার্সেন্ট কনভিনসড হইনি। কাল দিনেরবেলা আমি লোচনবাবুর পারমিশন নিয়ে ওই পিকচার দেখানো ওয়ালটা আর-একবার এগজামিন করব। ওটার পেছনে কারচুপি থাকার ব্যাপারটা আমি এখনও পুরোপুরি উড়িয়ে দিতে পারছি না। কারণ, সব ঘটনারই একটা সায়েন্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশান থাকতে হবে। বিজ্ঞান আর যুক্তির কাছে সব কাবু...।'

মিংকি কোনও জবাব দিল না, শুধু প্রত্যাশা নিয়ে ভূতনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রিয়নাথ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নাড়লেন। তারপর মিংকিকে বললেন, 'তুমি কাল বরং তৃষ্ণাদের কাছে হোটেলে চলে যেয়ো। দ্যাট উইল বি সেফ ফর যু—।'

'না, ভূতনাথদা, সেটা হয় না।' আপত্তি করল ভয়-পাওয়া মেয়ে : 'আমি আপনার সঙ্গে থাকব...।'

ভূতনাথ কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই পত্রলোচন কাঁসার থালা-গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ছোট টেবিলটার ওপরে কোনওরকমে তিনজনের থালা-গ্লাস সাজিয়ে দিলেন।

তারপর বিনীতভাবে বললেন, 'খুবই ছোট টেবিল। একটু কষ্ট করে মানিয়ে নিন...।'

টেবিলটা সেন্টার টেবিল গোছের হলেও তিনটে থালা আর গ্লাস টায়টোয় এঁটে গিয়েছিল।

জলের বোতল থেকে তিনটে গ্লাসে জল ঢেলে দিলেন। তারপর অন্দরের দরজার কাছে গিয়ে ভাতের হাঁড়ি নিয়ে এলেন। সেটা এনে টেবিলের কাছে রেখে আবার গেলেন অন্দরের দরজার কাছে।

এবারে এল একটা বাটি আর ছোট ডেকচি। তাতে যথাক্রমে আলুভাজা আর ডিমের ডালনা।

বোঝাই যাচ্ছিল, অন্দরে যাওয়ার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে পত্রলোচনের স্ত্রী খাবারদাবারগুলো স্বামীর হাতে এগিয়ে দিচ্ছিলেন—কিন্তু প্রিয়নাথরা ওঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। বোধহয় আড়ালটাই ভদ্রমহিলা পছন্দ করছিলেন।

প্রিয়নাথের অস্বস্তি হচ্ছিল। যিনি এত কষ্ট করে তিনজন অতিথির জন্য রান্নাবান্নার ধকল পোয়ালেন তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর সুযোগটাই পাওয়া যাচ্ছে না!

সে-কথাই তিনি বললেন পত্রলোচনকে।

উত্তরে পত্রলোচন মিনমিন করে জবাব দিলেন, 'কী বলব, বলুন! ও এতই লাজুক আর মুখচোরা যে, অচেনা কারও সামনে আসতেই চায় না।'

মিংকিরা খাওয়া শুরু করে দিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরেই তিনজনের খিদে পাচ্ছিল। খিদের মুখে আলুভাজা, ডিমের ডালনা আর গরম ভাত রীতিমতো অমৃত বলে মনে হচ্ছিল।

পত্রলোচন আবার অন্দরের দরজার দিকে যেতেই রমাশঙ্কর দত্ত চাপা গলায় মন্তব্য করলেন, 'ওঁর ওয়াইফের কিছু একটা ব্যাপার আছে, বুঝলেন।'

'কী ব্যাপার?' প্রশ্নটা করে আলুভাজা আর ডিমের ঝোল ভাতের সঙ্গে মেখে এক গ্রাস মুখে পুরে দিলেন প্রিয়নাথ।

'এই যে সব আনন্যাচারাল ফেনোমেনা। দেখুন গে, সে-ই হয়তো আড়ালে বসে কলকাঠি নাড়ছে!'

## সাত

চপলকেতুতে সূর্যোদয় দেখবেন বলে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছিলেন ভূতনাথ। ঘর থেকে বেরিয়ে বাঁ-দিকের আকাশে চোখ রাখতেই দেখতে পেয়েছেন লালচে আকাশ। আর তার কিছুক্ষণ পরেই দেখা দিয়েছেন সূর্যদেব। প্রায় দিগন্তরেখার কাছাকাছি।

রমাশঙ্কর দত্তর কথা মনে পড়ল। ন্যাচারাল ফেনোমেনন। মনে পড়ল, পত্রলোচনের কথাগুলোও।

ভোরের পাখির ডাক প্রিয়নাথকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল। ওরা খাবারের খোঁজে এদিক-ওদিক উড়ে যাচ্ছিল।

দূরে দেখা যাচ্ছে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি। তাকে ঘিরে অনেক গাছপালা। চপলকেতুর ম্যাপের হিসেবমতো ওই বাড়িটা ছাড়িয়ে এগিয়ে গেলে একটা পুকুর পাওয়া যাবে।

কাল রাতের ঘটনাগুলোর কথা ভেবে প্রিয়নাথের কপালে ভাঁজ পড়েছিল। রাতের তুলনায় দিনেরবেলাটা কত আলাদা! নাঃ, আজ দিনেরবেলা এলাকাটা একটু ভালো করে ঘুরে দেখতে হবে। যে-প্রমাণের খোঁজে প্রিয়নাথ এখানে এসেছেন তা পাওয়ার কাজ গতকাল রাত থেকেই শুরু হয়ে গেছে। কিন্তু যত প্রমাণ পাওয়া যায় ততই ভালো। কারণ, রমাশঙ্কর দত্ত যতই যুক্তিবাদী হোন না কেন একইসঙ্গে এঁড়ে তর্কপ্রিয়। কোনও অলৌকিক ঘটনাকে অলৌকিক বলে মেনে নিতে ওঁর সমস্যা আছে। ওঁকে এ জাতীয় কিছু বিশ্বাস করানো বেশ কঠিন।

ঘরে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি তৈরি হতে লাগলেন প্রিয়নাথ। সাড়ে ন'টায় তৃষ্ণা, বিনোদকুমার ওদের আসার কথা। তারপর টাটা সুমো নিয়ে পত্রলোচনের ভূতুড়ে অঞ্চলটা ঘুরে দেখতে হবে। ভূত, প্রেত বা অপদেবতার অস্তিত্বের প্রমাণ খুঁজতে হবে। এমন প্রমাণ, যে-প্রমাণটা রমাশঙ্কর দত্তের মতো কট্টর যুক্তিবাদী মানুষও মেনে নেবে।

প্রিয়নাথদের ঘরগুলোর পাশেই রয়েছে একটা বাথরুম আর কলতলা। সেখানে টিউবওয়েল লাগানো আছে। প্রিয়নাথদের সেরকম কোনও অসুবিধে হয়নি। রাতে বাথরুমে যাওয়ার সময় সঙ্গে টর্চ নিয়েছেন। শুধু মিংকির বেলায় প্রিয়নাথকে টর্চ হাতে সিকিওরিটির কাজ করতে হয়েছে।

সারারাত মিংকি ঘুমোতে পারেনি—বলতে গেলে জেগেই ছিল। শুতে যাওয়ার আগে প্রিয়নাথকে বলেছে, 'ভূতনাথদা, একটা আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট। রাতে আপনার ঘরের দরজাটা প্লিজ লক করবেন না। যদি আমাকে টয়লেটে যেতে হয় তা হলে আপনাকে ডাকব। আর ডর লাগলেও ডাকব। ওকে?'

ভূতনাথ হেসে ওকে ভরসা দিয়েছেন।

রাতে ভূতুড়ে ব্যাপার ঘটেনি। শুধুমাত্র ওই ছুটোছুটির শব্দটাই যা বারকয়েক ট্রাবল দিয়েছে।

ন'টা বাজার দশমিনিট আগেই প্রিয়নাথ তৈরি হয়ে ঘর থেকে বেরোলেন। গায়ে গতকাল রাতের পোশাক : বাদামি রঙের হাতকাটা পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। কাঁধে অফ হোয়াইট কাপড়ে তৈরি একটা ঝোলা ব্যাগ। তার ভেতরে ভূতশিকারির অস্ত্রশস্ত্র।

মিংকির ঘরের কাছে গিয়ে দুবার ওর নাম ধরে ডাকলেন। ঘরের বন্ধ দরজার ওপিঠ থেকে জবাব এল, 'ব্যস, অওর দো মিনট, ভূতনাথদা...।'

তখনই রমাশঙ্কর ওঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ছাই রঙের প্যান্ট, হালকা নীল আর কালো স্ট্রাইপ দেওয়া শার্ট। হাতে একটা কালো ব্যাগ। মুখে কী একটা ক্রিম মেখেছেন। একহাত দূর থেকেও তার গন্ধ পাচ্ছিলেন প্রিয়নাথ।

চারপাশটা একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রমাশঙ্কর বললেন, 'সকালটা বেশ। মনটা ফ্রেশ করে দেয়...।'

'হুঁ—রাতটাই যত ঝামেলার।'

রমাশঙ্কর একটু অবাক হয়ে প্রিয়নাথের দিকে তাকালেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আজ কুয়াশার ওই জায়গাটায় চেক করতে যাবেন তো?'

প্রিয়নাথ সায় দিয়ে মাথা নাড়লেন : 'হ্যাঁ—যাব। আরও অনেকগুলো স্পটেই যাব। ভূত-প্রেত থাক বা না থাক, চেক করতে দোষ কী!'

রমাশঙ্কর কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎই পত্রলোচনকে দেখতে পেয়ে চুপ করে গেলেন।

পত্রলোচনের পরনে লুঙ্গি আর হাফশার্ট। মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে মানুষটা প্রিয়নাথদের কাছে এগিয়ে এল।

'স্যার, সামান্য চায়ের ব্যবস্থা করেছি। চলুন, একটু চা-টা খেয়ে তারপর কাজে নামবেন।'

'আপনি যান, মিংকি রেডি হয়ে বেরোলেই আমরা যাচ্ছি।' প্রিয়নাথ বললেন।

চলে যেতে গিয়েও ঘুরে দাঁড়ালেন পত্রলোচন : 'ও, ভালো কথা— রাতে আপনাদের কোনওরকম অসুবিধে হয়নি তো?'

'না, হয়নি।'

'ভালো...ভালো...।' বলতে-বলতে পত্রলোচন চলে গেলেন।

রমাশঙ্কর দত্ত মুখের একটা ভঙ্গি করে বলে উঠলেন, 'অসুবিধে হলেই বা উনি কোন ঘণ্টা করতেন! ওঁর কাছে সবই তো ন্যাচারাল ফেনোমেনন!'

প্রিয়নাথ হেসে ফেললেন। ভাবলেন, আপনা দাওয়াই আপনা ঘাড়ে।

এমন সময় মিংকি বেরিয়ে এল : 'চলিয়ে, ভূতনাথদা, আই অ্যাম রেডি—।'

'চলো, চলো, চায়-পানির ডাক এসেছে।' প্রিয়নাথ হেসে বললেন।

মিংকির পায়ে ব্লু জিনস, গায়ে থ্রি-কোয়ার্টার হাতাওয়ালা ঘিয়ে রঙের টপ।

ওঁরা তিনজনে আবার সেই ঘরে এসে ঢুকলেন। যে-ঘরটাকে এখন ব্যবহারের ধরন মনে রাখলে ড্রয়িংরুম কাম ডাইনিংরুম বলা যায়।

প্রিয়নাথ জোয়ারদার ঘরটাকে বেশ খুঁটিয়ে দেখছিলেন। গতকাল বিকেলে যখন ঘরটায় প্রথম পা রেখেছিলেন তখন ঘরটাকে ততটা গুরুত্ব দিয়ে দেখেননি। কিন্তু কাল রাতের ঘটনার পর ঘরটাকে এখন অতি সহজেই 'অকুস্থল' বলা যায়। গতকালের সবকিছুই আজ সকালে একইরকম আছে, অথচ তাও যেন মনে হল কোথায় যেন একটা অদৃশ্য মাত্রা যোগ হয়ে গেছে।

পত্রলোচন নির্বিকারভাবে একটা চেয়ারে বসে বিড়ি টানছিলেন। ওঁদের তিনজনকে দেখে মুখে একচিলতে হাসি ফুটিয়ে উঠে দাঁড়ালেন : 'আসুন স্যার...আসুন ম্যাডাম...।' করে বিনীত অভ্যর্থনা জানালেন।

'পাঁচমিনিট বসুন, আমি এখুনি চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করছি...।' বলে পত্রলোচন চলে গেলেন।

মিংকি গতকাল পত্রলোচনকে বলেছে যে, ওদের জন্য ব্রেকফাস্টের কোনও ব্যবস্থা হবে না। কারণ, ওদের প্যাকেট ব্রেকফাস্ট বর্ধমানের হোটেল থেকে আসবে। তৃষ্ণা আর বিনোদকুমার নিয়ে আসবে।

দুপুরের খাওয়া আর বিকেলের চায়ের ব্যাপারটাও প্রায় সেইরকম। টাটা সুমো নিয়ে ওরা সবাই দোকানপাটে জমজমে কোনও এলাকায় গিয়ে সেগুলো সেরে নেবে।

পত্রলোচন তখন কাচুমাচু মুখে বলেছেন, 'আপনাদের যেরকম মরজি।'

প্রিয়নাথ চটপটে পা ফেলে 'সিনেমা দেখানো' দেওয়ালটার কাছে গেলেন। ওটার ওপরে হাত রেখে ভালো করে উষ্ণতা অনুভব করলেন। না, এখন আর গতকাল রাতের হিমঠান্ডা ব্যাপারটা নেই।

রমাশঙ্কর সাততাড়াতাড়ি পা ফেলে চলে গেলেন দেওয়ালটার কাছে। ভূতনাথকে নকল করে দেওয়ালে হাত বোলাতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়লেন, 'না, মিস্টার জোয়ারদার, কোনও টাইপের ভাইব্রেশান ফিল করা যাচ্ছে না—।'

প্রিয়নাথ সিরিয়াস মুখে বললেন, 'ও, তাই! আমি ভাইব্রেশান চেক করছিলাম না, টেম্পারেচার চেক করছিলাম...।'

রমাশঙ্কর একটু অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেও পরিস্থিতি সামলে নেওয়ার চেষ্টা করলেন। টেবিলের দিকে ফিরে আসতে-আসতে বললেন, 'কালকের ব্যাপারটা আমি ডিটেইলসে খাতায় নোট করেছি। তার সঙ্গে পসিবল এক্সপ্ল্যানেশান হিসেবে বেশ কয়েকটা থিয়োরিও লিখেছি।'

মিংকি প্রশ্ন করল, 'কী থিয়োরি? আমাদের বলা যাবে?'

'কেন নয়!' শব্দ করে হাত ঝেড়ে রমাশঙ্কর একটা চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর ওঁর থিয়োরিগুলো বলতে লাগলেন।

একটা থিয়োরি হল, ওই দেওয়ালটার উলটোদিকের দেওয়ালের কোনও ফুটো থেকে ওই ছুটন্ত মানুষের ছবি পলকের জন্য অভিশপ্ত দেওয়ালে প্রজেক্ট করা হয়েছে।

তখন প্রিয়নাথ বললেন যে, শুধু উলটোদিকের দেওয়াল কেন, ঘরের কোনও দেওয়ালেই প্রজেক্টরের আলো ফেলার জন্য কোনও ফুটো নেই।

রমাশঙ্করের দ্বিতীয় থিয়োরি হল, কাপড়ের পরদায় আঁকা কোনও সিলুয়েট ছবি কেউ চটজলদি এপাশ থেকে ওপাশে টেনে নিয়ে গেছে।

তখন মিংকি হাসি চেপে বলল, 'কে টেনে নিয়ে যাবে? কাউকে তো দেখা যায়নি—!'

রমাশঙ্কর হাল ছাড়ার পাত্র নন। জেদি গলায় বললেন, 'দেখুন, এসব যে সুপারন্যাচারাল ব্যাপার সেটা আমি কিন্তু এখনও মেনে নিতে পারছি না। আই অ্যাম ইয়েট টু বি কনভিনসড। এলাকাটাকে আমি তন্নতন্ন করে প্রোব করব, তারপর ছাড়ব। ভূত, প্রেত, কারচুপি যা-ই থাকুক সেসব আমি এক্সপোজ করবই করব।'

এইসব কথাবার্তা কিংবা কথাকাটাকাটির মধ্যেই পত্রলোচন একটা স্টিলের থালায় করে চা-বিস্কুট নিয়ে হাজির হয়ে গেছেন। কথাবার্তার শেষটুকু শুনতে পেলেও মিংকি ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, মানুষটা নির্বিকার।

পত্রলোচন হাতপাখা এগিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গতকাল রাতের তুলনায় আজ সকালে গরমটা কম লাগছিল। সেইজন্য প্রিয়নাথ আর হাতপাখা নেননি।

রমাশঙ্কর দত্ত চোয়াল শক্ত করে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিলেন। প্রিয়নাথ ওঁকে আড়চোখে লক্ষ করছিলেন। মাঝে-মাঝে রমাশঙ্করের চোখ চলে যাচ্ছিল সেই দেওয়ালটার দিকে।

চা খাওয়া পুরোপুরি শেষ করে ওঠার আগেই গাড়ির হর্ন বেজে উঠল। তৃষ্ণারা এসে গেছে।

পত্রলোচনকে ওঁদের সঙ্গী হওয়ার জন্য প্রিয়নাথ আগেই বলে রেখেছিলেন। তাতে পত্রলোচনের প্রতিক্রিয়া ছিল টগবগে।

'আমার জমিদারিতে আপনারা ঘুরবেন, ইন্সপেকশন করবেন—তো আমি সঙ্গে যাব না!'

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই সবাই তৈরি হয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। চা খাওয়া শেষ করার পরপরই ভূতনাথ একটা উইলস ফিলটার ধরিয়েছিলেন। সেটার অবশেষ ছুড়ে ফেলে দিয়ে চপলকেতুর ম্যাপটা কোলের ওপরে খুলে বসলেন।

বিনোদকুমারের কানে ছিপি গোঁজা। গানের তালে-তালে মাথা নাড়ছে। মিংকি তৃষ্ণাকে পেয়ে নীচু গলায় ওর কাল রাতের অভিজ্ঞতা শোনাচ্ছে। রমাশঙ্কর ওঁর কালো ব্যাগটা খুলে কীসব কাগজপত্র চেক করছেন। আর পত্রলোচন চুপচাপ নির্বিকার। গাইড হিসেবে কাজ করার সুবিধে হবে বলে বিজয় রাধের পাশে বসেছেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে লক্ষ করে বললেন, 'আমরা কিন্তু পুরো এলাকাটা ঘুরে দেখব। মন্দিরগুলো, চণ্ডীমণ্ডপ আর নাটমঞ্চ, চারটে পুকুর। আপনার অন্য তিনটে বাড়ি...।'

ঘাড় ঘুরিয়ে প্রিয়নাথের দিকে তাকালেন পত্রলোচন : 'অবশ্যই, স্যার, অবশ্যই...।'

'আপনি একটু আমাদের পাইলট বিজয়কে বলে দিন। ও আপনার ডিরেকশান মতো চালাবে—।'

গাড়ির এসি বন্ধ। জানলা খোলা। তাই বাতাস ঢুকছিল। প্রিয়নাথ বাইরের দিকে শূন্য চোখ মেলে ভাবছিলেন। রমাশঙ্কর চুপচাপ গুম হয়ে বসেছিলেন।

পত্রলোচন একটা বিড়ি ধরালেন। থেকে-থেকেই বিজয় রাধেকে নির্দেশ দিতে লাগলেন। বিনোদকুমার কখন যেন ওর ক্যামেরা চালু করে দিয়েছে। বোধহয় এই কারণেই ও মিংকি আর তৃষ্ণাকে টাটা সুমোর পিছনের চেম্বারে ঠেলে দিয়ে নিজে প্রিয়নাথদের পাশে মাঝের রো-তে বসেছে। ওর ক্যামেরা পালা করে সবাইকে ধরছিল। তবে পত্রলোচন, প্রিয়নাথ আর রমাশঙ্করকেই ধরছিল বেশি। এ ছাড়া যে-রাস্তা ধরে গাড়ি চলছিল সেটাকেও মাঝে-মাঝে ভিডিয়োতে বন্দি করছিল।

প্রিয়নাথের নির্দেশে বিজয় খুব ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিল। কারণ, প্রিয়নাথ দুপাশের হালহকিকত পরখ করতে চাইছিলেন।

পথের দুপাশে ধু-ধু পরিত্যক্ত জমি। দেখে বোঝা যায় এককালে চাষবাস হত, এখন শুধুই আগাছা আর পরগাছা। এ ছাড়া রয়েছে বিস্তীর্ণ মাঠ—যেখানে সবুজের কোনও ছোঁওয়া নেই—শুধু ধূসর ধুলোমাটি।

চলার পথে নাটমঞ্চ আর একটা ভাঙাচোরা মন্দিরকে পাশ কাটিয়ে টাটা সুমো গিয়ে থামল একটা বড় পুকুরের কাছে।

গাড়ি থেকে সবাই নেমে পড়ল। বিনোদকুমার ক্যামেরা বাগিয়ে ওর কাজ শুরু করল।

পত্রলোচন প্রিয়নাথের কাছে এসে দাঁড়ালেন। পুকুরটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'এই পুকুরটা থেকেই আমার এলাকা শুরু। এটা হল পশ্চিম দিক। আমার জমিদারি এলাকাটা পুবে-পশ্চিমে লম্বা, বরং উত্তর-দক্ষিণে অনেক খাটো...।'

প্রিয়নাথ পুকুরের কাছে এগিয়ে গেলেন। ওঁর পিছনে বিনোদকুমার।

পুকুরের জলের রং নীলচে সবুজ। হয়তো জলের গাছ আর শ্যাওলাই এর কারণ। প্রিয়নাথ স্থির নজরে জলটাকে লক্ষ করছিলেন।

জল নড়ছে। জলে মুখ বের করে ভেসে থাকা কোনও মাছ হঠাৎ করে ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে যেমনটা হয়।

ঝোলা ব্যাগ থেকে ডিজিটাল ক্যামেরা বের করলেন প্রিয়নাথ। পুকুরের পরপর কয়েকটা ছবি তুললেন। রমাশঙ্কর দত্তও বেশ তৎপরভাবে ভূতনাথকে নকল করতে লাগলেন।

পত্রলোচন প্রিয়নাথের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। প্রিয়নাথ ওঁর দিকে ঘুরে তাকিয়ে গলা তুলে জিগ্যেস করলেন, 'এ-পুকুরে বড় মাছ আছে নাকি? রুই-কাতলা-মৃগেল টাইপের?'

হাসলেন পত্রলোচন : 'এককালে অবশ্যই ছিল। তা এখন কি আর আছে! আমি তো বহুবছর এর কোনও যত্নআত্তি করি না। আকাশের নীচে হেলাফেলায় পড়ে আছে। যে সে মাছ ধরতে পারে। আবার ফলিডলও ঢালতে পারে। একমাত্র ভগবানই জানেন!' আকাশের দিকে হাত তুলে কথা শেষ করলেন।

কিন্তু ওঁর কথার ধরনটা প্রিয়নাথের কানে একটু কেমন-কেমন বাজল। ভদ্রলোক যেন বড্ড বেশি নির্বিকার নিস্পৃহ ভাব দেখাচ্ছেন। এটাই কি ওঁর আসল চেহারা?

পুকুরপাড়ে বেশ কয়েকটা কলাগাছ। সেগুলো থেকে খানিকটা দূরে তিনটে খেজুরগাছ। এ ছাড়া বেশিরভাগটাই আগাছার খাটো ঝোপ। সকালের রোদে কলাপাতা থেকে আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। তাদের ছায়া মাটিতে হিজিবিজি কেটেছে।

পুকুর ডিঙিয়ে একটু দূরে তাকালে বেশ কয়েকটা ধানখেত আর ঘর চোখে পড়ছে। ঘরগুলোকে কুঁড়েঘর বলাই ভালো। কোনওটায় টালির ছাউনি আর কোনওটা নিতান্তই খড়ে ছাওয়া। বোঝাই যায়, পত্রলোচনের 'হন্টেড' এলাকা এই পুকুর পেরিয়েই শেষ হয়ে গেছে। তাই সেখানে চোখে পড়ছে ঘরবাড়ি আর চাষবাস।

রমাশঙ্কর দত্ত প্রিয়নাথের কাছে এসে জিগ্যেস করলেন, 'মিস্টার জোয়ারদার, পুকুরটার মধ্যে কোনও সিম্পটম পেলেন নাকি?'

'কীসের সিম্পটম?' প্রিয়নাথ ভুরু কপালে তুলে জানতে চাইলেন। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, রমাশঙ্কর ক্রমেই ওঁর কাছে উপদ্রবের চেহারা নিচ্ছেন।

'হন্টিং-এর সিম্পটম...।'

প্রিয়নাথ ঠান্ডা চোখে যুক্তিবাদের দাদামশাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'এখনও পাইনি। পেলে আপনাকে জানাব, এবং আপনার কাছ থেকে তার সায়েন্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশানও জেনে নেব...।'

রমাশঙ্কর দত্ত একটু কিন্তু-কিন্তু করে ভূতনাথের কাছ থেকে সরে এলেন।

বেশ খানিকটা দূরে দুটি মানুষকে চোখে পড়ল। কুঁড়েঘরগুলোর দিক থেকে প্রিয়নাথদের দিকেই হেঁটে আসছে। একজন লোক, আর তার সঙ্গে বছর দশ-বারোর একটি ছেলে। দুজনেরই খালি গা। বোধহয় গাড়ি আর লোকজন দেখে কৌতূহলী হয়ে দেখতে আসছে।

কিন্তু ওরা বেশ কিছুটা এগিয়ে আসার পর দেখা গেল, লোকটির হাতে কয়েকটা বাসনপত্র। আর ছেলেটির হাতে দড়ি-বালতি—কুয়ো থেকে জল তোলার জন্য যেমন ব্যবহার করা হয়।

প্রিয়নাথ সিগারেট ধরিয়েছিলেন। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে মানুষ দুজনকে লক্ষ করতে লাগলেন।

পুকুরের বিপরীতদিকে এসে ওরা থামল। সতর্ক পা ফেলে দুজনেই পাড় বেয়ে নেমে গেল পুকুরের জলের কাছাকাছি। বারবার প্রিয়নাথদের দিকে দেখতে লাগল।

লোকটা হাতের বাসনপত্র পুকুরপাড়ে একটা জায়গায় নামিয়ে রাখল। পুকুরের এপার থেকেও প্রিয়নাথ লক্ষ করলেন, সেখানে বড় একটা বোল্ডার পাতা। তার ওপরেই বাসনগুলো রেখেছে লোকটা।

এরপর ছেলেটা হাতের বালতিটা ছুড়ে দিল পুকুরের জলে। দড়ির অন্য প্রান্তটা ধরে রইল। তারপর দড়ি ধরে বালতিটা নাড়াচাড়া করে তাতে জল ভরতি করে ওটাকে টেনে তুলল। ঠিক যেন কুয়ো থেকে জল তুলছে।

পুকুর থেকে এভাবে জল তুলতে প্রিয়নাথ কাউকে কখনও দেখেননি।

তিনি তাজ্জব হয়ে গেলেন। ঘুরে তাকিয়ে দেখলেন, দৃশ্যটা বাকিদেরও অবাক করে দিয়েছে। শুধু পত্রলোচন সিংহ রায় ভাবলেশহীন মুখে বিড়িতে টান দিচ্ছেন।

বালতি থেকে জল নিয়ে লোকটি বাসন ধোয়ার কাজ শুরু করল। ছোট ছেলেটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সেটা দেখছিল।

প্রিয়নাথের চোখে-মুখে উত্তেজনার ছায়া দেখা গেল। সিগারেটটা চট করে ফেলে দিয়ে তিনি মিংকির দিকে তাকালেন।

'মিংকি, আমি একটু আসছি। ওই দুজন লোকের সঙ্গে একটু একা কথা বলব...।'

'ওকে, ভূতনাথদা—' ঘাড় নেড়ে বলল মিংকি।

বিনোদকুমার ক্যামেরা নিয়ে ওঁকে অনুসরণ করতে যাচ্ছিল, প্রিয়নাথ ওকে হাতের ইশারায় বারণ করলেন। তারপর তাড়াতাড়ি পায়ে পুকুরের পাড় ধরে হাঁটা দিলেন।

রমাশঙ্কর দত্তও প্রিয়নাথকে অনুসরণ করা শুরু করেছিলেন, কিন্তু ওঁকে বাধা দিল মিংকি : 'আপনি শোনেননি ভূতনাথদা কী বললেন? আপনার যদি ওদের সঙ্গে কথা বলতে হয় তা হলে আপনি পরে যান। ডোন্ট ডিসটার্ব ভূতনাথদা—।'

রমাশঙ্কর থমকে গেলেন।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে প্রিয়নাথ ওদের কাছে পৌঁছে গেলেন। পুকুরের পাড়ে কয়েক পা নেমে লোকটির সঙ্গে কথা বললেন।

'নমস্কার। আমরা কলকাতা থেকে আসছি—।'

লোকটি বাসন ধোওয়া থামিয়ে ডানহাতটা কপালের কাছে তুলে নমস্কার এবং সেলামের মাঝামাঝি কিছু একটা করল।

পুকুরপাড় ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় প্রিয়নাথ ভাবছিলেন, নিজেদের ঠিক কী পরিচয় দিলে স্থানীয় লোকটির মনে কোনও সন্দেহের কাঁটা ফুটবে না।

'আমার নাম প্রিয়নাথ জোয়ারদার। একটা কোল্ড স্টোরেজ খুলব বলে এখানে জমি দেখতে এসেছি। ওই যে, ওই লম্বামতন ভদ্রলোক—' আঙুল তুলে পুকুরের ওপারে দাঁড়ানো পত্রলোচন সিংহ রায়ের দিকে দেখালেন : 'উনিই জমির মালিক। আমাদের জমি দেখাচ্ছেন। আমরাও তাই জমির ছবি-টবি তুলে নিচ্ছি। পরে ওঁর বাড়িতে বসে দরদাম হবে।'

প্রিয়নাথকে দেখে প্রথমে লোকটির কপালে যেসব ভাঁজ-টাজ পড়েছিল সেগুলো এখন মিলিয়ে গেল। বাসন মাজা ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল।

'এখানে কোল্ড ইস্টোরেজ করবেন কী! এখানে তো বিজলি নেই!'

'জানি। আমরা এ-গ্রামে বিজলি আনার ব্যবস্থা করব। তারপর কোল্ড স্টোরেজ—।'

'অ—।' বলে চুপ করে গেল লোকটা।

তারপর জানাল, ওর নাম জপেশ্বর মালিক। সঙ্গে ওর ছেলে মামুন। ওর বউয়ের কাল থেকে বেশ জ্বর। তাই ও ছেলেকে নিয়ে বাসন মাজতে এসেছে। নইলে এই কাজটা রোজ ওর বউ করে।

জপেশ্বরের কালো পাকানো চেহারা। মাথায় চুল কম। সামনের দিকে দুটো দাঁত নেই। নাকটা ভোঁতা।

ছেলের মুখে আর চেহারায় বাপের ছাঁচ বসানো। চোখ দুটো বড়-বড়। কৌতূহলে ভরা।

'পুকুরে দড়ি-বালতি ফেলে জল তুলে বাসন মাজছেন? পুকুরে কোনও বিপদ-আপদ আছে নাকি?'

'বিপদ-আপদ?' বলে জপেশ্বর মাথা চুলকোতে লাগল। পুকুরের ওপারে দাঁড়ানো লোকজনের দিকে তাকাল।

ওর ইতস্তত ভাব দেখে ভূতনাথ আবার জিগ্যেস করলেন, 'কুমির কিংবা হাঙর-টাঙর আছে নাকি?'

জপেশ্বর একটু লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলল। মাথা নীচু করে বলল, 'না, না, বাবু—ওসব এই পুকুরে আসবে কোত্থেকে?' তারপর চুপ করে গেল।

মামুন হঠাৎ বলে বসল, 'আমি বলব, বাবা? আমি বলব?'

ছেলেকে মুখঝামটা দিয়ে থামিয়ে দিল জপেশ্বর, 'চুপ কর! সব কথায় পোদ্দারি!'

'বলুন না, ভাই। আমি কাউকে জানাব না। যদি ভূত-প্রেত-অপদেবতার ব্যাপার থাকে তা হলে এখানে জমি কিনে বিদ্যুৎ আনিয়ে কি আমি ফেঁসে যাব!' কথা বলতে-বলতে পাঞ্জাবির পকেট থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করলেন। জপেশ্বরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা রাখুন। পুজোপরবের সময় ছেলেকে জামা-টামা কিনে দেবেন...।'

একটু কিন্তু-কিন্তু করে জপেশ্বর টাকাটা নিল। কোমরে গুঁজে রাখতে-রাখতে মিনমিনে গলায় বলল, 'কিছু তো একটা পুকুরের ভেতরে আছে, বাবু—কিন্তু কী আছে তা জানি না।'

জপেশ্বরের মুখেই পুকুরের কাহিনি শোনা গেল।

এই পুকুরটা ওদের ঘর-বাড়ি আর চাষবাসের এলাকার কিনারায় বলে জপেশ্বররা অনেকেই এটা সময়ে অসময়ে ব্যবহার করে। আগে সবাই এখানে স্নান করত, কাপড় কাচত, বাসন মাজত। কিন্তু পাঁচ বছর আগে একটা ঘটনা ঘটার পর থেকে পুকুরটা লোকে ব্যবহার করতে ভয় পায়। স্নান তো কেউ করেই না, আর কাপড় কাচা বা বাসন মাজার ব্যাপারটা চলে দড়ি-বালতি নিয়ে—যেমনটা জপেশ্বর এখন করছে।

'কী হয়েছিল পাঁচ বছর আগে?' প্রিয়নাথ জিগ্যেস করলেন।

'টাইমটা বর্ষার সময় ছিল। মাঠে ছেলেপিলের দল ফুটবল খেলছিল। তো খেলার শেষে হাত-পা ধুয়ে সাফসুতরো হওয়ার জন্যে তিনজন জোয়ান ছেলে এই পুকুরে নেমেছিল। তখন সন্ধে হয়-হয়। তো হঠাৎ যে

কীসে ওদের টেনে নিল কেউ জানে না। তিনজনই ভালো সাঁতার জানত। কিন্তু ওরা কেউ আর উঠল না।

'পুকুর ঘিরে আমরা হইচই করলাম। হ্যাজাক বাতি জ্বেলে জাল-টাল ফেললাম। কিন্তু কোনও লাভ হল না। ওরা আর উঠল না।

'আর আশ্চর্যের কথা কী বলব, বাবু—ওদের বডিও ভেসে উঠল না। ছেলে তিনটে একেবারে হাপিস হয়ে গেল। অথচ এ-পুকুরে চানা-চুনো মাছ ছাড়া মাছ নেই। হাঙর-কামট তো দূরের কথা! তো তখন থেকে এটা ভূতুড়ে পুকুর হয়ে গেল। কেউ এ পুকুরে নামে না।'

'কখনও জাল-টাল ফেলে এখান থেকে কিছু পাওয়া যায়নি?'

'না, না—কিছুই পাওয়া যায়নি।' পুকুরের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জপেশ্বর। আনমনাভাবে দুবার কান চুলকে নিয়ে বলল, 'আরও একটা ব্যাপার এই পুকুরে হয়, বাবু—।'

'কী হয়?'

'মাঝে-মাঝে এর জল নড়ে ওঠে...দুলতে থাকে। ভূমিকম্পের সময় যেমনটি হয়...।'

'সে কী!' অবাক হয়ে গেলেন ভূতনাথ : 'এরকম নড়ে ওঠে কেন?'

'জানি না, বাবু। বোধহয় জাগ্রত কোনও অপদেবতা এই কাণ্ডটি ঘটান...।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে পুকুরের ওপারের দিকে আঙুল দেখাল জপেশ্বর : 'ওই যে লম্বামতন লোকটা—ও-ই এসব পুকুর, মন্দির আর জমিনের মালিক। ওর নাম পত্রলোচন। সবসময় বলে বেড়ায়, ও নাকি এই এলাকার জমিদার। হুঁঃ, জমিদার না ঘেঁচু। আমরা কি আর বুঝি না! সে তুমি যা-ই হও, আমাদের জমিজমা, চাষবাস আর পুকুরে হাত লাগাতে এসো না। তারপর জমিদার হও, কি মহারাজা হও, কি সুলতান হও—আমাদের জানার দরকার নেই...।'

মামুন অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ ছিল। বাবা একাই যে প্রিয়নাথের সব মনোযোগ টেনে নিচ্ছে এটা ওর পছন্দ হচ্ছিল না। তাই ও আঙুল দেখিয়ে ফস করে ফোড়ন কাটল, 'ওসব জমি কিনবেন না, বাবু—সব ভূতুড়ে জমি...।'

'তুই চুপ কর!' ছেলেকে ধাতানি দিল জপেশ্বর, 'সব ব্যাপারে বকবক-বকবক।' তারপর প্রিয়নাথের দিকে ফিরে বলল, 'পত্রলোচন সুবিধের লোক না, বাবু। শুনেছি ওর বউ আর ছেলে দিন-রাত চোখে কালো চশমা লাগিয়ে রাখে। এ আবার কোন দেশি নকশা!

'যদি এই গরিবের কথা শোনেন, বাবু, এখানে জমিন কিনবেন না। অন্য কোথাও জমিন কিনে আপনার কোল্ড এস্টোরেজ না কী বললেন—ওইসব বানান। পত্রলোচনের জমিনে গণ্ডগোল আছে...!'

'কীসের গণ্ডগোল?' প্রিয়নাথ জানতে চাইলেন।

'ওঁর জমিন থেকে কত লোক উধাও হয়ে গেছে জানেন? লাস্ট সাত বছরে কমপক্ষে বারো-তেরোজন! এ ছাড়া হাঁস-মুরগি, গোরু-ছাগল তো আছেই! ফাঁকা জমির ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে-যেতে হঠাৎ আর নেই। সব উধাও! তো এরকম বেশ ক'বার হওয়ার পর খুব দরকার না হলে ওই ভূতুড়ে জমিনের ওপর দিয়ে আমরা কেউ হেঁটে যাই না। ওর জমিনের ওপর দিয়ে গেলে অনেকটা রাস্তা কম হয়। কিন্তু কে বিপদ ঘাড়ে নেবে বলুন! তাই আমরা সব ঘুরপথে যাতায়াত করি...।' একটু দম নিল জপেশ্বর। তারপর বলল, 'সন্ধের মুখে এখানকার মাঠেঘাটে ছুটন্ত ছায়া দেখা যায়। দৌড়োচ্ছে। খাড়া হয়ে নয়—মাঠের সঙ্গে লেপটে গিয়ে। যেন মাঠের ওপরে আঁকা কালো-কালো ছায়া। চারদিকে এলোমেলো ছুটছে। এসব কথা শুনলেই তো বুকটা ধড়ফড় করে। ওফ, সে আর বুকের কী দোষ।'

চপলকেতুর চপল ছায়া। মনে-মনে ভাবলেন প্রিয়নাথ। এরই একটা ছোট সংস্করণ তা হলে কাল রাতে পত্রলোচনের ঘরের দেওয়ালে ওঁরা দেখেছেন!

'উধাও হয়ে যাওয়া মানুষগুলোর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি?'

'না। একেবারে হাওয়ায় মিশে গেছে।'

'মানুষগুলো সাধারণত কোন সময়ে উধাও হয়েছে?'

'দিনেরবেলা। কখনও দুপুরে, কখনও বিকেল আর সন্ধের মুখোমুখি—।'

'পত্রলোচনবাবু এ নিয়ে কাউকে কিছু বলেননি?'

'ওঃ, পত্রলোচনবাবু!' ব্যঙ্গ করে ঠোঁট বেঁকাল জপেশ্বর : 'ওই লম্বু পত্রলোচনটা মহা সেয়ানা। আর হাড়ে বজ্জাত। খেয়েদেয়ে কোনও কাজ নেই, একগাদা ভূতুড়ে জমিন আর পুকুর-টুকুর নিয়ে আমাদের অঞ্চলে থেবড়ে বসে আছে! যা-ই হোক, বাবু, ওর জমিন আপনি না কিনলেই ভালো...। ছোট মুখে এর বেশি আর কী বলব!'

জপেশ্বর চুপ করে গেল। মাথা তুলে একবার সূর্যের দিকে তাকাল। বোধহয় সময় আঁচ করতে চাইল।

প্রিয়নাথ ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে ফেরার পথ ধরলেন। ওপারে তাকিয়ে দেখলেন, রোদের হাত থেকে বাঁচতে মিংকিরা সবাই গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসেছে। শুধু পত্রলোচন টাটা সুমোর বাইরে একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন। হয়তো প্রিয়নাথের ফিরে আসার জন্য তিনি কিছুটা উদগ্রীব। ওই গ্রাম্য লোকটির সঙ্গে প্রিয়নাথের কী-কী কথাবার্তা হল সেটা জানার কৌতূহলও হয়তো পত্রলোচনের কম নয়।

পুকুরের জল নড়ার কথাটা ভাবছিলেন ভূতনাথ। ভূমিকম্প ছাড়া জলের এরকম দুলুনি খুবই অস্বাভাবিক। একমাত্র জলের গভীরে থেকে কেউ যদি জলে হাত-পা নেড়ে কিংবা বইঠাজাতীয় কিছু দিয়ে আলোড়ন তোলে তবেই জলের ওপরের তল এপাশ-ওপাশ দুলতে পারে।

কিন্তু জলের গভীরে থেকে এরকম ডিসটারব্যান্স তৈরি করবে কে?

প্রিয়নাথের ছুটন্ত পায়ের শব্দের কথা মনে পড়ল। ওই পায়ের মালিকরা ওরকম ব্যস্তভাবে ছুটোছুটি করছে কেন? ওরা কি দৌড়ে পালাচ্ছে?

কিন্তু কার কাছ থেকে পালাচ্ছে? কোথায় পালাচ্ছে? পত্রলোচন কি এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না? সবসময় তিনি যেরকম ভাবলেশহীন নির্বিকার অভিব্যক্তি নিয়ে পাথরের মূর্তির মতো নিথর হয়ে আছেন, সেটাই কি ওঁর আসল চেহারা? নাকি ওটা মুখোশ?

পায়ে-পায়ে পত্রলোচনের কাছে চলে এসেছিলেন প্রিয়নাথ।

'কী, জোয়ারদারবাবু, কথাবার্তা বলে কিছু লাভ হল?'

প্রিয়নাথ ঠোঁট উলটে বললেন, 'কথাবার্তা তো বললাম, কিন্তু তাতে লাভ হল না ক্ষতি হল সেটাই ঠিকমতো বুঝতে পারছি না...।'

পত্রলোচনের মুখের দিকে খুঁটিয়ে দেখলেন প্রিয়নাথ। পকেট থেকে উইলস ফিলটারের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরালেন।

পত্রলোচনকে সিগারেট অফার করতে তিনি সবিনয়ে বললেন যে, বিড়ি ছাড়া অন্য কিছু ওঁর সয় না।

লম্বা মানুষটার দিকে তাকিয়ে ভূতনাথের মনে পড়ছিল, একটু আগেই জপেশ্বর একে বলেছে 'মহা সেয়ানা' আর 'হাড়ে বজ্জাত'। কিন্তু কেন বলল, তার কারণটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না।

প্রিয়নাথ গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াতেই রমাশঙ্কর গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিলেন।

প্রিয়নাথ ওঁকে বললেন, 'ওই লোকাল লোকটির সঙ্গে এমনি একটু কথাবার্তা বলছিলাম। আপনি ইচ্ছা করলে গিয়ে কথা বলে আসতে পারেন—আমরা ওয়েট করছি...।'

রমাশঙ্কর দত্ত ফোঁস করে একটা শ্বাস ফেললেন। একটু গম্ভীর গলায় বললেন, 'নাঃ, ভেবে দেখলাম তার কোনও দরকার নেই। দরকার হয় তো পরে বলব, এখনও পর্যন্ত তো সেরকম আনন্যাচারাল কোনও ফেনোমেনন দেখতে পাইনি! সেরকম কিছু দেখতে পেলেই ইনভেস্টিগেশান শুরু করে দেব...।'

প্রিয়নাথ আলতো গলায় শুধু বললেন, 'ভালো।'

মিংকি গাড়ির ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, 'ভূতনাথদা, এবার কোন স্পটে যাবেন?'

'চলো, গাড়িতে তো আগে উঠি। তারপর ডিসাইড করব।' সিগারেটে একটা জোরালো টান দিয়ে টাটা সুমোয় উঠে বসলেন।

পত্রলোচন চটপট বিজয় রাধের পাশে বসে পড়লেন।

গাড়ি স্টার্ট দিতেই তৃষ্ণা একটা পলিথিনের ক্যারিব্যাগের মুখ খুলে ফেলল। তারপর তার ভেতর থেকে চারটে প্যাকেট-ব্রেকফাস্ট বের করল। তারই একটা ভূতনাথের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দাদা, আমাদের ব্রেকফাস্ট। চিকেন স্যান্ডউইচ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর ডিমসেদ্ধ। চটপট খেয়ে নিন—বেশ বেলা হয়ে গেছে।'

প্রিয়নাথ প্যাকেটটা নিলেন। সিগারেটটা গাড়ির জানলা দিয়ে ফেলে দিলেন। তারপর ব্রেকফাস্টের প্যাকেটটা খুলতে-খুলতে বললেন, 'ঠিক বলেছ, তৃষ্ণা—আই অ্যাম হাংরি...।'

বাকি তিনটে প্যাকেট মিংকি, রমাশঙ্কর আর পত্রলোচনের কাছে হাতে-হাতে পৌঁছে গেল।

প্রিয়নাথ স্যান্ডউইচে কামড় বসানোর আগে তৃষ্ণাকে জিগ্যেস করলেন, 'তোমরা ঠিকমতো খেয়েছ তো?'

তৃষ্ণা জোর গলায় বলল, 'অফ কোর্স!'

## আট

পত্রলোচনের উপদ্রুত এলাকা ঘুরে সবকিছুই দেখা হল। তিনটে পুকুর, তিনটে প্রাচীন বাড়ি, দুটো পুরোনো মন্দির, আর সবার শেষে নাটমঞ্চ এবং তার লাগোয়া চণ্ডীমণ্ডপ।

দেখে প্রিয়নাথের মনে হল, বাড়ি, মন্দির, নাটমঞ্চ সবই কয়েকশো বছরের প্রাচীন। পত্রলোচনকে জিগ্যেস করে জানা গেল ব্যাপারটা ঠিক তাই। ওঁর ঠাকুরদার ঠাকুরদা, এবং তাঁরও ঠাকুরদা এইসব বাড়ি আর মন্দির তৈরি করেছিলেন। তখন এই চপলকেতুতে পত্রলোচনের বংশের বহু মানুষ বাস করত। বলতে গেলে এই বিশাল মাপের গ্রামটা শুধু সিংহ রায় পরিবারের লোকজনেই গমগম করত।

তখন চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা ছিল। রোজ পুজোর ব্যবস্থা ছিল। ধূপধুনো দিয়ে সন্ধ্যারতি হত, ঢাক বাজত, কাঁসরঘণ্টা বাজত।

প্রত্যেক বাংলা মাসের শেষ শনিবার খুব ধুমধাম করে পুজো হত। গ্রামের সবাই জড়ো হত এই চণ্ডীমণ্ডপে। পুজোর পরে নাচ-গানের আসর বসত নাটমঞ্চে।

সেসব একটা দিন ছিল বটে!

নাটমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে পুরোনো সেইসব দিনের কথা বলছিলেন পত্রলোচন। বাকিরা মনোযোগ দিয়ে ওঁর কথা শুনছিল। যেন কোনও জায়গায় বেড়াতে এসে গাইডের কাছ থেকে সে-জায়গার ইতিহাস শুনছিল সবাই।

নাটমঞ্চ আর চণ্ডীমণ্ডপের একইরকম দুরবস্থা। ক্ষয়ে যাওয়া ভাঙাচোরা পাতলা ইটের কাঠামো। সব জায়গা থেকে প্রেতিনীর চুলের মতো ঝুলে আছে বটগাছের ঝুরি। অসংখ্য পায়রা, চামচিকে আর বাদুড় বাসা বেঁধেছে সেখানে।

মণ্ডপের চারদিকে ইটের পিলার, তার বহু জায়গা ক্ষয়ে গেছে। মাথার ছাদও তেমন—কোথাও আছে, কোথাও নেই। জায়গায়-জায়গায় কড়িবরগার কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে।

চণ্ডীমণ্ডপের প্রতিমার মূর্তি কালো পাথরের তৈরি। আভরণ বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। মুকুটের একটা দিক ভাঙা। একটা চোখের গর্ত ভেঙে বড় হয়ে গেছে। বাঁ-হাতটা কনুই থেকে ভেঙে পড়েছে। দেবীমূর্তির সারা গায়ে সাদা-সাদা আঁচড়ের দাগ। পায়ের কাছে জড়ো হয়ে আছে ছোট-বড় ইট-পাথরের টুকরোর স্তূপ। স্তূপ না বলে সেটাকে ধ্বংসস্তূপ বলাটাই বোধহয় ভালো।

পত্রলোচন ভক্তিভরে প্রতিমাকে প্রণাম করলেন। প্রিয়নাথ, মিংকি, তৃষ্ণাও। রমাশঙ্কর চারপাশটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিলেন। হয়তো কোনও লুকোনো ফাঁকফোকর খুঁজছিলেন। বিনোদকুমারের কানে ইয়ারফোন গোঁজা। সেই অবস্থাতেই ও নানান অ্যাঙ্গেল থেকে দেবী ও মন্দিরের ছবি তুলছিল।

মিংকির দেওয়া ডিভিডিতে ভূতনাথ চণ্ডীমণ্ডপ বা নাটমঞ্চের ছবি দেখেছেন। ফলে বারবারই ওঁর মনে হচ্ছিল, একই জায়গায় যেন দ্বিতীয়বার বেড়াতে এসেছেন।

রাতে এই নাটমঞ্চ থেকে নাকি গানবাজনার শব্দ ভেসে আসে। এর কাছাকাছি অঞ্চল থেকে দু-বছর আগে একজন মানুষ উধাও হয়ে গেছে। তার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি।

প্রিয়নাথ কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে চপলকেতুর ম্যাপটা বের করলেন। সেটা খুলে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর ম্যাপটা ব্যাগে ঢুকিয়ে একটা প্যাড বের করলেন। মিংকির দেওয়া ডিভিডিতে চপলকেতুর এপিসোডটা দেখার সময় এই প্যাডের পাতায় প্রচুর নোটস নিয়েছিলেন। এখন প্যাডের নানান পৃষ্ঠা উলটেপালটে সেইসব নোটস খতিয়ে দেখছিলেন।

মিংকি একটু দূরে একটা পিলারের পাশে দাঁড়িয়ে মোবাইল ফোনের বোতাম টিপে কারও নম্বর লাগাতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও কানেকশান না পাওয়ায় 'শিট', 'শিট' বলছিল।

সময় গড়াতে-গড়াতে বেলা চড়ে গেছে। যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই গনগনে রোদ। চণ্ডীমণ্ডপ আর নাটমঞ্চ ঘিরে বেশ কয়েকটা বড়-বড় গাছ। কিন্তু সেগুলো পেরিয়ে দৃষ্টি মেললেই সবুজহীন ছড়ানো ধু-ধু প্রান্তর। একগাছা ঘাসও নেই—শুধু ধুলো-মাটির মাঠ।

চপলকেতুর 'ভূতুড়ে' এলাকার বেশিরভাগ জায়গাই এইরকম। যেন এ-অঞ্চলের সবুজ ধীরে-ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে। পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার আগে প্রিয়নাথরা এখানে এসে পড়েছেন। তাই কোথাও-কোথাও দু-চার গন্ডা গাছপালা দেখে ফেলেছেন।

প্রিয়নাথ পত্রলোচনের কাছে এলেন। নীচু গলায় জিগ্যেস করলেন, 'এখানে গাছপালার ব্যাপারটা এত কম কেন?'

'জানি না। সেই ছোটবেলা থেকে দেখছি, ক্রমশ সব গাছগাছড়া কমে যাচ্ছে। এভাবে সবুজ কে খেয়ে নিচ্ছে কে জানে!'

'একটা কথা আপনাকে জিগ্যেস করব?'

পত্রলোচন নির্বিকার মুখে বললেন, 'বলুন—।'

'উধাও হয়ে যাওয়া মানুষগুলো কোথায় যায় বলে আপনার মনে হয়?'

এরকম সরাসরি প্রশ্নে পত্রলোচন কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। ওঁর নির্বিকারভাবের মুখোশটা যেন একপলকের জন্য সরে গেল। তারপরই নিজেকে সামলে নিয়ে ঠোঁট উলটে হাত ঘুরিয়ে বললেন, 'আমি কী করে জানব!'

প্রিয়নাথ আড়চোখে লক্ষ করলেন, মিংকি ফোনে লাইন পেয়ে গেছে। ইংরেজি আর হিন্দিতে কারও সঙ্গে কথা বলছে। দু-একটা কথার টুকরো শুনে মনে হল, ওর চ্যানেলের ডিরেক্টর।

পত্রলোচনের দিকে ফিরে তাকালেন প্রিয়নাথ : 'না, মানে...উধাও হওয়ার ব্যাপারে আমি আপনার আইডিয়া জানতে চাইছি...।'

'আমার কোনও আইডিয়া নেই। হয়তো দেবতা ওদের টেনে নিয়েছে...।'

'দেবতা নয়—অপদেবতা।'

এই মন্তব্যে পত্রলোচন কেমন যেন গুম হয়ে গেলেন। নিজেকে গুটিয়ে নিলেন পলকে।

প্রিয়নাথ ওঁর কাছ থেকে সরে এলেন। মিংকি কথা শেষ করে প্রিয়নাথের কাছে এসে দাঁড়াল।

'কী ব্যাপার? ডিরেক্টর কী বলছে?'

'কী আর বলবেন! সেই এক কথা : প্রুফ মিলা কি নহি?'

'ধৈর্য, মিংকি, ধৈর্য। ধৈর্য ধরতে হবে।'

মিংকি তখন চাপা গলায় বলল, 'ভূতনাথদা, আমার মন বলছে কি ওই সিনহা রায় অনেক কিছু জানেন—।'

'অনেক কিছু নয়, উনি সব জানেন। মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন।'

'কুলুপ মানে?'

'হি ইজ কিপিং হিজ মাউথ শাট।'

'ও। কিন্তু তাতে ওঁর কী বেনিফিট?'

'সেটা এখনও বুঝতে পারছি না...।'

রমাশঙ্কর দত্ত কখন যেন প্রিয়নাথদের কাছে চলে এসেছেন। তিনি মিংকিকে লক্ষ করে বললেন, 'মিস তেওয়ারি, কিছু মাইন্ড করবেন না। আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত সুপারন্যাচারাল ব্যাপারের কোনও কংক্রিট প্রুফ পাইনি। নিজের চোখে না দেখলে, নিজে এক্সপিরিয়েন্স না করলে—সে-ব্যাপারটাকে জেনুইন, অথেনটিক বলে অ্যাকসেপ্ট করা মুশকিল। আপনি, মিস্টার জোয়ারদার—আপনারা নিশ্চয়ই প্রুফ জোগাড় করার ব্যাপারে আমাকে হেলপ করবেন। কারণ, তা হলে আপনার ওই প্রোগ্রাম ''তেনারা যেখানে আছেন'' নিশ্চিন্তে রেগুলার টেলিকাস্ট করা যাবে, তাই না?'

মিংকি ভুরু কুঁচকে রমাশঙ্করের দিকে তাকাল : 'হঠাৎ এ-কথা বলছেন!'

'না, মানে, তখন থেকে দেখছি, মিস্টার জোয়ারদার এর-ওর সঙ্গে একা-একা ফুসুরফুসুর করছেন। নানান খোঁজখবর করছেন। অথচ আমাকে কিছু জানাচ্ছেন না। সেইজন্যেই এ-কথা বললাম...।'

প্রিয়নাথ রমাশঙ্কর দত্তের কাছে এগিয়ে এলেন।

মিংকি প্রিয়নাথকে লক্ষ করছিল। ও ভেবেছিল, রমাশঙ্করের কথায় প্রিয়নাথ বোধহয় রেগে যাবেন। কিন্তু সেটা হল না। ও দেখল প্রিয়নাথের ঠোঁটে বরং একচিলতে হাসি।

'মিস্টার দত্ত, আপনি শুরু থেকেই বলে আসছেন, আপনি কংক্রিট প্রুফ চান। প্রুফ ছাড়া আপনি কিছু বুঝতে চান না। আমি যার সঙ্গে যত খুশি ফুসুরফুসুর করি না কেন তাতে তো আর কংক্রিট প্রুফ জেনারেট করা যায় না! সেইজন্যেই ওসব গালগল্প শুনিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি।

'আপনি বলছেন, নিজের চোখে দেখলে কিংবা নিজে এক্সপিরিয়েন্স করলে তবেই আপনি কোনও ঘটনাকে অথেনটিক বলে অ্যাকসেপ্ট করবেন। তা হলে গতকাল রাতে পত্রলোচনবাবুর ঘরের দেওয়ালে ওই ছায়ার ঘটনাটা কী? ওটা আপনি অথেনটিক বলে অ্যাকসেপ্ট করতে পারছেন না কেন?'

কথা বলতে-বলতে প্রিয়নাথ কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন।

রমাশঙ্কর চুপ করে রইলেন—কোনও জবাব দিলেন না।

পত্রলোচন সব কথাবার্তা শুনলেও বরাবরের মতোই ভাবলেশহীন, নির্বিকার।

প্রিয়নাথ একটা বড় শ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনি বরং আপনার মতো করে বুজরুকির প্রমাণ খুঁজুন, আমি আমার মতো। আমরা দুজনে ইনডিপেন্ডেন্টলি কাজ করলে সেটা দুজনের পক্ষেই বেটার, তাই না?'

রমাশঙ্কর এখনও চুপ।

মিংকি প্রিয়নাথকে হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'ভূতনাথদা, কিছু পেলেন?'

'না, মিংকি—এখনও সিরিয়াস কোনও প্রুফ পাইনি। আমি শুধু ভাবছি, মানুষগুলো লোপাট হয়ে তারপর যাচ্ছে কোথায়!'

জপেশ্বরের কাছে শোনা কথাগুলো নীচু গলায় মিংকিকে বললেন। বলতে-বলতে প্রিয়নাথের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

প্রথম পুকুরটা ছাড়া আরও যে-তিনটে পুকুর পত্রলোচনের এলাকায় আছে সেগুলো দেখামাত্রই প্রিয়নাথ বুঝেছেন সেগুলো বহুবছর ব্যবহার করা হয় না। ঘাস, পাতা, আবর্জনায় পুকুরগুলো একেবারে শেষ। তিনটে পুকুরের মধ্যে যেটা সবচেয়ে বড় সেটারই নাম 'চানপুকুর'। তার প্রায় গা ঘেঁষে একটা মন্দির। এককালে

লোকে এখানে স্নান-টান সেরে মন্দিরে পুজো দিত। মন্দিরটা এতটাই ভাঙাচোরা যে, বিগ্রহ বলে কিছু চেনা যায় না। শুধুই ধ্বংসস্তূপ। একদিকের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। ছাদও প্রায় অর্ধেকটা ভাঙা। সেই ফাঁক দিয়ে গাছের পাতা আর আকাশ উঁকি মারছে।

অন্য মন্দিরটা আর পত্রলোচনের বাকি তিনটে বাড়িও খুঁটিয়ে দেখেছেন ভূতনাথ। ওরা যে ভীষণ পুরোনো এবং জরাজীর্ণ এ ছাড়া ওদের আর কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। না, বাড়িগুলোর ভেতরে প্রিয়নাথ ঢোকেননি। কারণ, ভূত-প্রেত নিশ্চয়ই প্রিয়নাথের অপেক্ষায় ভেতরে এখন বসে নেই! তা ছাড়া বাইরেটা দেখেই ভেতরের অবস্থা বোঝা যাচ্ছে।

মিংকিদের ডিভিডিতে এগুলোর চেহারা বেশ ডিটেলে দেখানো হয়েছে—তবে সবটাই বাইরে থেকে। আর এই বাড়ি তিনটে, দুটো মন্দির, এগুলো যে 'হন্টেড' সেরকম কথা ওদের এপিসোডে বলা হয়নি।

প্রিয়নাথের কপাল থেকে চিন্তার ভাঁজগুলো যাচ্ছিল না। ওঁর বারবার মনে হচ্ছিল, চপলকেতুর ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ে পত্রলোচনের বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা নেই। দিব্যি আছেন। যারা এই এলাকার আশপাশের পড়শি তারাও যেন ব্যাপারটার সঙ্গে নিজেদের রোজকার জীবন মানিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ, এখানকার ভূতুড়ে ব্যাপারস্যাপার নিয়ে কারও কোনও অনুযোগ-অভিযোগ নেই। সবকিছুই নিজের নিয়মে চলছিল।

কিন্তু হঠাৎই গোলমাল বাধাল মিংকি তেওয়ারিদের 'রেনবো' চ্যানেল। ওদের লোকজন এসে শান্ত ঘুমন্ত এলাকাটাকে খোঁচাখুঁচি শুরু করল। এখন কী হয় কে জানে! কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা বলা মুশকিল। কারণ, ভূতনাথ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, উপদ্রুত এলাকা যখন শান্ত থাকে তখন তাকে ডিসটার্ব করলে উপদ্রব বাড়ে। 'ঘুমন্ত' টিউমারকে ছুরি-কাঁচি দিয়ে ডিসটার্ব করলে যেমন সমস্যা বেড়ে যায়।

গতকাল রাতে দেখা ছুটন্ত ছায়ার কথাও ভাবছিলেন। সেটা যে চপলকেতুর 'হন্টিং'-এর একটা নমুনা তা নিয়ে প্রিয়নাথের মনে কোনও সন্দেহ নেই। মিংকিদের এপিসোডে এইরকম ছুটন্ত ছায়ার কথা বলা আছে। সন্ধের মুখে বেশ কয়েকবার দেখা গেছে। খোলা মাঠে। লোকাল লোকজনরা দেখেছে। এই ছুটন্ত ছায়ার কথাই জপেশ্বর মালিক বলছিল।

এমন সময় গাড়িতে ওঠার ডাক পড়ল। লাঞ্চের সময় অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে। লাঞ্চ সেরে এসে আবার ঘোরাঘুরি করা যাবে।

পত্রলোচনকে ওঁর বাড়ির সামনে নামিয়ে দিয়ে টাটা সুমো পাকা রাস্তার দিকে ছুটল। প্রিয়নাথ ব্যাগ থেকে একটা ছোট বাইনোকুলার বের করে চোখে দিলেন। ছুটন্ত গাড়ির জানলা দিয়ে তিনি খোলা প্রান্তরের দিকে দেখছিলেন।

বহু দূরে তিনি দুজন মানুষকে দেখতে পেলেন। দুজনের চেহারাই কালো, রোগা। একজন লম্বা, একজন বেঁটে। একজনের গায়ে সাদাটে হাফশার্ট, আর-একজনের গায়ে গামছা ছড়ানো। ওরা খোলা মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। রাস্তা শর্টকাট করছে।

খোলা মাঠ থেকে কেমন করে উধাও হয়ে যায় মানুষ? গোরু-ছাগল? কোথায় যায়? চোখের সামনে এইরকম উধাও হওয়ার ঘটনা ঘটলে প্রিয়নাথ কি সে-রহস্য ভেদ করতে পারতেন?

যতক্ষণ দেখা যায়, দূরবিন তাক করে লোক দুটোকে দেখতেই থাকলেন প্রিয়নাথ।

লাঞ্চ সেরে ফিরে আসার পর সকলেরই এনার্জি বেশ কমে গেছে বলে মনে হল। বিনোদকুমার তো গাড়িতে ঘুমিয়েই পড়ল। দেখে মনে হচ্ছিল, কানে ইয়ার প্লাগ গুঁজে ও চোখ বুজে মনোযোগ দিয়ে গান শুনছে। কিন্তু তৃষ্ণা কী কারণে ওকে দুবার ডাকতেই ঘুমের ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেল। ও চমকে জেগে উঠে বেশ লজ্জা পাওয়া চোখে এর-ওর দিকে তাকাল। মিনমিনে গলায় বলল যে, পেট ভরে খাওয়ার পর ওর চোখ লেগে গিয়েছিল।

রমাশঙ্কর একটু বেশিরকম চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। শুধু একবার প্রিয়নাথকে বললেন যে, তিনি পত্রলোচনের ঘরের দেওয়ালটা আরও একবার ভালো করে পরীক্ষা করতে চান। প্রিয়নাথ কি তখন ওঁর সঙ্গে থাকতে চান?

প্রিয়নাথ তখন সিগারেটে টান দিতে ব্যস্ত। রমাশঙ্করের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে জানালেন, না তিনি থাকতে চান না।

রমাশঙ্কর তখন পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে বোতাম টিপতে শুরু করলেন। কয়েকবার চেষ্টা করে বিরক্ত হয়ে বললেন, 'কী যে আন্ডারডেভেলাপড জায়গা! একটুও টাওয়ার পাচ্ছি না—।'

কেউ কোনও কথা বলল না।

মিংকি ঘুমের টানে বারবারই প্রিয়নাথের গায়ে ঢলে পড়ছিল। প্রিয়নাথ শুধু খেয়াল রাখছিলেন, ওর মাথাটা কোথাও যেন ঠুকে না যায়।

পত্রলোচনের বাড়ির কাছে এসে বিজয় রাধে গাড়িটাকে বাড়ির পাশ দিয়ে নিয়ে গেল পিছনদিকে। প্রিয়নাথ, মিংকি আর রমাশঙ্কর নেমে পড়লেন গাড়ি থেকে। বিজয়ও গাড়ি থেকে নেমে পড়ল। তারপর বড়-বড় দুটো ভারী পলিব্যাগ নিয়ে রেখে দিল প্রিয়নাথদের ঘরের দরজায়।

একটা পলিব্যাগে রয়েছে ছ'টা এক লিটারের জলের বোতল, বেশ কয়েকটা মোমবাতি আর দেশলাইয়ের বাক্স। আর অন্য পলিব্যাগটায় স্লাইস কেক আর বিস্কুটের তিনটে করে প্যাকেট।

বিনোদকুমার আর তৃষ্ণা গাড়ি থেকে নামেনি। বলল, ভীষণ এগজস্টেড লাগছে। প্রিয়নাথ আর মিংকিকে সাবধানে থাকার পরামর্শ দিয়ে ওরা 'টা-টা' করে বিদায় নিল।

ওরা চলে যাওয়ার পর প্রিয়নাথরা যার-যার রসদ ভাগ করে নিয়ে নিজের-নিজের ঘরে ঢোকালেন।

রমাশঙ্কর বহুবার বোতাম টিপে-টিপে চেষ্টা করে হঠাৎই টাওয়ার পেয়ে গেছেন। তাই মোবাইল ফোন কানে লাগিয়ে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে ওঁর সোসাইটির কারও সঙ্গে বোধহয় কথা বলছিলেন। সেটা দেখে মিংকি 'ভূতনাথদা, টাওয়ার আছে' বলে একেবারে লাফিয়ে উঠল। জিনসের পকেট থেকে মোবাইল বের করে বোতাম টিপতে শুরু করল।

প্রিয়নাথ আবছা হাসলেন। সকালে মিংকি বেচারা অনেক চেষ্টা করেও মা-কে ফোন করতে পারেনি। টাওয়ারের সিগন্যাল ছিল না।

সে নিয়ে ও অনেকবার ভূতনাথের কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করেছে। তখন তিনি মজা করে বলেছেন, 'ভূতেরা ওদের গোস্ট সিগন্যাল দিয়ে মোবাইল টাওয়ারের সব সিগন্যাল জ্যাম করে দিয়েছে...।'

ঠাট্টা করে বললেও ব্যাপারটা যে অনেক সময় সত্যি-সত্যি হয়ে যায় সেটা ভূতনাথ ভালো করেই জানেন। দেখা গেল, মিংকি এখনও টাওয়ার পেল না।

'দেখছ তো, মোবাইল ফোনের টাওয়ারের ইর‍্যাটিক ব্যাপারটা এক-এক জনের জন্যে এক-একরকম...।'

'হুঁ, তাই তো দেখছি।'

মিংকি মুখ গোমরা করে ওর ঘরের দিকে চলে গেল।

প্রিয়নাথও নিজের ঘরের দিকে হাঁটা দিলেন।

একটু পরে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে প্রিয়নাথ আবার ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালেন। আকাশের দিকে একবার তাকালেন। সেখানে ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘ। কোথাও ছাই রঙা, কোথাও সাদা। তারই ফাঁকে-ফাঁকে শরতের নীল।

হাতঘড়ির দিকে তাকালেন। চারটে কুড়ি। দুপুরের কড়া রোদে যে-মাঠ আর গাছপালাকে অনেক রুক্ষ কঠিন দেখাচ্ছিল, এখন তুলনায় অনেক কোমল।

শেষ বিকেলে যেসব মাঠ-প্রান্তর থেকে মানুষজন উধাও হয়ে যায়, সেগুলো পড়ন্ত বিকেলে একবার ঘুরে দেখা দরকার। তা ছাড়া কাল রাতে হিমকুয়াশার পিণ্ডটাকে প্রথম যেখানটায় দেখা গিয়েছিল সে জায়গাটাও

একবার খুঁটিয়ে পরখ করা দরকার।

সেইজন্যই প্রিয়নাথ তৈরি হয়ে বেরিয়েছেন। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ। তাতে ভূতশিকারির অস্ত্রশস্ত্র।

মিংকির জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। মিংকি যদি ওঁর সঙ্গে যেতে চায়।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মিংকি ফ্রেশ হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

'এ কী, ভূতনাথদা! আবার কোথায় চললেন?'

ভূতনাথ হেসে ওকে বললেন, তিনি এখন কোথায় যেতে চান, কী করতে চান। মিংকি যদি চায় তা হলে ওঁর সঙ্গী হতে পারে।

'আমি আপনার সঙ্গেই যাব। নইলে একা-একা থাকলে আমার কেমন আপসেট লাগবে...।'

'আপসেট মানে? ভয় করবে?'

মিংকি কপট রাগে ভূতনাথের দিকে তাকাল : 'কেন চাটছেন, ভূতনাথদা!'

প্রিয়নাথ হাসলেন। তারপর, ব্যস, দুজনে হাঁটা দিলেন।

প্রিয়নাথের মনে হচ্ছিল, গাড়ি করে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে পায়ে হেঁটে ঘুরে বেড়ানোটা অনেক ভালো।

মিংকিকে কথাটা বলতে ও-ও সায় দিল।

ওরা দুজনে উদ্দেশ্যহীনভাবেই হাঁটা দিল।

সামনের দিকে তাকালে কিছু-কিছু গাছপালা, আর বেশিরভাগই খোলামেলা প্রান্তর। বিকেলের পড়ন্ত রোদে কেমন যেন ধূসর ও শান্ত দেখাচ্ছে।

এলোমেলোভাবে অনেকটা পথ হেঁটে বেড়ালেন ভূতনাথ। পথ চলতে-চলতে মাটির দিকে তাকিয়ে তার চরিত্রটা খুঁটিয়ে দেখতে চাইছিলেন। জায়গায়-জায়গায় মাটির বাঁধন ঢিলে ধুলোময়—পলিমাটি শুকিয়ে গেলে যেমনটা দেখায়।

সেই জায়গাগুলো পা দিয়ে খুঁচিয়ে দেখলেন। বেশ কয়েক জায়গায় জোরে-জোরে পা ঠুকলেন। কিন্তু সেরকম কোনও শব্দ হল না।

মিংকি জিগ্যেস করল, 'পা ঠুকে-ঠুকে কী দেখতে চাইছেন, ভূতনাথদা?'

ভূতনাথ হাসলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন : 'দেখছি না—শুনতে চাইছি। মাঠ থেকে উধাও হয়ে যাওয়া মানুষগুলো কোথায় যায়, সেটাই বুঝতে চাইছি।'

'কোথায় আর যাবে, ভূতনাথদা! ব্যস, দো হি তো জাগা হ্যায় : ইয়া তো উপর, নহি তো নীচে...।'

ঠিক সেই মুহূর্তে একটি লোককে দেখতে পেলেন। অনেকটা দূরে একটা কালো অবয়ব। ভূতনাথদের দিকেই হেঁটে আসছে।

এতদূর থেকে দেখেও বোঝা যাচ্ছিল, সে এখানকারই বাসিন্দা। শর্টকাটের লোভে খুব তাড়াতাড়ি পা ফেলে উপদ্রুত অঞ্চল ডিঙিয়ে যাচ্ছে।

লোকটির দিকে বেশ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে ছিলেন ভূতনাথ। মনে-মনে কল্পনা করার চেষ্টা করছিলেন, হঠাৎ করে উধাও হয়ে যাওয়ার অলৌকিক ঘটনাগুলো ঠিক কীভাবে ঘটেছিল।

এমনসময় একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভূতনাথ আর মিংকি তেওয়ারিকে পাথর করে দিল।

সূর্য ডুবে গিয়ে তখন গোধূলি। কনে-দেখা-আলো ছড়িয়ে গেছে চারিদিকে। ঘরে ফেরা পাখি শিস দিয়ে সঙ্গীসাথীদের ডেকে নিচ্ছে আস্তানায়। একটা বাঁকা চাদ আবছাভাবে উঠে পড়েছে আকাশে। সবমিলিয়ে চারদিকে কোমল প্রশান্তি।

হঠাৎই জোরে বাতাস বইতে শুরু করল।

হেঁটে আসা লোকটির চার-পাঁচ হাত পিছনে মাটিতে আচমকা একটা নিঃশব্দ বিস্ফোরণ ঘটে গেল যেন। রকেটের মতো কিছু একটা মাটি ফুঁড়ে ছিটকে উঠল শূন্যে। ধুলো-মাটি মাখা ভীষণ রোগা একটা চেহারা। চোখের জায়গায় দুটো কালো অন্ধকার গর্ত। এ ছাড়া মাথা থেকে পা পর্যন্ত ধুলোয় ধুলোময়।

কঙ্কালসার ধূসর চেহারাটা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে মাটির তলা থেকে। আর তার সঙ্গে তুবড়ির মতো ঠিকরে লাফিয়ে উঠেছে ধুলোর ফোয়ারা। বাতাস সেই ধুলোর ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে অন্য দিকে।

ধুলোমাখা অপার্থিব অবয়বটা দু-লাফে পৌঁছে গেল হেঁটে যাওয়া নিরীহ মানুষটার পিছনে। চোখের পলকে তাকে মরণ-বাঁধনে জাপটে ধরল। তারপর এক লাফে সেঁধিয়ে গেল মাটির ভেতরে। তার অদৃশ্য হওয়ার সাবলীল ভঙ্গি দেখে মনে হল, সে মাটিতে নয়, জলের ভেতরে তলিয়ে গেল।

মিংকি একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল। ভাঙা গলায় কোনওরকমে চেঁচিয়ে বলল, 'ভূতনাথদা! ভূতনাথদা! এ কী দেখছি! আভি-আভি ইয়ে কেয়া হুয়া?'

ভূতনাথ ততক্ষণে অকুস্থল লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করেছেন। মিংকির কথার কোনও জবাব দিলেন না।

মোটা শরীর, বয়েসের ভার আর ঝোলা ব্যাগ নিয়ে ভূতনাথ মোটেই জোরে ছুটতে পারছিলেন না। ফাঁকা মাঠের ওপরে মিংকি একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছিল না। তাই নিজেকে সামলে নিয়েই ও ভূতনাথের পিছু নিল। এবং খুব সহজেই ওঁকে ধরে ফেলল।

দশ-বারো সেকেন্ডের মধ্যে স্পটে পৌঁছে গেল ওরা।

না, সেখানে ঝুরো ধুলো-মাটি ছাড়া আর কোনও চিহ্ন নেই। ওই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা যেখান থেকে মাটি ফুঁড়ে উঠেছে, আর যেখানে ও লোকটাকে নিয়ে সেঁধিয়েছে, সে-দুটো জায়গায়ই শক্তপোক্ত—কোনও গর্ত-টর্ত সেখানে নেই।

ভূতনাথ চকিতে বসে পড়ে জায়গা দুটো ভালো করে পরখ করে দেখলেন। আঙুল বাঁকিয়ে জায়গা দুটো খোঁড়াখুঁড়ির চেষ্টা পর্যন্ত করলেন। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। জায়গা দুটো মাঠের আর পাঁচটা জায়গার মতোই স্বাভাবিক।

শুধু একটা ব্যাপার ভূতনাথকে চমকে দিল।

দুটো জায়গার ঝুরো মাটিই বরফের মতো ঠান্ডা। ঠিক পত্রলোচনের ঘরের দেওয়ালটার মতো।

ভূতনাথ থরথর করে কাঁপছিলেন। ওঁর মাথার শিরা দপদপ করছিল।

আলো কমে এসেছিল। তাই ঝোলা ব্যাগ থেকে টর্চ বের করলেন। মাটিতে টর্চের আলো ফেলে তন্নতন্ন করে দেখলেন। নাঃ, কোনও সূত্র নেই, কোনও চিহ্ন নেই। ঝোলা থেকে নিডল কম্পাস বের করে চৌম্বকক্ষেত্রের হালচাল দেখতে চাইলেন। সেটা দেখতে গিয়ে চৌম্বক ক্ষেত্রের ভালোরকম পাগলামি লক্ষ করলেন।

মিংকি প্রিয়নাথের খুব কাছ ঘেঁষে উবু হয়ে বসে পড়েছিল। ও প্রিয়নাথের একটা বাহু আঁকড়ে ধরে ছিল। ওর শরীরের ছোট-ছোট কাঁপুনি প্রিয়নাথ টের পাচ্ছিলেন।

কোনও কিছুর হদিস করতে না পেরে প্রিয়নাথ শেষমেশ উঠে দাঁড়ালেন। তার সঙ্গে মিংকিও।

তখনই ওরা দৌড়োদৌড়ির শব্দ শুনতে পেল। অনেকগুলো পা দৌড়োচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে খেয়াল করার পর প্রিয়নাথ বুঝতে পারলেন, শব্দটা আসছে মাটির তলা থেকে।

প্রিয়নাথের হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এল।

তা হলে কি শিকার ধরার পর মাটির নীচে হুল্লোড় চলছে!

কারা আছে মাটির নীচে?

আজ এক্ষুনি যা দেখলেন সেটাই কি ফাঁকা মাঠ থেকে মানুষ উধাও হওয়ার আসল রহস্য?

অন্ধকার ঘন হচ্ছিল। জোরালো হচ্ছিল চাঁদের আলো। চাঁদের দিকে একবার তাকিয়ে মিংকির হাত ধরে টান মারলেন প্রিয়নাথ : 'মিংকি, চলো, লোচনবাবুর ওখানে ফিরে যাই। এই অন্ধকারে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকাটা সেফ নয়। লেটস গো ব্যাক।'

ছুটন্ত পায়ের শব্দ তখনও শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল। সেই শব্দ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য মিংকি ভেতরে-ভেতরে ছটফট করছিল। ও ভাঙা গলায় হোঁচট খেয়ে বলল, 'এখানে...এখানে আর নয়, কলকাতায়

ফিরে চলুন, ভূতনাথদা!'

মিংকির গলায় এমন একটা আর্তি ছিল যে, ভূতনাথ ওর মুখের দিকে তাকালেন।

মেয়েটা সত্যিই খুব ভয় পেয়েছে! কিন্তু ভূতনাথ নিজেও কি ভয় পাননি?

পত্রলোচনের বাড়ির দিকে ফিরে যেতে-যেতে ঠান্ডা বাতাস টের পেলেন। মনে হচ্ছিল যেন বাতাসটার মধ্যেও ভয় মিশে আছে।

কাল রাতের কুয়াশার কথা মনে পড়ে গেল। মাঠের সে-জায়গাটা পরখ করে সন্দেহজনক কিছু খুঁজে পাননি। ওই কুয়াশা কি পাতাল থেকে উঠে আসছিল? নাকি রমাশঙ্কর দত্তের কথাই ঠিক : সব ঘটনারই সায়েন্টিফিক এবং লজিক্যাল এক্সপ্ল্যানেশন আছে।

কিন্তু তাই যদি সত্যি হবে, তা হলে একটু আগে দেখা ওই মর্মান্তিক ঘটনার লজিক্যাল অ্যান্ড সায়েন্টিফিক এক্সপ্ল্যানেশন কী?

রমাশঙ্কর দত্তকে ভয়ঙ্কর ঘটনার কথা বলে কোনও লাভ নেই—কারণ, তিনি এর একটি বর্ণও বিশ্বাস করবেন না। উনি তো স্পষ্ট বলেই দিয়েছেন, নিজের চোখে না দেখলে বা নিজে এক্সপিরিয়েন্স না করলে কোনও ঘটনাকেই তিনি ভৌতিক কিংবা অলৌকিক বলে মেনে নেবেন না।

মিংকির সঙ্গে এসব কথা আলোচনা করছিলেন প্রিয়নাথ আর তাড়াতাড়ি পা চালাচ্ছিলেন। চলার সুবিধের জন্য টর্চের আলো জ্বেলেছিলেন।

মিংকি বলল, 'ভূতনাথদা, আমার খুব ভয় করছে। দিস প্লেস ইজ হন্টেড লাইক এনিথিং। রমাশঙ্করবাবু মানুক ইয়া না মানুক—এখানে আমি আর থাকতে চাই না। আমার এখনও বুক ধড়ফড় করছে।'

ভূতনাথ কী একটা চিন্তায় ডুবে গিয়েছিলেন। মিংকির কথায় ভেসে উঠলেন। বললেন, 'মিংকি, আজকের রাতটা খুব কেয়ারফুলি কাটাও। মাঠের ব্যাপার কাউকে কিচ্ছু বোলো না। পত্রলোচনবাবুকে আমি যা বলার বলব। আর দেখি, কাল ফেরার ব্যবস্থা করা যায় কি না। আমার মন বলছে, পত্রলোচন এসব ব্যাপারে অনেক কিছুই জানেন। আমাদের সামনে মুখ খুলবেন না। তাই স্রেফ ন্যাকা সেজে আছেন...।'

'মে বি য়ু আর রাইট, ভূতনাথদা—।' মিংকি জোর দিয়ে বলল।

ততক্ষণে ওরা পত্রলোচনের বাড়ির কাছে এসে গেছে।

## নয়

পরদিন সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ টাটা সুমো সবাইকে নিয়ে পত্রলোচনের এলাকার হালহকিকত আবার খতিয়ে দেখতে বেরোল।

শুরু থেকেই রমাশঙ্কর দত্ত একটু উশখুশ করছিলেন। কপালের বিরক্তির ভাঁজগুলো তেজ এবং সংখ্যায় বেশ বেড়ে গেছে। চশমার ডাঁটিতে হাত দিয়ে চশমাটাকে বারবার সেট করছিলেন। আর মাঝে-মাঝে আড়চোখে ভূতনাথের দিকে তাকাচ্ছিলেন।

তৃষ্ণা আর মিংকি নিজেদের মধ্যে টিভি চ্যানেল আর ফিলম নিয়ে কীসব বলাবলি করছিল আর মাঝে-মাঝেই হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। চব্বিশ-পঁচিশ চিরকাল যেমনটা হয় আর কী!

বিনোদকুমার একবার তো বিরক্ত হয়ে বলেই ফেলল, 'ফর গডস সেক! শাট আপ য়ু গাইজ। হাসির ট্যাবলেট খেয়েছ নাকি?'

তৃষ্ণা বিনোদের হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বলে উঠল, 'হ্যাঁ—খেয়েছি। তুমিও একটা খাবে নাকি, গোমরাথেরিয়াম?'

'গো-গোম...। হোয়াট ইজ দ্যাট?' বিনোদকুমার লাইফে কখনও এইরকম শব্দ শোনেনি। তাই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে জিগ্যেস করল।

'ইট উইল বি টাফ ফর য়ু, বাডি। ওটা সুকুমার রায়ের লেখা ''জুরাসিক পার্ক''-এর অ্যানিম্যাল...।' মিংকি হাসতে-হাসতে বলল।

বিনোদকুমারের মুখ দেখে বোঝা গেল ও কিছুই বোঝেনি। তার ওপরে ওর সহকর্মী দুজন আবার হাসিতে ভেঙে পড়েছে। তাই বেচারা ঠোঁট উলটে মুখের একটা ভঙ্গি করল। তারপর ওর আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হিসেবে দু-কানে ইয়ার-প্লাগ গুঁজে দিল।

পত্রলোচন আজ আর ওঁদের সঙ্গী হননি। প্রিয়নাথরাও ওঁকে সেরকমভাবে আর জোর করেননি। পত্রলোচন না থাকায় রমাশঙ্কর বিজয় রাধের পাশে বসেছেন। পিছনের সিটে প্রিয়নাথ জোয়ারদার একা হাত-পা ছড়িয়ে বসেছেন। আর ব্যাক ভেহিকল কিউবিকল-এ তৃষ্ণা, মিংকি এবং বিনোদকুমার।

গাড়ি রুক্ষ মাঠের ওপর মেঠো পথ ধরে ধীরে এগোচ্ছিল। গোরুর গাড়ি আর লোকজন চলাচল করে এই মেঠো পথটা মাঠের থেকে চরিত্রে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছে।

বিজয় রাধে রিয়ার ভিউ মিরারে তাকিয়ে প্রিয়নাথকে লক্ষ্য করে জিগ্যেস করল, 'কোনদিকে যাব, স্যার?'

জবাব দিলেন রমাশঙ্কর, 'আমরা ওই পুকুর পেরিয়ে ছোট গ্রামটার কাছে যাব—কাল যে-পুকুরটার কাছে ফার্স্টে গেছিলাম...।'

প্রিয়নাথ কিছু একটা বলতে গিয়েও বললেন না। মিংকি, তৃষ্ণা ওদের এসব কথায় কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। ওদের মধ্যে টুরিস্টের মুডটাই ফুটে উঠেছে। তবে মিংকির মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে প্রিয়নাথের যেন মনে হল, ও গতকাল বিকেলের স্মৃতিটাকে প্রাণপণে ভুলতে চাইছে।

চলতে-চলতে গাড়িটা পুকুরের পাশে চলে এসেছিল। প্রিয়নাথ রমাশঙ্করকে বললেন, 'মিস্টার দত্ত, এখানে গাড়ি রাখলে আপনার কি অসুবিধে হবে? কারণ, উটকো ঝামেলা এড়াতে পত্রলোচনবাবুর এলাকার মধ্যেই গাড়ি রাখা ভালো...।'

রমাশঙ্কর কাটা-কাটা উত্তর দিলেন, 'আমার কোনও প্রবলেম নেই।'

বিজয় রাধে সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি থামিয়ে দিয়েছে। এবং গাড়ির রেডিয়ো অন করে গান শুনতে শুরু করেছে।

ওঁরা সবাই একে-একে গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। তারপর এদিক- ওদিক ছড়িয়ে পড়তে লাগলেন। বিনোদকুমার ওঁদের ঘোরাফেরা আর কথাবার্তার ছবি তুলে রাখতে লাগল।

প্রিয়নাথ খুব মনোযোগ দিয়ে মাঠের চেহারা দেখছিলেন। উবু হয়ে বসে পকেট থেকে ডিজিটাল ক্যামেরা বের করে মাঠের চরিত্রের ফটো তুলছিলেন। ওঁকে দেখে মনে হচ্ছিল, কোনও ক্রিকেট টিমের ক্যাপ্টেন যেন একটা মরণ-বাঁচন খেলার আগে খুঁটিয়ে পিচ পরীক্ষা করছেন।

মিংকি তৃষ্ণাকে ছেড়ে ভূতনাথের কাছে এগিয়ে এল। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'ভূতনাথদা, এনি সাইন?'

প্রিয়নাথ আনমনাভাবে কখন যেন একটা উইলস ফিলটার ধরিয়ে ফেলেছেন। ধোঁয়া ছেড়ে মিংকির দিকে মুখ তুলে তাকালেন। মাথা নাড়লেন এপাশ-ওপাশ। না, গতকাল বিকেলের কোনও চিহ্ন নেই।

শুকনো মাঠের ওপরে সরু-সরু ফাটলের দাগ। সেদিকে তাকিয়ে প্রিয়নাথ যেন কল্পনায় দেখতে পেলেন, দাগগুলো চওড়ায় বড় হচ্ছে। বড় হতে-হতে অন্ধকার অতল খাদের চেহারা নিচ্ছে।

'মিস্টার সিনহা রয়কে কালকের কেস কিছু বলেছেন নাকি?' মিংকি জানতে চাইল।

'নাঃ, এখনও দোনামনায় আছি—।'

'দোনামনা মানে?' মিংকির ভুরু কুঁচকে গেল।

ওর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললেন প্রিয়নাথ : 'দোনামনা মানে ইন টু মাইন্ডস...।'

'ও—। তো কখন বলবেন? আপনিই তো কাল বললেন, পত্রলোচনবাবু পসিবলি অনেক কিছু জানেন।'

'হুঁ। কিন্তু ওঁকে কিছু জিগ্যেস করার আগে আমি আর-একটু ভাবতে চাই...।'

হঠাৎই প্রিয়নাথের চোখ গেল রমাশঙ্করের দিকে। বাঁ-হাতে ওঁর ব্যাগ ঝুলছে। ডানহাতে ব্যস্ত মোবাইল ফোন : হয়তো কারও সঙ্গে কথা বলছেন কিংবা কথা বলার চেষ্টা করছেন। তবে একইসঙ্গে ভদ্রলোক পুকুর পেরিয়ে গ্রাম লক্ষ্য করে হেঁটে চলেছেন।

গ্রামের দিকে থেকে গোরুর 'হাম্বা' রব ভেসে এল। ফাঁকা জায়গা বলে বহু দূরের শব্দও বেশ শোনা যায়। কুঁড়েঘরগুলোর পাশ ঘেঁষে কয়েকজন মানুষকে হেঁটে যেতে দেখা গেল। পুকুরটায় আজ কেউ বাসন মাজছে না কিংবা স্নান করছে না।

রমাশঙ্কর দত্ত গ্রামের মানুষগুলোর কুঁড়েঘর আর সবজি-বাগানের কাছে পৌঁছে গেলেন।

প্রিয়নাথ রমাশঙ্করের অস্থির অবস্থাটা বেশ বুঝতে পারছিলেন। তিনি সেক্রেটারি হিসেবে 'যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি'-র হাতে এখনও পর্যন্ত কোনও সলিড প্রমাণ তুলে দিতে পারেননি। তাই বেশ চাপে আছেন। গতকাল প্রিয়নাথকে তিনি জপেশ্বর মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে দেখেছেন। কালই যদি রমাশঙ্কর গাঁয়ের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের ঘটা দেখাতেন তা হলে 'দুষ্ট' লোকে বলত, তিনি ভূতনাথকে 'কপি' করছেন। তা ছাড়া একদফা জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে যাওয়ার পর লোকজন সতর্ক হয়ে যায়, তাদের মধ্যে রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়।

রমাশঙ্কর ভাবেননি, চপলকেতুর বুজরুকি ফাঁস করতে এত সময় লাগবে। এর প্রধান কারণ, পত্রলোচন সিংহ রায় মানুষটা অত্যন্ত ধুরন্ধর— অন্তত রমাশঙ্করের তাই ধারণা। তা ছাড়া আজ সকালে চায়ের আসরে প্রিয়নাথ জোয়ারদারকে দেখে ওঁর মনে হয়েছে, প্রিয়নাথ কিছু একটা আড়াল করতে চাইছেন। মিংকি তেওয়ারি নামের মেয়েটার সঙ্গে মাঝেমধ্যেই কীসব ইশারা করছেন।

গ্রামে ঢুকে হাতের কাছেই একজন যুবককে পেয়ে গেলেন রমাশঙ্কর। যুবকটির নাম সাতকড়ি জানা— ডাকনাম সাতু। বয়েস সাতাশ-আটাশ। জমি চাষবাস করে পেট চালায়। ওর হাতে একটা দড়ির লাছি।

কাল এ-গ্রামে খোঁজখবর করার সময় প্রিয়নাথ যে কোল্ড স্টোরেজ খোলার গল্প ফেঁদেছেন সেটা রমাশঙ্কর জানেন। কারণ, রাতে খাওয়ার সময় প্রিয়নাথ কথায়-কথায় পত্রলোচনকে ব্যাপারটা বলছিলেন।

সাতুর সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন রমাশঙ্কর।

'এখানে একটা বড়সড়ো কোল্ড স্টোরেজ খোলার কথা ভাবছি আমরা। তাই...তাই জমি দেখতে এসেছি...।'

সাতকড়ি জানা চুপ। শুধু আপনমনে দড়ির লাছিটা নাড়াচাড়া করছে।

ছেলেটার খালি গা। স্বাস্থ্যবান। মাথায় তরুণ বয়েসের ঝাঁকড়া চুল। ভাঙা গাল। বাঁ-কাঁধে একটা বড় কাটা দাগ।

ওর পায়ে ময়লা প্যান্ট। তার নীচের দিকটা প্রায় হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। দু-পা এবং পায়ের হাওয়াই চপ্পল কাদায় মাখামাখি। এমনকী প্যান্টের অনেক জায়গাতেও কাদা লেগে আছে।

সাতুকে চুপ করে থাকতে দেখে রমাশঙ্কর ওকে উসকে দিতে চাইলেন।

'পত্রলোচন সিংহ রায়কে চেনো?'

'হ্যাঁ—' মাথা হেলাল সাতু : 'জমিদার মানুষ।'

তারপরই আবার চুপ।

'ওঁর জমিতেই আমাদের কোল্ড স্টোরেজটা করব ভাবছি...।'

'ওনার অনেক জমিজমা—তবে চাষবাস হয় না।'

রমাশঙ্কর যেন ব্যাটসম্যানের ব্যাট আর উইকেটের মধ্যে ফাঁক দেখতে পেলেন। সঙ্গে-সঙ্গে একটা জোরালো ইন সুইংগার ছুড়ে দিলেন।

'কেন, কেন? চাষবাস হয় না কেন?'

সাতু জানা এদিক-ওদিক তাকাল—যেন কাউকে খুঁজছে।

চারপাশে ঝকঝকে রোদ। গাছগাছালি আর কুঁড়েঘরের গাঢ় ছায়া। একটা ছাগলছানার ডাক শোনা গেল। দূরে চারটে হাঁস হেলেদুলে হেঁটে চলেছে। মাথার ওপরে নীল আকাশ। সেখানে ছোট-ছোট তুলোর ডেলার মতো মেঘ যেন আঠা দিয়ে লাগানো।

রমাশঙ্কর সাতকড়ির মুখ খোলার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু ছেলেটা মুখে কুলুপ এঁটে দাঁড়িয়ে—যেন সেও অপেক্ষা করছে।

রমাশঙ্কর আবার জোরালো বল দিলেন : 'পত্রলোচনের জমিতে মনে হয় কোনও গণ্ডগোল আছে।'

'আছে তো!' মাথা ঝাঁকাল সাতু জানা।

'কী গণ্ডগোল?' রমাশঙ্কর এতক্ষণে ধৈর্যের খাদের কিনারায় এসে পড়েছেন।

'কাল তো জপেশ্বরদাদার কাছে সব শুনেছেন। তাইলে আবার জিগাস করছেন কেন?' আচমকা মন্তব্য করল সাতু। সব-ধরে-ফেলেছে এমন নজরে তাকিয়ে রইল রমাশঙ্করের দিকে।

রমাশঙ্কর জপেশ্বরের নামও শোনেননি, তার গল্পও শোনেননি। কিন্তু বুঝতে পারলেন সাতু কী বলতে চাইছে।

তাই সাততাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, 'ওই টাকমাথা ভদ্রলোক আমার বিজনেসের পার্টনার—' আঙুল তুলে দূরে দাঁড়ানো প্রিয়নাথের দিকে ইশারা করলেন রমাশঙ্কর : 'কিন্তু আমার সঙ্গে চাপা খটাখটি আছে। তা তুমি ভাই পত্রলোচনের জমির গণ্ডগোলের কেসটা একটু বুঝিয়ে বলো না—।'

'কী আর বলব। দেখছেন তো আমার পায়ের হাওয়াই চপ্পলের হাল। এ পরে কি আর খেতজমিতে কাজ করা যায়? কিন্তু আমার তো আর জপেশ্বরদাদার মতো সোনা কপাল নয়, ফাটা কপাল। তাই এই ছেঁড়াখোঁড়া চপ্পল দে কাজ চালাচ্ছি। নতুন জুতো কিনব তার পয়সা কোথায়!'

রমাশঙ্কর বেশ অবাক হয়ে গেলেন। সাতকড়ির চাতুর্যকে সেলাম জানাতে হয়। 'অতি ধীর বক্রগতিতে' সে পয়সার প্রসঙ্গে এসে গেছে।

কাল প্রিয়নাথ যে জপেশ্বরকে—বা পুকুরপাড়ের সেই লোকটাকে—টাকা দিয়েছেন, সেটা রমাশঙ্করের নজর এড়ায়নি। এই সাতু জানা নিশ্চয়ই জপেশ্বরের কাছে সেই অর্থাগমের গল্প শুনেছে। তারপর...।

নাঃ, লেখাপড়া শিখলে সাতকড়ি জানা নিশ্চয়ই হাইকোর্টের উকিল হত!

রমাশঙ্কর আর সময় নষ্ট করলেন না। পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বের করে সাতকড়ির হাতে দিলেন।

সাতু দাঁত বের করে হেসে বলল, 'জপেশ্বরদাদা এরকম দু-পিস পেয়েছে—।'

সুতরাং আর-একটা নীল রঙের নোট সাতুকে দিতে হল।

তারপর ছেলেটা মুখ খুলল, দড়ির লাছিটা কাঁধের ওপরে ফেলে বলতে শুরু করল।

জপেশ্বর মালিক যা-যা প্রিয়নাথকে বলেছিল মোটামুটি সেই খবরগুলোই দিল সাতকড়ি। তবে বাড়তি খবর হিসেবে জানাল, ওর দুটো ছাগল তিন বছর আগে এই মাঠ থেকে উধাও হয়ে গেছে। এ ছাড়া গত বছরে ও অদ্ভুত একটা ব্যাপার দেখেছে—নিজের চোখে।

সময়টা ছিল ঘোর দুপুর। হাল চাষের বলদ জোড়ার খাবার নিয়ে ও এই মাঠের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল। একটা নেড়ি কুকুর মাঠের এখানে-সেখানে এঁটোকাঁটা খুঁজে খাওয়ার চেষ্টা করছিল।

হঠাৎই সাতকড়ি দেখতে পায় মাটি ফুঁড়ে তিরের মতো ছিটকে শূন্যে লাফিয়ে উঠল একটা ধুলোমাখা শীর্ণ চেহারা। এবং সেই অদ্ভুত প্রাণীটা পুকুরে ব্যাংবাজির মতো তিন লাফে পৌঁছে গেল কুকুরটার কাছে। কিন্তু তার আগেই ভয় পাওয়া কুকুরটা 'কেঁউ' করে ডেকে প্রাণভয়ে ছুটতে শুরু করল।

কুকুরটা দিশেহারা হয়ে এলোমেলো দৌড়োচ্ছিল। কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হল না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেই ধুলোমাখা কঙ্কালসার প্রাণীটা চার-পাঁচটা অলৌকিক লাফে বেচারি কুকুরটিকে ধরে ফেলল। তখন কুকুরটার সে কী মরণ চিৎকার!

তারপরই কী এক ম্যাজিকে কুকুরটা সমেত ওই প্রাণীটা মাটির মধ্যে তলিয়ে গেল।

এই ঘটনা দেখে সাতকড়ি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। পরপর দুটো রাত্তির ও ঘুমোতে পারেনি। আর ভয়ে কাউকে এ-কথা বলতেও পারেনি। তবে এখন সে 'বাবু'-র কাছ থেকে নিমক খেয়েছে—হাতে ধরা নোট দুটো উঁচিয়ে দেখাল সাতু—তাই বুকে চেপে রাখা কথাগুলো বলছে। 'বাবু' যে সাতকড়ি জানার কাছ থেকে এসব কথা শুনেছেন, সেটা তিনি যেন কাউকে না বলেন।

সাতকড়ির সঙ্গে কথা শেষ হতে না হতেই তিন-চারজন গ্রামবাসী কৌতূহলে রমাশঙ্করের কাছে এসে দাঁড়াল। ওদের ঠেকাতে রমাশঙ্কর আবার হিমঘরের গল্প শোনালেন। এবং পত্রলোচনের জমি নিয়ে সবাইকে কমবেশি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন।

কিন্তু সেরকম কিছু জানা গেল না।

তখন রমাশঙ্কর গাড়িতে ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন। পকেট থেকে নোটবই আর পেন বের করে ছোট-ছোট মন্তব্য লিখতে লাগলেন। পথ চলার জন্য অক্ষরগুলো আঁকাবাঁকা হয়ে যাচ্ছিল। রমাশঙ্কর হাঁটার গতি কমিয়ে দিলেন।

গাড়ির কাছে পৌঁছে সবাইকে দেখিয়ে এবং শুনিয়ে হাত ছুড়ে বলে উঠলেন, 'যত্ত সব বোগাস গালগল্প!' তারপর প্রিয়নাথের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'রূপকথা শোনার জন্যে দুশো টাকা গচ্চা গেল। কাল আপনিও তো জপেশ্বর নামের একটা লোককে দুশো টাকা দিয়েছেন...।'

প্রিয়নাথ শান্ত গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, দিয়েছি। কারণ, ওরা আমাদের তুলনায় অনেক সৎ। আমি ওকে মিথ্যে কথা বলেছি যে, আমরা এখানে কোল্ড স্টোরেজের ব্যাবসার জন্যে জমি দেখতে এসেছি। কিন্তু জপেশ্বর মালিক সত্যি কথা বলেছে—আমার মতো ভাঁওতা দেয়নি।' একটু থেমে তারপর : 'তো আপনি ওই ছেলেটাকে কী ভাঁওতা দিলেন?'

রমাশঙ্কর থতোমতো খেয়ে বললেন, 'ওই...কোল্ড স্টোরেজ।' তারপর তাড়াতাড়ি গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লেন।

মিংকি ঠোঁট টিপে হেসে ফেলেছিল।

প্রিয়নাথ ওকে জিগ্যেস করলেন, 'কী হল, হাসছ কেন?'

'না, ভূতনাথদা, তেমন কিছু নয়। শুধু ভাবছিলাম, যুক্তিবাদীরাও তা হলে মিথ্যেবাদী হয়!'

এ-কথায় তৃষ্ণাও ঠোঁট চওড়া করে হেসে ফেলল।

## দশ

সারাদিনে আর নতুন কিছু হয়নি, কিন্তু প্রিয়নাথের অস্বস্তি বাড়ছিল। রমাশঙ্করের হাবভাব দেখে ওঁর মনে হচ্ছিল, মানুষটা যেন একটু নাড়া খেয়ে গেছে।

নানান চিন্তায় রাতে কিছুতেই ঘুম আসছিল না প্রিয়নাথের। বিছানায় শুয়েও উশখুশ-উশখুশ করছিলেন। গরমটা যেন আজ বেশি লাগছে। অথচ মাথার কাছে দুটো জানলাই খোলা।

নামে দুটো হলেও জানলা আসলে একটাই, তবে লম্বা জানলাটার পেটের কাছে কাঠের ফ্রেম দিয়ে আড়াআড়ি দু-ভাগ করা। ওপরে-নীচে দুটো করে পাল্লা, আর কাঠের গরাদ। খুব পুরোনো আমলের বাড়ি-টারিতে যেমন দেখতে পাওয়া যায়।

ঘর অন্ধকার। হ্যারিকেনের সলতেটা এতই কমানো যে, কোনও আলো দেখা যাচ্ছে না।

প্রিয়নাথ শুয়ে-শুয়ে মাঠের সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটার কথা ভাবছিলেন। নিজের চোখে না দেখলে এ-ঘটনা বিশ্বাস করা কঠিন। পুরো ঘটনাটা ঘটতে সময় লেগেছে পাঁচ সেকেন্ডেরও কম। বলতে গেলে, এই দেখলাম, এই নেই।

প্রিয়নাথ সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য হয়েছেন পত্রলোচনের আচরণে।

দেওয়ালে অদ্ভুত ছায়া দেখে একটা মানুষ না হয় নির্বিকার থাকতে পারে। কিন্তু মাঠের ভয়ঙ্কর ঘটনাটা!

অনেক ইতস্তত করার পর প্রিয়নাথ আজ রাতে যখন পত্রলোচনকে একপাশে ডেকে নিয়ে নীচু গলায় মাঠের মর্মান্তিক ঘটনাটার কথা জানালেন, তখন ওঁর প্রতিক্রিয়া সত্যিই অবাক হওয়ার মতো।

'আপনি কি ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখেছেন?'

'বলছি তো, নিজের চোখে দেখেছি—।'

'কতটা দূর থেকে দেখেছেন?'

'তা কিছুটা দূর থেকে বলতে পারেন...।'

'তা হলে কি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছেন?'

প্রিয়নাথের ধৈর্য ক্রমশ কমে আসছিল। তাই কিছুটা বিরক্তভাবে নীচু গলায় বললেন, 'পুলিশে খবর দেওয়ার মতো স্পষ্ট দেখতে পেয়েছি...।'

পত্রলোচন তখন ভগবানকে ডাকার ভঙ্গিতে সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছেন। কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ থেকে তারপর বলেছেন, 'জোয়ারদারবাবু, এসবই প্রাকৃতিক ঘটনা। এর মধ্যে থানা-পুলিশ ডেকে এনে কোনও লাভ নেই। তা ছাড়া আমাদের লোকাল ফাঁড়ির পুলিশরা এসব ঘটনার কথা জানে।' আপনমনে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লেন পত্রলোচন। তারপর : 'বুঝেছি, ওঁরা ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছেন। বাইরের মানুষজন এসে ডিসটার্ব করলেই এরকম সমস্যা হয়। সমস্যা বাড়ে। আমি...আমি টিভির লোকজনদের গোড়াতেই এ-কথা বলেছিলাম। কিন্তু ওরা মানতে চাইলে তো!'

'ওঁরা অস্থির হয়ে পড়েছেন মানে? কাদের কথা বলছেন আপনি?'

স্থির দৃষ্টিতে প্রিয়নাথের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পত্রলোচন। তারপর আবার মুখ তুললেন সিলিং-এর দিকে। এবার হাতজোড় করে চোখ বুজলেন। আপনমনে কীসব বললেন।

আরও কিছুক্ষণ সময় নেওয়ার পর নীচু গলায় বললেন, 'আমার যাঁরা প্রণমিত, তাঁরা অস্থির হয়ে পড়েছেন...ভীষণ অস্থির হয়ে পড়েছেন...। ওঁদের শান্ত করা দরকার...শান্ত করা দরকার...।'

এমন সময় অন্দরের দরজার পাল্লা ফাঁক করে পত্রলোচনের স্ত্রী ছোট্ট করে উঁকি মেরেছেন। চোখে সেই কালো চশমা। পরনে একটা লাল পাড় আধময়লা শাড়ি।

প্রিয়নাথ বুঝলেন, রাতের খাওয়ার আয়োজন শুরু হতে চলেছে।

কিন্তু পত্রলোচনের কথাগুলো প্রিয়নাথের কানে সমানে বাজছিল। আর বাজছিল বলেই হয়তো ওঁর ঘুম আসছিল না।

প্রিয়নাথ জীবনে অনেক অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক, ভৌতিক ঘটনা দেখেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দেখা ওই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা তিনি নিতে পারছিলেন না। মাটি ফুঁড়ে লাফিয়ে বেরিয়ে আসা ওই প্রাণীটা কী? কোথায় গেল ওটা নিরীহ মানুষটাকে নিয়ে?

অন্ধকারে জেগে থাকতে-থাকতে ঘুমের ওপরে ঘেন্না ধরে গেল ভূতনাথের। তাই বিছানায় উঠে বসলেন। বালিশের পাশ থেকে চশমা নিয়ে চোখে দিলেন। ঘড়ি দেখলেন : রাত দেড়টা।

জানলা দিয়ে রাত দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে গাছের কয়েকটা ডালপালা এবং পাতাও। একটা পাখির ডাক কানে এল। ডাকটা অনেকটা কান্নার মতো শোনাল।

এবার উঠে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে হাতড়ে দড়িতে ঝোলানো পাঞ্জাবিটা খুঁজে পেলেন। ওটা গায়ে চড়িয়ে নিয়ে ঝোলা ব্যাগ হাতড়াতে শুরু করলেন। টর্চটা পেয়ে তুলে নিলেন। পাঞ্জাবির পকেটে ঢোকালেন। তারপর দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

মাথার একটা পাশ দপদপ করছিল। এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করলেন। একটা সিগারেট ধরালে দপদপানিটা কমতে পারে।

সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। আকাশ আকাশের জায়গাতেই রয়েছে, চাঁদ চাঁদের জায়গায়।

রাতের প্রকৃতি দেখতে-দেখতে অনেকটা এগিয়ে গেলেন। সামনে গাছপালা, খোলা মাঠ। একাদশী কি দ্বাদশীর চাঁদ ওর সাধ্যমতো জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে। চপলকেতুকে আরও মায়াময় লাগছে এখন।

প্রিয়নাথের ভেতরে টানাপোড়েন চলছিল। একইসঙ্গে সিগারেটটাও ছোট হচ্ছিল।

এরকম একটা ভয়ঙ্কর ঘটনার সাক্ষী হয়ে সেটা নিয়ে মুখ বুজে থাকা যায় না। কিন্তু কেউ কি এই অবিশ্বাস্য ঘটনা বিশ্বাস করবে?

একটা গাছের ছায়ার নীচে এসে পড়েছিলেন। সিগারেটটা বাঁ-হাতে নিয়ে ডান পকেট থেকে টর্চটা বের করে নিলেন। কিন্তু একটা দৃশ্য দেখে থমকে গেলেন।

প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মিটার দূরে একটা ছায়ামূর্তি হেঁটে চলেছে। জ্যোৎস্না পড়েছে তার গায়ে।

ছায়ামূর্তিটা এতই লম্বা যে, সহজেই তাকে চেনা গেল : পত্রলোচন সিংহ রায়।

এত রাতে কোথায় যাচ্ছেন পত্রলোচন? ওঁর হাতে একটা পুঁটলি। ওই পুঁটলির মধ্যেই বা কী?

সিগারেটটা চট করে একটা গাছের গুঁড়িতে ঘষে নিভিয়ে ফেলে দিলেন। টর্চটা ঢুকিয়ে দিলেন পকেটে। তারপর খুব সতর্ক হয়ে পত্রলোচনকে অনুসরণ করলেন।

প্রিয়নাথের মাথার খুব কাছ দিয়ে একটা বড় সাদা প্যাঁচা উড়ে গেল। প্রিয়নাথ চমকে মাথা সরিয়ে নিলেন।

চারপাশে কোনও শব্দ নেই। নির্জন রাত। শুধু দুটো ছায়া হেঁটে চলেছে। চাঁদের আলোয় মাটিতে ওদের ছায়া পড়েছে। চাঁদ আকাশ থেকে এই চারটে ছায়াকে দেখছিল।

পত্রলোচন ধীরে-ধীরে গিয়ে হাজির হলেন চণ্ডীমণ্ডপে। দেবীর ভাঙাচোরা বিগ্রহের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রিয়নাথ ওঁকে আর দেখতে পাচ্ছিলেন না। অন্ধকার ওঁকে জড়িয়ে নিয়েছিল।

প্রিয়নাথ তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের কাছে চলে এলেন। একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে কান পেতে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

হঠাৎই ওঁর কানে এল মন্ত্রপাঠ। পত্রলোচন মন্ত্র পড়ছেন। উচ্চারণ যথেষ্ট বিকৃত হলেও প্রিয়নাথ বুঝতে পারলেন, কারণ তিনিও নিয়মিত চণ্ডীপাঠ করেন।

পত্রলোচন রাত্রিসূক্ত পড়ছিলেন :

*'ওঁ রাত্রি ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ।*
*বিশ্বা অধি শ্রিয়োহধিত।।*
*ওর্বপ্রা অমর্ত্যা নিবতো...।'*

কিছুক্ষণ ধরে পত্রলোচনের মন্ত্রপাঠ চলল। তারপর তিনি যে-কথাগুলো বলতে লাগলেন সেগুলো ভারী অদ্ভুত।

'...আপনারা আমার প্রণাম নিন। আপনারা শান্ত হোন। আপনারা তুষ্ট হোন, তৃপ্ত হোন। আমি আপনাদের প্রণাম করি। আপনাদের আশীর্বাদ দিয়ে আমাকে ধন্য করুন। আপনারা শান্ত হোন...।'

এই একই কথা পত্রলোচন বেশ কয়েকবার মন্ত্রের মতো আওড়ে গেলেন। তারপর চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বেরিয়ে ফেরার পথ ধরলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রিয়নাথ চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকে পড়লেন। পকেট থেকে টর্চ বের করলেন। টর্চের মুখে হাত চাপা দিয়ে আলো জ্বাললেন। সেই চাপা আলোয় দেখলেন, বিগ্রহের সামনে অনেক টাটকা ফুল ছড়িয়ে আছে, আর একটা খালি পলিথিনের প্যাকেট পড়ে আছে একপাশে।

প্রিয়নাথ টর্চ নিভিয়ে ফেরার পথ ধরলেন। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে একটু পরেই পত্রলোচনের ছায়ামূর্তিকে দেখতে পেলেন। প্রিয়নাথ খুব সাবধানে পিছু নিলেন। মনে হল, পত্রলোচন ওঁর বাড়ির দিকেই ফিরে চলেছেন।

বাড়ির বেশ কাছাকাছি এসে পড়ার পর প্রিয়নাথ আরও তাড়াতাড়ি পা চালালেন। কোনওরকম শব্দ না করে পত্রলোচনের দু-চার হাতের মধ্যে পৌঁছে গেলেন।

'পত্রলোচনবাবু—।'

পত্রলোচনের ছায়া থমকে দাঁড়াল। ঘুরে তাকাল।

প্রিয়নাথ মানুষটার মুখের ওপরে টর্চের আলো ফেললেন : 'এত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন?'

'কে, প্রিয়নাথবাবু?' পত্রলোচনের মুখে নির্বিকার ভাবটা এখন নেই। তার বদলে একটা কাচুমাচু ভাব ফুটে উঠেছে। যেন লুকিয়ে চুরি করতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেছেন।

'এত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন আপনি?' টর্চ নিভিয়ে প্রশ্নটা আবার করলেন প্রিয়নাথ।

'চণ্ডীমণ্ডপে গিয়েছিলাম—পুজো করতে।'

'রাতে চণ্ডীপাঠ করতে হলে রাত্রিসূক্ত আগে পাঠ করতে হয়—।'

'জানি। সেইজন্যেই তো রাত্রিসূক্ত আগে বলছিলাম...।' প্রিয়নাথ যে ঠিক কী করতে চান সেটা পত্রলোচন বুঝতে পারছিলেন না। তাই চুপ করে রইলেন।

'শেষের ওই মন্ত্রের ''আপনারা'' কারা? কাদের উদ্দেশ করে আপনি মন্ত্র পড়ছিলেন?'

এবারেও পত্রলোচন চুপ করে রইলেন।

'লোচনবাবু, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিলে আপনার সাংঘাতিক বিপদ হবে। আসুন, ওইখানটায় একটু বসি—' টর্চ জ্বেলে পত্রলোচনের বাড়িতে ঢোকার সিঁড়ির ধাপের দিকে দেখালেন প্রিয়নাথ। তারপর সেদিকে এগোলেন।

প্রথম ধাপটায় গিয়ে বসলেন দুজনে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, পত্রলোচন উশখুশ করছেন।

প্রিয়নাথ বললেন, 'লোচনবাবু আমরা কথাবার্তা খুব নীচু গলায় বলব—যাতে কেউ শুনতে না পায়। শুনতে পেলে আপনারই অসুবিধে। আপনার স্ত্রী বা ছেলের কাছে এ নিয়ে হয়তো আপনাকে পরে জবাবদিহি করতে হতে পারে...।'

পত্রলোচন চুপ করে রইলেন।

কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করার পর প্রিয়নাথ বলতে শুরু করলেন, 'আপনি যদি আমার প্রশ্নের জবাব না দেন তা হলে আমি কী-কী করব সেটা আগে বলি। আমি কলকাতায় গিয়ে খবরের কাগজ আর টিভি চ্যানেলের রিপোর্টার আর জার্নালিস্টদের চপলকেতুর কথা জানাব। জানাব যে, আমি নিজের চোখে একজন মানুষকে মাটির নীচে তলিয়ে যেতে দেখেছি। এরকম অনেক মানুষ এখানে মাটির নীচে উধাও হয়ে গেছে।'

'এখানকার পুকুরের জল মাঝে-মাঝে দুলে ওঠে। ভূমিকম্পের সময় যেমন হয়। তা ছাড়া এখানে মাঠে, দেওয়ালে অপদেবতার ছায়া দেখা যায়। ছায়াগুলো সব এলোমেলো ছুটে বেড়াচ্ছে।'

'এসব কথা প্রচার হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আপনার জমিদারিতে পুলিশ হানা দেবে। তারপর মাটির তলায় কী আছে খোঁজ করার জন্যে ফায়ার ব্রিগেড আর আর্মি এখানে এসে হাজির হবে। তার সঙ্গে কয়েকডজন সাংবাদিক আপনার এলাকায় এসে কিলবিল করবে। তার ওপরে আমি যদি বলি, এখানকার লোকজনের সন্দেহ এখানে মাটির নীচে নবাবি আমলের গুপ্তধন আছে, তা হলে তো হয়েই গেল! চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আপনি একটা মুহূর্তও শান্তি পাবেন না।'

'কিন্তু এসব মিথ্যে আপনি কেন বলবেন?' পত্রলোচন অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন।

'বলব জনগণের স্বার্থে।' কঠিন গলায় বললেন ভূতনাথ, 'এইসব মিথ্যে প্রচারের সঙ্গে আরও একটা কথা জুড়ে দেব : এখানকার ভণ্ড জমিদার পত্রলোচন সিংহ রায় এ সবকিছুর নাটের গুরু। উনি সব জানেন—সব প্রশ্নের উত্তর জানেন। তখন কী অবস্থা হবে বুঝতে পারছেন?'

'জোয়ারদারবাবু, দয়া করে আমার এই সর্বনাশটি করবেন না। এমনিতেই আমি সর্বনাশের মধ্যে ডুবে আছি—' পত্রলোচনের গলা কাঁদো-কাঁদো শোনাল। প্রিয়নাথের একটা হাত চেপে ধরলেন : 'আপনি জানেন না, আমি কী সর্বনাশের মধ্যে ডুবে আছি। আমাকে দয়া করুন...বাঁচান...।'

কাতর মানুষটাকে দেখে প্রিয়নাথের খুব খারাপ লাগছিল। কিন্তু আজ বিকেলে যে-রক্তহিম করা দৃশ্য দেখেছেন তার চেয়ে খারাপ আর কিছুই হতে পারে না। তাই ভূতনাথ ঠান্ডা গলায় পুরোনো প্রশ্নটাই করলেন, 'আপনি কাদের জন্যে ওই মন্ত্র পড়ছিলেন? ''আপনারা'' মানে কারা?'

প্রিয়নাথের হাতটা ছেড়ে দিলেন পত্রলোচন। কয়েক মুহূর্ত গুম হয়ে থেকে বললেন, 'আমি আমার পূর্বপুরুষদের জন্যে ওই মন্ত্র পড়ছিলাম। আমার বাপ-ঠাকুরদা কাকা-জ্যাঠা সবার জন্যে...।'

'কেন? ওঁদের জন্যে মন্ত্র পড়ছিলেন কেন?'

'ওদের শান্ত রাখার জন্যে...।'

'তাঁরা এখন কোথায়? তাঁরা কি কেউ বেঁচে আছেন?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর পত্রলোচন আলতো গলায় জবাব দিলেন, 'না...বেঁচে নেই।'

এবার প্রিয়নাথ পত্রলোচনের হাত চেপে ধরলেন। পত্রলোচনকে ওঁর বিপর্যস্ত বলে মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই অসহায় মানুষটা কোনও চাপা বেদনায় কষ্ট পাচ্ছে।

'লোচনবাবু, আমি কিন্তু আপনার বন্ধু—শত্রু নই। আজ সন্ধের মুখে ওই মাঠে আমি যা দেখেছি সেটা সোজা কথায় একটি হত্যাকাণ্ড—খুন। একটা খুন চোখের সামনে দেখে কোনও মানুষ চুপ করে থাকতে পারে না। যদি আমরা মুখ বুজে থাকি তা হলে আগামী দিনে আরও প্রাণ যাবে। অনেক নিরীহ মানুষ মারা পড়বে। আপনি না এখানকার জমিদার! এখানকার রাজা! আপনার শরীরে না মুকুন্দ রায়ের রক্ত! আপনি কি চান আপনার প্রজারা একে-একে খুন হোক? নিরীহ প্রজাদের জন্যে রাজার কোনও কর্তব্য নেই! ছিঃ-ছিঃ!'

প্রিয়নাথের ধিক্কারে কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে বসে রইলেন পত্রলোচন। তারপর কান্না মেশানো গলায় বললেন, 'আমি যে কী করি! আমি যে কী করি! একদিকে আমার বাপ-ঠাকুরদা, আর একদিকে আমার প্রজারা...।'

'যাতে প্রজাদের ভালো হয় তাই করুন—কারণ, বাপ-ঠাকুরদা মারা গেছেন। প্রজারা এখনও বেঁচে আছে।'

পত্রলোচন মাথা নীচু করে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন। প্রিয়নাথ ওঁর পিঠে একটা হাত রেখে আবার বললেন, 'প্লিজ, আপনার প্রজাদের বাঁচান। আপনার বাপ-ঠাকুরদা স্বর্গে গেছেন, কিন্তু প্রজারা? ওরা তো এখনও আপনার সঙ্গে রয়েছে!'

'আমার বাপ-ঠাকুরদা স্বর্গে যায়নি। ওরা আছে পাতালে—আমার জমিদারিতে—এখানকার মাটির নীচে।' পত্রলোচন মুখ তুলে তাকালেন আকাশের দিকে। চাঁদের আলোয় দেখা গেল ওঁর গালের ওপরে জলের রেখা চিকচিক করছে। মুখ নামিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর : 'ওদের শান্ত রাখতেই আমি ওই মন্ত্র পড়ছিলাম। কী বলব আপনাকে, আমার পূর্বপুরুষরা খিদে নিয়ে মারা গেছে...।'

'খিদে নিয়ে মারা গেছে! তার মানে?' প্রিয়নাথ হতবাক।

পত্রলোচন ক্লান্ত গলায় সেই কাহিনি বলতে লাগলেন।

ব্রিটিশ আমলের কথা। তখন ইংরেজের শাসন চলছে। চলছে স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার জন্য বিপ্লবীদের লড়াই। ইংরেজ শাসকরা খবর পেয়েছিল, চারজন উগ্রপন্থী বিপ্লবী এই চপলকেতুতে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। সেসময়ে এখানে থাকত পত্রলোচনের পূর্বপুরুষরা। আর গোটা গ্রাম জুড়েই থাকত তাদের নানান আত্মীয়স্বজন।

গোটা গ্রামে তল্লাশি চালিয়েও ইংরেজ পুলিশ সেই চারজনের খোঁজ পায়নি। আর গ্রামের বাসিন্দারা তাদের প্রাণ দিয়ে আড়াল করে রেখেছিল। তখন ক্ষিপ্ত ইংরেজ পুলিশ গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলে। গ্রামে খাবারদাবার ঢোকার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়। সুলতানী আমলে যেভাবে শত্রুপক্ষের দুর্গ অবরোধ করা হত।

চপলকেতুকে এমন নিশ্ছিদ্রভাবে অবরোধ করা হয়েছিল যে, কিছুদিন পরই মানুষগুলো খিদেয় পাগল হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। এককণা খাবারের সন্ধান পেলে দশ-বিশজন তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। মৃতদেহ নিয়ে শকুন কিংবা হায়েনার খেয়োখেয়ি তার কাছে কিছুই না।

দেখতে-দেখতে মানুষগুলো রোগা কঙ্কালসার হয়ে গেল। বেঁচে থাকা অবস্থাতেই ওদের প্রেত বা পিশাচ মনে হত। নানারকম অসুখবিসুখ আঁকড়ে ধরল তাদের। তারপর এমন একটা সময় এল যে, ওরা দিনের আলো আর সহ্য করতে পারত না। তখন বিকেল কি সন্ধের মুখে বেরিয়ে পড়ত খাবারের খোঁজে।

দিন যেতে লাগল। এবং ওরা মরতে লাগল। শ্মশান ছিল অনেকটা দূরে, নদীর ধারে। অবরোধ ডিঙিয়ে সেখানে যাওয়া সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এত দ্রুত মানুষজন মরছিল যে, নিয়ম মেনে দাহ করা সম্ভব হতও

না। তাই সমস্ত মৃতদেহ কবর দেওয়া শুরু হল। শেষ পর্যন্ত সেটা গণকবরের চেহারা নিয়েছিল।

ব্যাপারটা ইংরেজ সরকার ধামাচাপা দিয়ে দিয়েছিল। তা ছাড়া এই নৃশংস হত্যালীলার সাক্ষীও কেউ ছিল না। তাই গ্রাম রয়ে গেল গ্রামের মতো—শুধু লোকগুলো চলে গেল।

যে-কয়েকজন অবরোধ শুরুর আগে গ্রামের বাইরে ছিল, তারা প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। তাদেরই মধ্যে একজন পত্রলোচনের বাবা পুষ্পলোচন সিংহ রায়। ইংরেজের অবরোধ উঠে যাওয়ার পর তিনি এসে জন্মভিটেতে থাকতে শুরু করেন। তাঁর মতো আরও অনেকেই চপলকেতুতে এসে বসবাস শুরু করে। তার কিছুদিন পর লোকজন মাটির নীচের ছুটোছুটি দাপাদাপি টের পায়। এবং সেটা চলতেই থাকে।

একদিন পত্রলোচনের বাবা পুষ্পলোচন বিপদে পড়েন। সন্ধের মুখে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎই মাটির নীচ থেকে ছিটকে ওঠে একটা কঙ্কালসার চেহারার অবয়ব। সর্বাঙ্গে তার ধুলোমাটি মাখা। এবং পুষ্পলোচনকে নিয়ে চোখের নিমেষে তলিয়ে যায় মাটির নীচে।

ঘটনাটা ভাগ্যক্রমে গ্রামের দুজন মানুষ দেখতে পেয়েছিল। তাদের কথামতো পত্রলোচনরা তলিয়ে যাওয়ার জায়গাটা চিহ্নিত করেন। তারপর শাবল কোদাল নিয়ে কয়েকদিন ধরে খোঁড়াখুঁড়ি করেন সেখানে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। পুষ্পলোচনের কোনও চিহ্ন পাওয়া যায়নি।

গ্রামে রটে গেল, পুষ্পলোচনকে পিশাচে ধরেছে।

কেন, পিশাচ কেন? কারণ, সকলের ধারণা হল, খেতে না পেয়ে মারা যাওয়া মানুষগুলো পিশাচ হয়ে গেছে। ওরা এখনও খাবারের খোঁজে পাগলের মতো ছুটোছুটি করছে।

প্রিয়নাথ স্তম্ভিত হয়ে পত্রলোচনের কাহিনি শুনছিলেন। ভূতশিকারের পেশায় জড়ানোর পর বহু বিচিত্র কাহিনি তিনি শুনেছেন, কিন্তু পত্রলোচনের কাহিনি বেনজির।

ভূতনাথ অবাক হয়ে পত্রলোচনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। মানুষটা ওর কাহিনি বলছে আর কাঁদছে। সেই কান্নার ভেতরে পিতৃশোক লুকিয়ে আছে কি না কে জানে!

চাঁদ পশ্চিমে অনেক হেলে পড়েছে। বাতাসে গাছের শুকনো পাতা উড়ছে। তার খসখস শব্দ কেমন একটা অলৌকিক আবহ তৈরি করেছে। এখন মাটির নীচের প্রাণীগুলো কী করছে? ওরা ভূত, প্রেত, না পিশাচ প্রিয়নাথ জানেন না। কিন্তু ওরা যা-ই হোক, ওদের অলৌকিক ক্ষমতার কোনও সীমা নেই। ওরা ইচ্ছে হলে ঘরের দেওয়ালে ছায়া ফেলে দৌড়োয়, ইচ্ছে হলে ওদের অপচ্ছায়া মাঠের ওপরে ছোটাছুটি করে। ওরা পাতাল থেকে ভূমিকম্প তৈরি করে পুকুরের জল নড়ায়। ওরা খোলা মাঠের ওপরে হিমকুয়াশা ছড়িয়ে দেয়।

ওদের মধ্যে রয়েছে পত্রলোচন সিংহ রায়ের পূর্বপুরুষ আর আত্মীয়স্বজন।

প্রিয়নাথের মুখে আজ বিকেলের ঘটনা শোনার পর পত্রলোচন তাদের শান্ত করতে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়েছিলেন। চণ্ডীপাঠের মন্ত্রের পর পূর্বপুরুষদের উদ্দেশে মন্ত্র পড়েছেন। এর বেশি পত্রলোচন আর কী-ই বা করতে পারতেন!

প্রিয়নাথ নরম গলায় জিগ্যেস করলেন, 'মাটির নীচে গিয়ে কেউ কখনও ফিরে আসেনি?'

প্রশ্নটা করামাত্রই পত্রলোচন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। ওঁর মাথা ঝুঁকে পড়ল হাঁটুর ওপরে। পিঠটা কান্নায় ফুলে-ফুলে উঠতে লাগল।

প্রিয়নাথ এরকম একটা দৃশ্যের জন্য তৈরি ছিলেন না। তাই অস্বস্তি নিয়ে চুপ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পর পত্রলোচন মুখ তুললেন। জামার হাতায় চোখ ঘষে জল মুছলেন। তারপর একটা লম্বা শ্বাস ফেলে বললেন, 'আমি যতদূর জানি, মাটির নীচে গিয়ে মাত্র দুজন ফিরে এসেছে—।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ। তাদের, স্যার, আপনিও দেখেছেন...।'

'মানে।'

'হ্যাঁ, আমার বউ আর ছেলে।'

চোখে কালো চশমা পরা দুজন মানুষের ছবি পলকে ভেসে উঠল প্রিয়নাথের মনে।

'কী করে ফিরে পেলেন ওদের?'

'মা চণ্ডীর কৃপায়। আমাদের ওই চণ্ডীমণ্ডপ আর বিগ্রহ কম করে দুশো বছরের পুরোনো। ওই মন্দিরের দেবতা খুব জাগ্রত। আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত সবাই ওই দেবীকে খুব মানে। ইংরেজদের অবরোধে যারা মারা গিয়েছিল তারাও মানত। আর আমাদের বংশের সবাই চিরকাল বিপদে-আপদে ওই চণ্ডী-মায়েরই শরণ নিত। ফলে, ওই দেবতাকে আমরা, যারা মাটির ওপরে আছি, তারা যেমন মানি, তেমনই...' একটু থামলেন পত্রলোচন। তারপর বললেন, 'মাটির নীচে যেনারা রয়েছেন তেনারাও মানেন।'

পত্রলোচন ক্লান্ত গলায় বলে চললেন।

একদিন মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে আসার সময় পত্রলোচনের স্ত্রী আর ছেলে দুজনেই তলিয়ে যায়। দুজন ধুলোপিশাচ ছিটকে বেরিয়ে আসে মাটি ফুঁড়ে। এবং দুজনকেই জাপটে ধরে ঢুকে যায় মাটির ভেতরে। ঘটনাটা ঘটেছিল বিকেল-বিকেল সময়ে। তাই পত্রলোচন দু-তিন মিনিটের মধ্যে খবর পেয়ে গিয়েছিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ফুল-টুল নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন চণ্ডীমন্দিরে। বুকফাটা হাহাকার নিয়ে কাতর প্রার্থনা শুরু করেছিলেন। স্ত্রী আর ছেলেকে ফেরত পাওয়ার জন্য একটানা আবেদন নিবেদন করেছিলেন পিতৃপুরুষের কাছে।

ওঁর প্রার্থনা নিশ্চয়ই তাঁরা শুনেছিলেন। কারণ, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওঁর স্ত্রী আর ছেলে ফিরে এসেছিল। পাতাল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছিল ওদের ধুলোমাখা দেহ। ওদের সারা গায়ে এত ধুলো মাখা ছিল যে, মানুষগুলোকে ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছিল না। ওরা অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিল মাঠের মধ্যে। চোখ বোজা। দেহ অসাড়।

বাড়িতে নিয়ে এসে সেবাযত্ন করে ওদের সুস্থ করে তোলা হয়। শেষ পর্যন্ত ওরা সেরে উঠেছিল—যদিও একটা ছোট সমস্যা রয়ে গিয়েছিল। চোখে একটু বেশি আলো পড়লে ওদের দেখতে অসুবিধা হয়।

কিন্তু ওরা যে ফিরে এসেছে তাতেই পিতৃপুরুষের প্রতি পত্রলোচনের কৃতজ্ঞতার সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাই তিনি চণ্ডীমন্দিরে গিয়ে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পুজো দিয়েছিলেন আবার।

কথা বলতে-বলতে পত্রলোচনের চোখে জল এসে গিয়েছিল। হাতের পিঠ দিয়ে জল মুছে নিয়ে তিনি বললেন, 'স্যার, আমার এই বাপ-দাদার ভিটে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আর গেলেও আমি শান্তি পাব না। ওঁরা মাটির নীচে যেমন শান্তিতে আছে থাক। আর আমিও মাটির ওপরে যেমন শান্তিতে আছি থাকি। শুধু একটু সাবধান থাকলেই হল।

'স্যার, আর-একটা কথা বলি। আপনারা তো শুধু মানুষ হারিয়ে যাওয়ার খবর পেয়েছেন। এখানে মাঝে-মাঝে গোরু-বাছুর, ছাগল, হাঁস-মুরগি এমনকী কুকুরও হারিয়ে যায়। পাগল করা খিদে পেলে কি আর কোনও বাছবিচার থাকে, বলুন! নিজের বাপ-ঠাকুরদার নামে আমি আর কী নালিশ করব! ওরা আমাকে জন্ম দিয়েছে, আমার বউ-ছেলেকে গ্রাস করেও ফেরত দিয়েছে—আমার আর কী চাই! তাই আমার কাছে সবকিছুই প্রাকৃতিক ঘটনা...।'

কপালে হাত ঠেকিয়ে কাউকে নমস্কার করলেন পত্রলোচন। তারপর হঠাৎই ভূতনাথের হাত চেপে ধরে বললেন, 'স্যার, আমি চাই না এখানে লোকজনের ভিড়ভাট্টা বাড়ুক। এখানে নানান লোকজন আসা-যাওয়া করলে শান্তি নষ্ট হবে। মাটির নীচে যারা আছে তাদের অসুবিধে হবে। তাই আমি চাই, টিভিতে আপনাদের প্রোগ্রাম দেখে লোকজন যেন ভয় পায়। বাইরের কেউ যেন এই চপলকেতুতে আর না আসে। এটাই আপনার কাছে রিকোয়েস্ট, স্যার...।'

পত্রলোচনের আর্তি প্রিয়নাথকে স্পর্শ করল।

সত্যিই তো! পত্রলোচন ওঁর প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ে এই চপলকেতুতে দিব্যি বেঁচে আছেন। সেইসব ঘটনার তদন্ত করতে আসা মানে সিস্টেমকে ডিসটার্ব করা। প্রিয়নাথ এখানে আসতেনই না—যদি না রমাশঙ্কর দত্তের 'যুক্তিবাদ প্রসার সমিতি' ঝঞ্ঝাট তৈরি করত। আবার না এলে চপলকেতু প্রিয়নাথের পুরোপুরি অজানা থেকে যেত।

প্রিয়নাথ এখানে এসে এই দেড়দিনে অনেক কিছু অনুভব করেছেন, অনেক কিছু নিজের চোখে দেখেওছেন। কিন্তু প্রমাণ? প্রমাণ কই? রমাশঙ্কর দত্তের মুখ কী করে বন্ধ করবেন তিনি? পত্রলোচনের কাছ থেকে এ পর্যন্ত যা-যা জেনেছেন, শুনেছেন সেগুলো রমাশঙ্করকে বললে তিনি কি বিশ্বাস করবেন?

না, প্রিয়নাথের সে নিয়ে সন্দেহ আছে।

চাঁদ পশ্চিমে আরও ঢলে পড়েছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়তো ভোরের আলো ফুটবে। দূরে চোখ মেলে একটা কুয়াশার মেঘ দেখতে পেলেন। মাটির কাছাকাছি ভেসে আছে।

পত্রলোচনের হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন প্রিয়নাথ। বললেন, 'লোচনবাবু, এবার বাড়িতে যান। রাত ভোর হতে চলল। আপনি মন খারাপ করবেন না।'

পত্রলোচন একটা লম্বা শ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। ওঁর নিশ্বাসের বাতাসে অনেক দুঃখ-কষ্টের বাষ্প বেরিয়ে এসে হাওয়ায় মিশে গেল।

'আপনি চিন্তা করবেন না। রমাশঙ্করবাবুকে আমি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে সব কথা ওঁকে খুলে বলতেই হবে। নইলে আমাকে ঠগ, প্রতারক, ফেরেববাজ বলে ভাববেন। আর উনি যেরকম জঙ্গি মেজাজের লোক, হয়তো ভেবেই বসবেন টাকাপয়সা কিংবা অন্য কিছু নিয়ে আপনার সঙ্গে আমি সমঝোতা করে নিয়েছি...।'

পত্রলোচন ক্লান্তভাবে মাথা নেড়ে সিঁড়ির ধাপে পা রাখলেন। বিড়বিড় করে বললেন, 'কাল সকালে আপনারা আমার এখানে চা খেতে আসবেন কিন্তু—।'

'হ্যাঁ, আসব। আর মিস্টার দত্তের কেসটা দেখছি কী করা যায়। তবে কথা দিচ্ছি, চপলকেতুর ব্যাপারটা আমরা আমাদের মধ্যেই রাখব। অ্যাট লিস্ট যতটা সম্ভব।'

প্রিয়নাথ বাড়ির পিছনদিকে যাওয়ার পথ ধরলেন। ঘরে গিয়ে যতটুকু পারা যায় ঘুমিয়ে নিতে হবে। চোখ বেশ জ্বালা করছে।

## এগারো

চোখ জ্বালার চেয়েও বড় জ্বালা প্রিয়নাথের জন্য অপেক্ষা করছিল।

পত্রলোচনের কথাগুলো ভাবতে-ভাবতে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন। একইসঙ্গে গায়ে কাঁটা দিয়েছিল। চোখের সামনে থেকে 'শিকার' ধরার দৃশ্যটাকে কিছুতেই সরাতে পারছিলেন না।

ধুলোমাটির আকস্মিক বিস্ফোরণ। সর্বাঙ্গে ধুলোমাখা একটা পিশাচের বুলেটের মতো ছিটকে বেরিয়ে আসা। তারপর একলাফে শিকারকে আঁকড়ে ধরা। এবং অনায়াসে তিরবেগে মাটি ভেদ করে পাতালে ঢুকে পড়া।

হঠাৎই মুখে টর্চের আলো এসে পড়ল।

'মিস্টার জোয়ারদার, এত রাতে কোথায় বেরিয়েছিলেন?' রমাশঙ্কর দত্ত। পরনে স্যান্ডো গেঞ্জি আর লুঙ্গি।

প্রিয়নাথ থতোমতো খেয়ে গেলেন। হতচ্ছাড়া লোকটা এখন জেগে রয়েছে কেন? কী জবাব দেবেন ওঁকে।

'বলবেন না যেন আবার যে, ভূত ধরতে বেরিয়েছিলেন...' ব্যঙ্গ করে হাসলেন যুক্তিবাদী। টর্চের আলো সরিয়ে নিলেন।

'হুঁ। বলতে পারেন খানিকটা তাই। কিন্তু প্লিজ, এখন ভীষণ টায়ার্ড লাগছে। একটু ঘুমিয়ে নিই। কাল সকালে আপনার সঙ্গে ব্যাপারটা নিয়ে ডিটেলে ডিসকাস করব।'

প্রিয়নাথের আত্মসমর্পণের ঢং দেখে রমাশঙ্করের ব্যঙ্গের ছুরির ধার কিছুটা কমল। ভূতনাথের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এলেন : 'এখানে এসে থেকে তো অনেক ডিসকাস করলাম, কিন্তু প্রমাণ কই? ভূত-প্রেতের এগজিস্টেন্স নিয়ে আপনি কোনও প্রমাণ কিন্তু এখনও দিতে পারেননি! তাঁরা যে আছেন তার সায়েন্টিফিক লজিক, প্রুফ—এসব কোথায়?' একটু হেসে বললেন, 'আমি কিন্তু সহজে ছাড়ছি না। আই ওয়ান্ট প্রুফ। আদারওয়াইজ মিস তেওয়ারিকে বলুন "তেনারা যেখানে আছেন"-এর স্লটে অন্য কোনও সিরিয়াল-টিরিয়ালের ব্যবস্থা করতে...।'

প্রিয়নাথ লোকটার হাত থেকে রেহাই চাইছিলেন। তাই বললেন, 'ঠিক আছে। কাল কথা হবে।'

রমাশঙ্কর পেটে হাত বোলাচ্ছিলেন, ছোট-ছোট চাপড় মারছিলেন। হঠাৎই শব্দ করে একটা ঢেঁকুর তুললেন : 'ওঃ, উইন্ডের প্রবলেমটা বড্ড ভোগাচ্ছে। কিছুতেই ঠিকঠাক ঘুম হচ্ছে না। এখানে এসে থেকে খাওয়াদাওয়ার নিয়মটা একেবারে ঘেঁটে গেছে। যাকগে, মিস্টার জোয়ারদার, তা হলে কাল কথা হবে—।'

প্রিয়নাথ ঘরে ঢোকার আগে একটু চাপা গলায় ওঁকে বললেন, 'আপনি শুনেছেন কি না জানি না, আজ বিকেলে—মানে কাল বিকেলে—একজন লোক খোলা মাঠের ওপর থেকে উধাও হয়ে গেছে...।' বলেই ঘরে ঢুকে গেলেন।

কিন্তু কানে এল রমাশঙ্করের মন্তব্য : 'যত্ত সব বোগাস ব্যাপার!'

সেই সব বোগাস ব্যাপারগুলো ধীরে-ধীরে বলছিলেন প্রিয়নাথ। মিংকি আর রমাশঙ্কর শুনছিলেন। সামনের ছোট টেবিলে খালি চায়ের কাপ। পত্রলোচন চুপচাপ বসে হাতপাখা নাড়ছেন, অতিথিদের হাওয়া করছেন।

আজ সকালে চায়ের আসরে প্রিয়নাথ যখন গতকাল বিকেলের 'অ্যাক্সিডেন্ট'-এর কথা আর পত্রলোচনের পারিবারিক কাহিনি বলতে শুরু করেছেন তখন থেকেই পত্রলোচন চুপচাপ হয়ে গেছেন। নির্বিকার মুখে প্রিয়নাথের কথা শুনছেন।

মিংকি চোখ বড়-বড় করে শুনছিল। ভীষণ ভয় করছিল ওর। আজ চপলকেতু ছেড়ে কলকাতা রওনা হতেই হবে! ছুটন্ত পায়ের শব্দ আর মানুষজনের উধাও হওয়ার পিছনে এরকম মর্মান্তিক ইতিহাস!

কথা বলতে-বলতে বিষণ্ণতা প্রিয়নাথকে ঘিরে ধরেছিল। পত্রলোচনকে দেখে ভীষণ অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। কত কী সয়েছে মানুষটা! এখনও সইছে। ওর বউ আর ছেলে আর একটু হলে ওই সর্বনাশা খিদের শিকার হচ্ছিল! বলতে গেলে ভাগ্যবলে মানুষটা ওদের আবার ফিরে পেয়েছে।

প্রিয়নাথের বলা শেষ হলে কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। দরজা দিয়ে রোয়াক আর তার পরে খোলা জমি দেখা যাচ্ছিল। সকাল থেকে মেঘলা বলে রোদের দেখা নেই।

এখন সবে সকাল ন'টা। তৃষ্ণা, বিনোদকুমার টাটা সুমো নিয়ে এখনও আসেনি। ওরা এলে পর প্রিয়নাথ এখান থেকে পাততাড়ি গোটানোর কাজ শুরু করবেন। চপলকেতু চপলকেতুর জায়গায় থাক।

হঠাৎই রমাশঙ্কর জোরালো গলায় অট্টহাসি হেসে উঠলেন। হাসতেই থাকলেন।

কিছুক্ষণ পরে হাসি থামলে দু-হাত শূন্যে তুলে চিৎকার করে বললেন, 'আপনারা ভেবেছেন কী! সবাই মিলে আমাকে বুদ্ধু বানাবেন? বেড়ে মজা, না! আপনাদের এসব আজগুবি নক্কা-ছক্কা আমি এখনই ফাঁস করছি—' কথা বলতে-বলতে লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। দরজার দিকে আঙুল তুলে চিৎকার করে বললেন, 'ওই মাঠ। ওই মাঠের নীচে পিশাচ আছে! যত্ত সব ব্লাফবাজি! পূর্বপুরুষ না হাতির মাথা! এখুনি সব প্রমাণ হয়ে যাবে...।'

রমাশঙ্কর আচমকা ছুট লাগালেন দরজার দিকে। ওঁর পায়ের ধাক্কায় চায়ের টেবিল দড়াম করে উলটে পড়ল। সব কাপ-প্লেট ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কয়েকটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল।

রমাশঙ্কর ততক্ষণে দরজা পেরিয়ে সিঁড়ি নেমে পৌঁছে গেছেন খোলা জমিতে।

পত্রলোচন উঠে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি পা চালালেন দরজার দিকে। প্রাণপণে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, 'স্যার, যাবেন না! যাবেন না!'

প্রিয়নাথ হঠাৎ দেখলেন, এত চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে কখন যেন কালো চশমা পরা দুজন মানুষ অন্দরের দরজা খুলে বসবার ঘরে ঢুকে পড়েছে।

পত্রলোচনের পিছু-পিছু প্রিয়নাথ এবার ছুটে গেলেন। ওঁর পিছনে মিংকিও।

রমাশঙ্কর দত্ত তখন খোলা মাঠে পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন আর 'কোথায়? কিছুই তো নেই!', 'ব্লাফমাস্টার', 'জোচ্চোর', এসব বলে চেঁচিয়ে গালমন্দ করছেন।

'স্যার, ফিরে আসুন! ফিরে আসুন!' পত্রলোচন চিৎকার করছিলেন। খোলা জমিতে নেমে রমাশঙ্করকে লক্ষ্য করে ছুটছিলেন।

প্রিয়নাথের মনে হল রমাশঙ্কর বোধহয় সত্যি-সত্যি পাগল হয়ে গেছেন। মিংকি বারবার জিগ্যেস করছে, 'ভূতনাথদা, ওঁর কী হয়েছে? কেয়া হুয়া উনকো?'

পত্রলোচনের পিছনে প্রিয়নাথ আর মিংকিও ছুটতে শুরু করেছিল। রমাশঙ্করের পাগলামি তখনও একটুও কমেনি।

ঠিক তখনই ওঁর কাছ ঘেঁষে মাটি ছিটকে উঠল শূন্যে। উঠল মাটির ফোয়ারা। এবং ধুলোপিশাচ।

এবং পরমুহূর্তেই রমাশঙ্কর ঢুকে গেলেন মাটির ভেতরে। মাটি আবার সমান। আগের মতো। খোলা মাঠের দিকে তাকালে মনে হবে এখানে সবকিছু শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে।

মিংকি ডুকরে কেঁদে উঠল। প্রিয়নাথ দৌড়োনো থামিয়ে মাথায় হাত রাখলেন। আর পত্রলোচন হতাশায় বসে পড়লেন মাঠের মাঝখানে।

ওঁরা যখন কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না, তখনই মাঠে আর-একটা ধুলোর বিস্ফোরণ। একটা দেহ ছিটকে বেরিয়ে এল শূন্যে। তারপর মাঠের ওপরেই আছড়ে পড়ল।

চিৎকার করে সেই দেহ লক্ষ্য করে ছুট লাগাল মিংকি। চেতনা ফিরে পেয়ে পত্রলোচন আর প্রিয়নাথও ছুটলেন।

ধুলোমাখা যে-শরীরটা পত্রলোচনের পূর্বপুরুষরা ফিরিয়ে দিয়েছেন সেটা তখন অজ্ঞান অসাড়—অসহায়ভাবে পড়ে আছে খোলা মাঠের ওপরে।

তিনজনে মিলে ধরাধরি করে রমাশঙ্করকে পত্রলোচনের বাড়িতে নিয়ে এলেন। মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে ওঁর চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দেওয়া হল।

প্রায় কুড়ি মিনিটের চেষ্টায় রমাশঙ্করের জ্ঞান ফিরল। ধুলোর জন্যে চোখ খুলতে পারছিলেন না। বারবার বলছিলেন, 'চোখ জ্বালা করছে।'

পত্রলোচন বললেন, 'ধীরে—ধীরে...ছটফট করবেন না। আপনার কপাল খুব ভালো যে, তেনারা আপনাকে নেওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ফেরত দিয়ে দিয়েছেন—' বলে কপালে হাত ঠেকালেন পত্রলোচন। বোতল থেকে জল নিয়ে রমাশঙ্করের চোখে জলের ছিটে দিয়ে চললেন। রমাশঙ্করের জামাকাপড় জলে ভিজে গিয়েছিল।

ওঁর গলার তেজ অনেক কমে গেছে। বোধহয় এখনও শকটা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কিন্তু তা সত্ত্বেও জেদি গলায় বললেন, 'সব বাজে কথা। আমি...আমি...হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে...গিয়েছিলাম। আমার...আমার কাছে...বুজরুকি চলবে না। প্রমাণ চাই, প্রমাণ। প্রমাণ ছাড়া...আমি মানব না...।'

কথাগুলো বলতে-বলতে রমাশঙ্কর দত্ত অনেক চেষ্টায় চোখ খুললেন।

সঙ্গে-সঙ্গে মিংকি তেওয়ারি ভয়ে চিৎকার করে উঠল। প্রিয়নাথের শরীর কাঠ হয়ে গেল। এ কী প্রমাণ দেখছেন তিনি!

পত্রলোচন তখন কাঁদছেন আর কপাল চাপড়াচ্ছেন।

রমাশঙ্কর দত্তের চোখের মণি দুটো গাঢ় সবুজ। ধকধক করে জ্বলছে। রাতের আঁধারে বেড়াল কিংবা প্যাঁচার চোখ যেমন জ্বলে।

মুর্খ রমাশঙ্কর তখনও বলে চলেছেন, 'কী মিস্টার জোয়ারদার, প্রমাণ কোথায়, প্রমাণ?'

প্রিয়নাথ উত্তর না দিয়ে মুখটা একপাশে ঘুরিয়ে নিলেন। এরকম জ্বলন্ত প্রমাণ তিনি সত্যি-সত্যি চাননি।

ঘরের এককোণে পত্রলোচনের বউ আর ছেলে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে একবার তাকিয়ে পত্রলোচন কান্না ভাঙা গলায় বললেন, 'এইরক

ম আগুনঝরা চোখের জন্যেই তো আমার বউ, আমার ছেলে, সবসময় কালো চশমা পরে থাকে। এটাই তো ওদের চোখের অসুখ...আমার বাপ-পিতামোর দান। হে ভগবান!'

মিংকি কাঁদছিল তখনও।

আর রমাশঙ্কর নিস্তেজ গলায় জেদি সুরে একঘেয়েভাবে আওড়ে চলেছেন, 'প্রমাণ চাই। প্রমাণ চাই। প্রমাণ ছাড়া আমি কিছুই মানতে পারব না। কিছুতেই না...।'

প্রিয়নাথ ভাঙা হতাশ গলায় মিংকিকে বললেন, 'মিংকি, ওঁকে একটা আয়না দেখাও—।' তারপর উঠে দরজার কাছে চলে গেলেন। বাইরের বিষণ্ণ দিনের দিকে তাকালেন।

মেঘলা আকাশ থেকে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। মাটি ভিজতে শুরু করেছে।

একটা গাড়ির ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল।

তারপরই পিছন থেকে রমাশঙ্কর দত্তের চিৎকার শোনা গেল। ওঁর বুকফাটা আর্ত হাহাকারে পত্রলোচনের ঘরের বাতাস কাঁপতে লাগল।

